উত্তরপর্ব

প্রণতি ঘোষ

সৃজনী
৪ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ অসীম রায়
সৃজনী, ৪, ভূপেন বোস এভিনু্য—৪

মুদ্রক ঃ হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন—৬

চিত্ত সিংহের পরবর্তী গ্রন্থ ঃ

উপন্যাস ঃ বারোমাস্যা/শিকড়
কাব্যগ্রন্থ ঃ রাজেশ্বরী/ক্রীতদাস
রচনা ঃ স্ব-নির্বাচিত রচনা/২
চিত্র ঃ স্ব-নির্বাচিত চিত্র/২
Selected Paintings/2
ছোটদের ঃ আজবুর বই

সূচীপত্র

অনুধাবন	১
ক'নে দেখা	১৭
প্রতিনিধি	২৮
সাড়া	৩৮
চায়ের রং লাল	৫২
নতুন গল্প	৬০
শেষ বুলেট	৬৯
অদিনে	৭৭
সুখপাখী	৮৬
ক্ষত	৯৫
দুই সীমানা	১০৪
আসান	১১৪
বার্লিন প্রাচীর	১২৪
উত্তর পর্ব	১৩৫
অবরোহ	১৪৭
গন্ধমাদন	১৫৭
সওয়ার	১৬৪
সংক্রান্তি	১৭৫
বৃষ্টি বৃষ্টি	১৮৪
নাম ভূমিকা	২০১
মৃতেরা কথা কয়ে উঠবে	২২০
আয়না	২২৬
ইয়াদ	২৪১
শান্তিপর্ব	২৪৭
অন্তরায়	২৬৪

অনুধাবন

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেই জটা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের বস্তি বাড়ির চেয়ে অনেক অনেক বড় বাড়িটা। কত যে দরজা জানালা তার গোনার পরিধিতে কুলায় না। লোকে এ বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলে, এখানে ঘরে ঘরে হাওয়া ঠান্ডা গরম করার মেশিন আছে। ও জেনেছে, কাল বাক্স মত কি একটা বেরিয়ে থাকে জানালার নিচে থেকে সেইগুলো হলো মেশিন।

ছোটবেলায় সেই যখন থেকে জটা মায়ের আঁচল আর দিদির শাসন কাটিয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করেছে তখন থেকে এ বাড়িটা ওর স্বপ্নের রাজপুরী। সেই রাজপুরী যেখানে সবাই ঘুমিয়ে থাকে। দিনভোর এ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে নেমেছে, জটা একটা দরজা কি জানালা কখনও খুলতে দেখেনি। মস্ত গাড়ি বারান্দার নিচে সর্বদা একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও কখনও সেখানা হুশ করে বেরিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু তার ভিতরে কারা যায় আসে দেখা যায় না। গাড়ির ভিতরে এমন অন্ধকার। দুখানা গেট—একটায় গাড়ি ঢোকে আর একটায় বেরোয়! গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে একসার রঙ্গিন সিঁড়ি—সবুজ আর গোলাপী! তার ওপর থাকে থাকে সাজানো সোনার মত ঝকঝকে পেতলের ঢাউস হাড়ি তাতে নানা জাতের গাছ। সিঁড়ির মুখে একটা দরজা। একজোড়া দরজার মত তার চারখানা পাল্লার বড় বড় এক খন্ড নকশা কাটা রঙ্গিন কাচ, বড় বড় পেতলের বল্টু দু'সারি আর হাতলটার সিংহের মাথা—পাশাপাশি একজোড়া সিংহ যেন মুখ বার করে আছে।

বাড়িতে শুতে না পেরে রাস্তার বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির নিচে ঘুমিয়েছিল জটা—সেদিন অবশ্য আরও আশ্চর্য জিনিস দেখেছিল—খুব ভোরে সূর্যের আলো ফোটার আগেই বাড়ির এক একটা দরজা জানালা খোলা হয়। সকালের নরম আলোয় সেই সব দরজা জানালা জুড়ে ঝলমল করে পর্দা, অল্প অল্প হাওয়ার দোলা লেগে কত রঙ বেরঙের কারুকাজ ফুটে ওঠে তাতে। ঘরের ভিতরে থাকে চাঁদের আলোর মত হাল্কা রঙ্গিন আলো।

বাড়িটার নেশা জটার এত গভীর যে একবার বাড়িটাতে যখন চুন রঙের কাজ হচ্ছিল সে একফাঁকে গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল। একটা পেতলের হাঁড়ির আড়ালে

লুকিয়ে বসে দেখতে লাগল। সামনের বড় দরজাগুলো খোলা। নানান আসবাবপত্র বার করা হয়েছে। বাইরে লাল ভেলভেটের ওপর নকশা কাটা একসার গদি আঁটা সোফা। মেঝেয় পাতা ঠিক সেই রকমের একটা কার্পেট—চার পাঁচ জনে সেটাকে গুটিয়ে গুটিযে গোল করে বাইরে নিয়ে একটা লরিতে তুলে দিল। নিচে তার কি ধুলো! কি এক মেশিন লাগিয়ে সে ধুলো পরিষ্কার করল আরো কজন! ঘরটা কি মস্ত, দেওয়ালে কত কি আঁকা - কি বড় বড় সোনার ফ্রেমে বাধাঁনো ছবি। ফ্রেমের গায়ে গয়নার মত কত কারুকাজ! আর কত যে ঘর সাজানো জিনিস জীবনে কোন দোকানে কি দেখেছে? মাঝখানে ঝলমলে ঝাড়লন্ঠন দুলে দুলে নানা রঙের ছায়া ফেলেছে ছবিগুলোর পরে। আলোয় রঙ্গে মায়া ধরানো ঐশ্বর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথের শিশু সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। কোন এক কোন্ থেকে কে যেন হঠাৎ বলে উঠল— "এ্যা কোন্ হ্যায় রে—"

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে থেকে চার পাঁচজন ছুটে এলো--জটা এক পলকে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বেকুবের মত, মুখে ভয় আর হিংস্রতা। কেউ গায়ে হাত দেবার আগেই জটা হাত দুটো তুলে বলে উঠল 'বাবুগো কিছু খেতে দ্যান ক'দিন কিছুই খাইনি' ভেতরে যারা কাজ করছিল চেচিঁয়ে বলল "দারোয়ানজী ওটাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দাও তো—" বলেই কত যেন বিরাট এক রসিকতা হল—এমনিভাবে হো হো করে হাসতে লাগল। দারোয়ান মোটা গলার হাঁক দিল "এ্যা গিধধর কাঁহাসে ঘুসা রে?"

জটা গলা খুলে কেঁদে উঠল—"বাবুগো দুটি খেতে দাও—"

একটি সুবেশ ছেলে দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকে গেল। জটা ছুট লাগাবে কিনা ভাবছিল--ভাবছিল—ঠিক কোন দিকটা দিয়ে ছুটলে সকলের নাগালের বাইরে থাকতে পারবে। এমন সময় ভিতর থেকে মেয়েলী গলা শোনা গেল--"ছেল্যাটারে খেইয়ে যেতে বলো দারোয়ানজী—"

এটা ওর কল্পনা কিনা কে জানে ওর মনে হয়েছিল—একথায় দারোয়ানের চোখদুটো যেন ছল ছল ক'রে উঠল। "ভগওয়ান আপক্যা প্যার করে গা খোকাবাবু—" বলতে বলতে দুহাত অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথায় ঠেকাল!

সত্যিই যে খিদে পেয়েছিল তা নয়—। আত্মরক্ষার তাগিদেই ওকে এই বুদ্ধিটা খাটাতে হয়েছিল। এখন জটার সবটাই বিশ্রী লাগতে লাগল। সিঁড়ির পাশটায় বসে ওর কেবলই মনে হলো তখনই ছুটে পালানো উচিত ছিল। ঘরের মধ্যেটা দেখার কৌতূহল তার আর রইল না। নিজের ধুলো পা দুখানার দিকে তাকিয়ে সে স্থির হয়ে বসে রইল।

একজন মহিলা ধীরে সুস্থে একটা প্লাস্টিকের রেকাবিতে দুখানা রুটি এনে, ওর স্নামনে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, দারোয়ানজী হেঁকে বলল "এ পরমিলী থোড়া পানি দো উসকো—খানাকে সাথ পানি জরুর দেনা—কিসিকো খানে দেতা তো নেহি—মালুম হোগা ক্যায়সা—"। পরমিলী কি নামরে বাবা! হঠাৎ চোখ তুলে জটা

দেখল ওর দিকে চেয়ে মহিলা হেসে বলছে—"রুটি মেলেনা আবার পানি—যাঃ ভাগ—"

ভাগতে পারলেই বাঁচে জটা। রুটি দুখানা হাতে তুলে দাঁড়াতেই দারোয়ান হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। চারিদিকে লোক জমে উঠেছে। নরম গলায় দারোয়ান বলল "দেখ হামার লোটামে থোড়া পানি হ্যায়—"

পরমিলী খিস্তি করে উঠল—"ফুটপাথওয়ালীকা ঘরমে লেড়কা পয়দা কিয়া হ্যায় না—" চারিদিকে হাসির রোল। পরমিলী ধুপ্ ধাপ্ ক'রে ভিতরে চলে গেল পরক্ষণে জলের ঘটিটা এনে মাটিতে ঠাস করে নামিয়ে রেখে খিঁচিয়ে উঠল—"তোর জন্যে—মুর্দা কোথাকার, গিন্নীমা এখন চিল্লাছে জানিস—" বলেই ছুটলো ভিতরের দিকে।

জলের ঘটি থেকে এই বাচ্চাটাকে কি করে জল খাওয়াবে তাই ভেবে একটু থমকে গিয়েছিল বেচারা দারোয়ান। তারপর জটার দুহাত জড়ো ক'রে হাতের মধ্যে সরু ধারায় জল ঢালতে ঢালতে ইশারায় বলল—"পী লে বেটা জলদি—"। দারোয়ান যা বলল তাই করল জটা। জল তেষ্টা ওর পেয়েছিল। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে আসার আগে দারোয়ান ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিল—"খোকাবাবুকে গুনাহ্ না লাগে—হ্যায় ভগওয়ান—"

খোকাবাবুর গুনাহ্ বাঁচাতেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত চাকরি চলে যায় বেচারার।

জটা ভিখারী নয়—তাই সেদিনের রুটি আর জল শুকনো গলায় ভাত আটকানোর মতই বুকের মধ্যে বিঁধে রইল। একটা চূড়ান্ত লজ্জা আর অপমানের অনুভূতি ও কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারল না। সেই থেকে ও বাড়ির ধার কাছ ঘেঁষা ছেড়ে দিল সে। তা বলে ও বাড়ির আকর্ষণটা তাতে বিন্দুমাত্র কমল না। দুর থেকেই ইট কাঠ ছুঁয়ে পড়ে রইল ওর মন। যেন আলিবাবার মত চল্লিশ দস্যুর সম্পদ ও নজরে নজরে রাখছে একদিন চিচিং ফাঁক বলে ঢুকে পড়লেই সাতরাজার ধন পেয়ে যাবে!

জটা অবশ্য এতদিনে বুঝেছে এ বাড়িটা ও যেমন ভালবাসে আর কেউ কিন্তু তেমন বাসে না। কেমন এক রকম রাগ আর বিদ্বেষ ভরা চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় লোকে আর দাঁতের ফাঁকে গালিগালাজ উচ্চারণ করে 'শালা রক্ত চোষা'। এমনকি তার বাবাও তাদের মধ্যে একজন। জটার মনে আছে বাবার হাত ধরে দোকানে যাবার পথে বাবা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলেছিল—"শালা হারামী আমাদের জান খেয়ে ফেঁপে উঠেছে।"

কথাটা জটার মোটেই ভাল লাগেনি—সে বেশ ক্ষুন্ন হয়েছিল।

এদিকে ধীরে ধীরে জটার কিছু বন্ধু জুটে গেল। ওরই মত তারাও মোড়ের মাথায় বসতে আসে। তাদের কারো কারো নানান ধান্দা, কারো আবার কোন উদ্দেশ্যই নেই। রাস্তার পাশে নানা কিছুর দোকান, ফাউন্টেন পেন, মুড়ি বাদাম, ফুচকা, ফল পত্রিকা, জামা প্যান্ট, নানান পোস্টার আঁটা দেওয়ালে। পেছনে আবার ঘুঁটেও দেয়। একদল ছেলে মাঝে মাঝে এখানে আসে কাগজ কুড়াতে।

এই ছেলেগুলোর সাথে ওদের ভারী রেষারেষি। কেন কে জানে এদের একদম

সহ্য করতে পারে না। কেমন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ভাব। গায়ের জোরেই বশ মানাতে চায়। ওরা দুপুর বেলায় এখানে এসে বসে টাকা পয়সা গোনে—মুড়ি ছোলা কিনে খায়। প্রথম প্রথম ওদের দিকেও ছুঁড়ে দিত দু চারটে—বাচ্চাগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্য হাত বাড়ালে হঠাৎ লাথি ছুঁড়ে হাতটা ছেঁচে দিত। এখন আর কেউ ওদের কাছ ঘেঁষে না। তবুও হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওদের মাথা মুখে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়। রাগে জটার গলার শিরা ফুলে ওঠে—চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, সমস্ত শরীর টান টান ধনুকের ছিলার মত তবু কিছু করে বসে না বোকার মত কারণ ওরা এখনও অনেক ছোট।

সেদিন কোন বাড়ির কানাচে জটা কুড়িয়ে পেল একটা মস্ত লালনীল বল আর সুতোয় বাঁধা গোটাকতক বেলুন। সেগুলো নিয়ে মোড়ে এসে বসল। বলটা তার ভারী পছন্দ। এমনি একটা বল কিনে দেবার জন্যে মার কাছে একবার দারুণ বায়না জুড়েছিল সে। মা ওকে ফুটপাত থেকে একটা বল কিনে দিয়ে বলেছিল—"ও বাবা! ও বলের অনেক দাম, ও কি আমরা কিনতে পারি, তুই বাবা এইটে নিয়েই খ্যান্ত দে—" কিন্তু সারাদিন ভর ওর ঘ্যানঘ্যানানি আর থামেনি। আজকেও বলটা হাতে নিয়ে সেই কথা মনে পড়ে গেল। বলটা নেড়ে চেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল এক জায়গায় ছোট একটু ফাটা। নানাভাবে সেই ফাটাটা আটকাতে না পেরে ভাবল মুচির কাছে গেলে নিশ্চয়ই সে জুড়ে দিতে পারবে। তাই বলটা কোলের মধ্যে রেখে জটা বেলুন ফোলানোয় মন দিল। ওর আধা নেংটা পথের বন্ধুরা জট পাকিয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে জটার বেলুন ফোলানোর কৌশলটা লক্ষ্য করতে লাগল। এদিকে ফুঁ দিতে দিতে জটার চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল। জলে ভিজিয়ে, টেনে টুনে প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে সেই চোপসানো বেলুনের একটুখানি জায়গা সবে ফুলে উঠেছে—সবাই একান্ত উদগ্রীব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে—সেই মুহূর্তে কে যেন এক কোণ থেকে নিঃশব্দে পা বাড়িয়ে জটার কোলের বলটা ঝট করে মাটিতে নামিয়ে ফেললো। প্রচন্ড চিৎকার ক'রে তড়িৎবেগে জটা সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোথা থেকে আরও গোটা কয়েক ছোকরা ছুটে এল। বলটা আর বেলুনগুলো হাতাবার চেষ্টায় ওরা একে ওকে চড়ঘুঁষি লাথি চালিয়ে ওদের কাবু করে এনেছে প্রায়। চেঁচামেচি কান্নাকাটিতে রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফুটপাতের দোকানিরাও দোকান ফেলে ছুটে এসেছে—তাই দেখে ছেলেগুলো ওদের ছেড়ে গা ঢাকা দিল। জটা দুচারখানা মোক্ষম লাথি খেয়েছিল—তবু বলটা সে ছাড়েনি। নোংরা মুখ আরও নোংরা ক'রে জয়ের গর্বে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসল ওরা। এই প্রথম জটারা ওদের হারিয়ে দিতে পেরেছে তা যেভাবে হোক।

এখন থেকে পুরনো এক্কা-দোক্কা, চোর-চোর এসব খেলায় আর মন বসল না ওদের। জটারা নতুন বলটা হাতে নিয়ে পার্কে এল খেলতে। বড় বড় ছেলেরা সেখানে বড় বড় বল নিয়ে খেলে। প্রথম প্রথম দু একদিন সাহস করে ওরা খেলতেই পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখল। দু চার দিন যেতে একটা কোণ

খুঁজে নিয়ে ওরা খেলা শুরু করলো। বলের বড় যত্ন তাই ওরা খেলে না। হাত দিয়ে গড়িয়ে এ ওর দিকে বল পাঠায়। নিজেদের আনন্দে নিজেরা মশগুল আর কোনদিকে মন দেওয়ার ফুরসুৎই পায় না। তবুও একদিন জটার চোখে পড়ে গেল—একটা বাচ্চার গাড়ি ঠেলে ঠেলে পরমিলী পার্কে ঢুকছে।

জটা অবশ্য আগেই দেখছিল পার্কের বিশেষ একটা দিকে পরিচারিকারা নানা বয়সের কচি কচি বাচ্চা নিয়ে এসে বসে। বাচ্চাগুলোকে নিজেদের মত ঘুরতে ফিরতে দিয়ে তারা বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে। জটা কোনদিন এদের খুঁটিয়ে দেখেনি। তাই পরমিলীকে তার চোখেও পড়েনি। আজ দেখতে পেয়েই ছুটে এল—"পরমিলী মাসী—"

"ক্যারা আমার সাধের বোনপো"—ফুঁসে উঠল পরমিলী। একটা অচেনা ছেলের আস্পর্ধায় সে ক্ষিপ্ত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জটা। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার এটুকু বোধগম্য হল যে তার দিক থেকে সীমা লঙ্ঘনের অপরাধ ঘটেছে। পিছনে ফিরে ছুট লাগাতেই যাচ্ছিল—চুলে টান খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমিলী তার চুলের মুঠি চেপে ধরেছে।

"তুই ক্যারা—মশকরা করার আর জায়গা পাসনে"—বোধহয় টেনে একখানা থাপ্পর কষাবার ইচ্ছেই ছিল—

"বাঃ তুমি যে আমায় রুটি খেতে দিয়েছিলে—তাই তো—" কুণ্ঠিত কণ্ঠেই বলল জটা।

"কবে আবার তোকে রুটি খাওয়ালামরে শুয়োর—"

"সেই যে ছোটবাবু বলল—হুই বড় বাড়ির গেটে—"

আবছা একটা স্মৃতি মনের কোনে ভেসে এল। ও বাড়িতে এমন ঘটনা আকছার ঘটে না। ওদের অনেক বড় বড় মচ্ছব হয়—শ'য়ে শ'য়ে লোক খায়, কাপড় পায়। কিন্তু সে সব আড়তের কাজ আড়তেই মেটে। বাড়িতেও মচ্ছব হয়—তবে বাইরের কেউ সেখানে ঢুকতে পায় না। বিরাট সামিয়ানা পড়ে, হোম যজ্ঞ হয়—দেদার ঘি, চন্দন কাঠ পোড়ে—কিন্তু গরিবের পাতে পড়ে না একখানাও।

ওদিক থেকে আর একটি মেয়ে এসে ঢুকল—"কি গো প্রমীলাদি—কিছু তুলে নিয়েছে বুঝি"—

প্রমীলা চুলের মুঠোয় একটা ঝাঁকি দিয়ে তীব্র শ্লেষভরা গলায় বলল—"আরে আমার বোনাই এর পুত গো, দুর'হ—"। ওকে ছেড়ে দিয়ে প্রমীলা হাসতে হাসতে এক মুখ পানের পিক সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে সঙ্গিনীর সাথে রঙ্গিনীর মত হেলে দুলে চলে গেল। জটা বেচারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল না প্রমীলা মাসী রাগ করল না রঙ্গ করল।

সেই থেকে প্রমীলার সঙ্গে ভাব জমানোর একটা অদম্য ইচ্ছে জাগল জটার মনে। যথা সম্ভব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে বিকালের দিকে রোজ পার্কে আসতে শুরু করল। সেই যেখানে দোকানের ডলপুতুলের মত একদল জীবন্ত পুতুল টলমল পায়ে হাঁটতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে খিলখিল করে হাসে। চুষির বদলে পুতুলের হাত মাথা

কামড়ায় কিম্বা নির্বিকার চিত্তে কাপড় কাচার মত সেটাকে আছড়ায়। দেখতে দেখতে জটার সাধ জাগে ওদের একটু ছোঁবার। মনে হয় ওদের ছুঁলেই অন্য একটা বিচিত্র জগতের দরজা খুলে যাবে ওর চোখের সামনে—যেমন ক'রে একদিন সেই বন্ধ ঘরখানার দরজা খুলে গিয়েছিল।

নানান বয়সের ছেলে-মেয়ে, কত রকমারি খেলনা আনে তারা। খেলতে খেলতে নেমে পড়ে রাস্তায়— ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ে, জড়াজড়ি, মারামারি ক'রে গড়াগড়ি খায়। জটা ছুটে গিয়ে ধরে আদর করে হাত বোলায়। কান্না ভোলায়। ওদের ছুঁড়ে দেওয়া বল খুঁজে আনে, নোংরা লাগলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এমনি ক'রে সকলের অজান্তেই জটার সাথে ওদের এক অসমান সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রমীলা ওকে দেখেও দেখে না। অন্যরা নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প পাতায়। জটার সামনে সত্যিই যেন স্বর্গের দুয়ার খুলে গেছে।

জটা এখন দাঁত মাজে, নখ পরিষ্কার করে, চুল আঁচড়ায়। কেঁদে কেটে হাট বসিয়ে জামা প্যান্ট কাচায়। পায়ে যে ওর জুতো নেই—একজোড়া জুতো দরকার-সে কথাটা ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না। বাবা শুনে একদিন কষিয়ে দিল এক থাপ্পড়—"ব্যাটা লাটের বাট—"।

জটাকে তাতেও দমানো গেল না। মার কাছে নিদেনপক্ষে একজোড়া রবারের চটি কিনে দেবার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগল। মা বেচারা কেঁদে কেটে এক সা। মার কান্নাতেই বোধ হয় কি একটা অজানা উপলব্ধি জটাকে স্তব্ধ ক'রে দিল। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের পুরনো কোণটায় এসে দুহাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। পার্কে আর যেতে ইচ্ছে করলো না।

আচমকা পেছনে একখানা জোর লাথি খেয়ে—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো জটা। সামনে সেই কাগজ কুড়ানো দলের একটা ছেলে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে ও প্রায় উদ্যত ঘুষিটা সামলে নিয়ে ফের ব'সে পড়ল। ছেলেটা মুখ বেঁকিয়ে একটা জঘন্য গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে নিজের দলে ফিরে গিয়ে পয়সার হিসাব করতে বসল। জটা আনমনে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল।

এক সময় পায়ে পায়ে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সব চেয়ে বড় ছেলেটা বাঁহাতে এক ঝাপটা লাগাল জটার মুখে। পড়েই যাচ্ছিল সে এই আকস্মিক আঘাতে। কোন মতে সামলে নিল। ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে হেসে উঠল। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে এল জটার থুতনি বেয়ে। হাতের চেটোয় রক্ত মুছে জটা বলল—"তোমরা আমার বলটা কিনবে। একদম আস্ত। বেলুন গুলোও আছে একটাও ফাটাইনি।"

"এ সেই খচ্চরটা না—কে কিনবেরে ফাটা বল—ওতো রাস্তায় ফেলে দেয় লোকে—"

"তবে যে সেদিন নিতে চাইছিলে—"

"ফ্যালনা জিনিস কিনব কেন রে? চালাকী পেয়েছিস?"

একটা ছেলেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দেখে জটা দ্রুত পিছু হটে নিজের জায়গায়

ফিরে এল। জটার আশা ছিল মা যখন বলেছে বলটা খুব দামী আর ওরাও যখন নেবার জন্য ছল করেছিল তখন এমনি না পেলে ওরা হয়ত পয়সা দিয়ে কিনতে রাজি হ'তে পারে। তা'হলে জুতো কেনার পয়সার জোগাড় হয়ে যায়। তাছাড়া বলটা বেচতেও তেমন আপত্তি নেই আর। কত ভাল খেলনায় ও আজকাল খেলে।

ওদের কাছে পাত্তা না পেয়ে বড়ই ক্ষুন্ন হল সে। মনে মনে ঠিক করল ও-ও কাগজ কুড়িয়ে বেচবে আর ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে পয়সা গুনবে। একটা বস্তা শুধু ওর দরকার। মাকে বললে মাই একটা বানিয়ে দেবে। কতক্ষণ বসে বসে পরিকল্পনা আঁটছিল জটা খেয়াল নেই। পাঁচিলের কোণ থেকে কে যেন আস্তে ডাকল—"এ্যাই শোন—"

জটা তাকিয়ে দেখল—কাগজ কুড়ানোদের একটা ছেলে ওকে হাত ইশারায় ডাকছে। কাছে যেতে সে ফিস ফিস ক'রে বলল—"কি কি খেলনা আছে রে তোর কাছে—"

জটার আপাদমস্তক জ্বলে গেল—"তোর কি রে?"

ছেলেটি অনুরোধের ভঙ্গীতে বলল—"বল না কি আছে—তেমন হলে দাম দিয়েই নেব—"

এবার জটা বেশ ভারিক্কী চালে বলল—"কি হ'লে নিবি শুনি—"

"আহাঃ পাঁয়তাড়া কষছে দেখ না—এক্কেবারে দুনম্বরী—"

"চোখ রাঙাবী না বলছি—কিছু বলব না যা"—বলেই জটা ফিরল।

"আরে দাঁড়া না—কি আকাট গোঁয়ার রে"—

"তুইই তো পাঁয়তাড়া কষছিস" হাঁটতে হাঁটতে জটা উত্তর দিল। আচ্ছা আচ্ছা বলছি শোন—চীনেমাটি, এলমুনিয়ম, পেলাস্টিক, নাইলন, রবার, ইসক্রু, পেরেক, জুতো, জামা, খেলনা সব আমরা নিই—নে এবার বল কি কি আছে—" "ঠিক আছে"—বলেই জটা একছুটে নিজের জায়গায় ফিরে এল। পিছন থেকে ছেলেটা চেঁচিয়েই বলল—"কাল আসবো কিন্তু—"

জটা ততক্ষণে দুটো বাস রাস্তা পেরুচ্ছে পার্কে ঢোকার জন্য। ওর বিশ্বাস এবারে জুতোর একটা ব্যবস্থা করা গেছে। দলে ফিরে এসে ছেলেটা বলল—"কিছুতেই পটাতে পারলাম না—তিলে খচ্চর—"

অন্যরা সায় দিল—"যা বলেছিস।"

জটা হয়ত শেষ পর্যন্ত থলি ঘাড়ে করে পথেই বেরুত পয়সা রোজগারে- শুধু কাজটা নোংরা বলেই ইতস্ততঃ করছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওর গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে গেল।

একদিন সন্ধ্যে বেলা ফিরে দেখল দরজা বন্ধ। ধারে কাছে কেউ নেই। খুবই খিদে পেয়েছিল আর ঘুম পেয়েছিল তার চেয়েও বেশি। দরজা বন্ধ দেখা এমন কিছু বিচিত্রও নয়। মা আর দিদি কোথাও গেলে এমনি হয়। চৌকাঠের ওপর বসে রইল

জটা মার ফেরার আশায়। ক্রমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আটকে যেতে লাগল। জটা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত পোয়াতে না পোয়াতে ঘুম ভাঙ্গল জটার। পেটের খিদেটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গেই কাল রাতের কথা মনে প'ড়ে গেল—ও চিৎকার করতে লাগল—"মা খেতে দাও, মা, মা—কাল রাতে আমায় খেতে দাওনি কেন ?—মা --ওমা উত্তরোত্তর গলা চড়িয়েই চলল জটা। আশ্চর্য কোন সাড়া নেই। ঘরে শুয়ে আছে সে একা দরজা হাট ক'রে খোলা। ভিতরে কেউ নেই। মা নিশ্চয় কলপাড়ে গেছে বাসন মাজতে—জটা ফের চেঁচানি শুরু করল তার সঙ্গে জুড়ে দিল—খাটের ওপর হাত পা দাপাদাপি। প্রচন্ড শব্দ ওঠে এতে। মা দিদি যেই থাক ঠিক ছুটে আসবে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু কারো সাড়া না পেয়ে জটা বিছানায় উঠে বসল। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ঠেকতে লাগল তার কাছে। এরকম তো হবার কথা নয়। মা না থাকে দিদি তো থাকবেই। ওরা যদি নাই থাকবে তবে তাকে বিছানায় এনে শোয়ালো কে ? ঘর থেকে বেরিয়েছে এমন সময় দেখল খানিকটা দূরে ওর দিদি আসছে। চোখ মুখ ফোলা, রুক্ষ উস্কো খুস্কো চুল, কাপড় চোপড় কোঁচকানো, জলে কাদায় মাখামাখি জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে গুটিয়ে রয়েছে। দিদি একটু শৌখিন। গরিব ঘরের সামর্থ্য অনুযায়ী চমৎকার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তার এমন চেহারা ওকে হতভম্ব করে দিল। সামনে এসেই ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল ওর দিদি—"গাঁক গাঁক করে চিল্লিয়ে কোন সুখে পাড়া মাথায় করছিস রে লক্ষীছাড়া ? উনি খাননি আর আমি পিন্ডি.গিলেছি বসে বসে না ? কাল থেকে বলে মাথার ঠিক নেই আমার—উনি হাট বসাচ্ছেন খেতে দাওনি কেন ?—"

দুটো আহত গালে হাত চেপে ধরে করুণ সুরে বলল—'বাঃ আমার বুঝি খিদে পায় না।' পরক্ষণেই রুখে উঠল—'তোকে কে কি বলেছে রে ? আমি তো মাকে ডাকছি—' অভিমানে ক্ষোভে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল জটা। দিদি হাত ধরে বলল—'মাকে এখন কোথায় পাবি—মা তো হাসপাতালে—' দিদির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল নেমে এল।

আঁচল খুলে পয়সা বের করে জটার হাতে দিয়ে দিদি ভিজে গলায় বলল—'দৌড়ে দুখানা রুটি কিনে নিয়ে আয় আমিও খাব—'

জটা ইতস্ততঃ করে বলল—'মা কি খাবে—'

দিদি কেঁদেই ফেলল—তুই যা না—মাকে হাসপাতালে খেতে দেবে—'

"মাকে হাসপাতালে দিলি কেন ? মার কি হয়েছে"—হাতের পয়সা শক্ত করে মুঠোয় ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

"পরে বলব—এখন যা-"

রুটি হাতে করে এসে জটা ফের জিজ্ঞাসা করল—'মার কি হয়েছিল রে ?

'খিদেয় শুকিয়ে যাওয়া মুখখানা ওর আতঙ্কে কালো হয়ে গেছে। ওদের বস্তি জীবনের অভিজ্ঞতায় মায়েরা মরণাপন্ন না হয়ে হাসপাতালেই যায় না। আর যায়

মহামারী রোগে। দুটোর কোনটাতেই তারা বড় একটা ফেরে না। রুটি খাবার রুচি আর ছিল না তাই।

জটাকে রুটি আনতে পাঠিয়ে মালা কেবল এই কথাটাই ভাবছিল কি বলবে ও ভাইকে। রুটিটা টুকরো করে কেটে তাতে একটু গুড় মাখিয়ে জটার হাতে দিতে দিতে সে ছোট করে বলল—"বাবা মেরেছে—"

জটা অবাক হয়ে ওর দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবা মেরেছে। বাবা তো ওকেও মারে দিদিকেও মারে আরও একটা ভাই ছিল তাকেও মারত। সে অবশ্য জলে ডুবে মরে গেছে। জটা যন্ত্রচালিতের মত এক টুকরো রুটি মুখে পুরে দিল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে বলল—'বাবা মাকে মারল কেন রে? মা তো পয়সা চুরি করে না।'

"বাবা যে টাকা দিয়ে ফুর্তি করে তাই মা ঝগড়া করছিল।" মালা একটু চুপ করে থেকে বেশ রাগত স্বরেই বলল—"বাবা ফুর্তি করবে আর আমরা না খেয়ে থাকব না?"

রুটিটা চিবিয়েই যেতে লাগল জটা তারপর চট্ করে সবটা গিলে ফেলে ব্যস্ত হয়ে উঠল—'দে তো আমায় একটা বস্তা— আমি তোকে টাকা এনে দেব--'

বস্তা? চোখ কপালে তুলে বলল মালা—'টাকা খোলামকুচি কিনা বাবু বস্তায় করে টাকা আনবেন। হয়েছে—পাগল হতে আর বাকি নেই। খেয়ে দেয়ে এখন বাজার থেকে গোটা কয় আলু নিয়ে আয় তো—আর শোন কোথাও যাবি না কিন্তু বাবার ভাত দিয়ে আসতে হবে তোকে—"

"ইস্ আমি ভাত-টাত নিয়ে যেতে পারব না। নিজে এসে খেয়ে যাক্—'

'বাবা এখন বাড়ি আসবেই না—'

'না আসুক গে—আমি পারব না'

মালা জটাকে কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল—'পুলিস আসে যদি-'

ভয়ে জটার গলা শুকিয়ে এল--'কেন পুলিস আসবে কেন?'

জটার হাতটা চেপে ধরে মালা বলল—'মা যদি না বাঁচে-বাবার ফাঁসি হয়ে যাবে—জানিস"

হাতের মুঠি থেকে পয়সা কটা মাটিতে পড়ে গেল। পায়ের জোর হারিয়ে জটা ধুপ করে বসে পড়ল। দুচোখে বেয়ে জল ঝরে পড়ল। দুই ভাই বোন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে। মা মরে যাবে,বাবাও আসবে না এই নির্মম সত্যটা এই প্রথম বুঝি উপলব্ধি করতে পারল ওরা।

মালাই প্রথম আত্মস্থ হয়ে জটাকে তাড়া লাগাল "নে ওঠ বাজারটা ঘুরে আয় শিগ্‌গির।" তারপর হালকা গলায় বলল—"রাতে হয়ত বাবা একসময় খেতে আসতেও পারে।"

এতক্ষণে জটা ভাবল পুলিস হয়ত বাবার কারখানা চিনবেই না। ভাত দিতে গিয়ে বলে আসবে—'তুমি কারখানায় থেকো—কোথাও যেও না।"

বিকেলে দিদির হাত ধরে জটা মাকে দেখতে গেল হাসপাতলে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার নিথর দেহটা দেখেই ঘরে ফিরতে হলো, কাছে যেতে দিল না।

কিছুদিন ধরে মোড়টাতে আর যায় না জটা। কত কাজ বাড়িতে। কখনও কল থেকে জল ধরে আনে, বাজারে যায় কতবার। খাবার নিয়ে যায় বাবার কারখানায়। বিকেলে যায় হাসপাতালে। ফিরে এসে দিদির পায়ে পায়ে ঘোরে ঘুম না আসা পর্যন্ত।

কিন্তু আবার একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখল জটা—সেদিনকার মত সব গোলমাল হয়ে গেছে। দিদিকে তো কোথাও দেখতে পেল না। খাবারের সন্ধানে হাঁড়ি-কুঁড়ি ঘেঁটে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। কাল রাতেও একহাঁড়ি ভাত ছিল—বাবাটা নিশ্চয়ই সব খেয়ে ফেলেছে। খানিকক্ষণ একা বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদল, বস্তির ঘরে ঘরে খুঁজল। বেলা বেড়েই চলেছে, দিদির দেখা নেই। শেষমেশ হতাশ হ'যে ও মোড়ের মাথায় এসে বসল। হাতে ওর সেই লাল নীল বলটা। বড্ড খিদে পেয়েছে, যদি সেই ছেলেগুলোকে পায় তাহলে বেচে দেবে ওটা। সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করল। রোদে গা জ্বালা করছে, চোখ মুখ পুড়ে যাচ্ছে--জটা আর সহ্য করতে পারল না। ছেলেগুলো বোধহয় আজ এল না। বাড়ি ফিরে এল আবার। ঘরের দরজা তেমনি বন্ধই পড়ে আছে, কেউ এসেছিল বলে মনে হল না। ঘরের ছায়ায় মাটিতে বসে পড়ল জটা। খিদেয় শরীরটা তার কিরকম যেন করছে। বসে বসে অসহ্য হ'যে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে ছুঠতে ছুটতে চলে গেল হাসপাতালে। মা যে ঘরে শুয়ে—তার দরজায় কাছ থেকে মাকে ডাকতে লাগল "মা,মা, দিদি আমাকে কিছু খেতে দেয় নি-ওমা মা—।" মাকে হাত দিয়ে ঠেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে দু এক পা এগিয়েছে এমন সময় কোথা থেকে একটা লোক এসে ওকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এল বাইরে। একটি থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, "যা পালা—নিচে গিয়ে বস—ঘন্টা পড়ুক তারপর ঢুকবি—।"

মারের চেয়ে মা সাড়া না দেওয়াতেই সব চেয়ে দুঃখ পেল জটা। সে ভাবছিল—দিদির দোষ তো মা দেখতেই পাবে না এখন। ও যে সারাদিন খায়নি—কিছুই যেন তাতে হয় না এমনিভাবে ঘুমিয়ে রইল। যেমন বাবা মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, তেমনি মাও ওর কষ্টটা দেখতেই পায় না। দিদিটাই বা কেমন—কোথায় গেলি ব'লে যেতে পারতিস। তা'হলে জটার এত কষ্ট হ'ত না। দুচোখ বোঝাই জল নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্লান্ত জটা পার্কের ভিতরে ঢুকে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। আহত অবসন্ন মনে একান্ত অসময়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে এমন সময় কে যেন ডাকল—"এই ছেলেটা কে রে ঘরে দোরে জায়গা নেই, এখানে পড়ে ঘুমুচ্ছিস—" জটার কানে যাচ্ছে সবই কিন্তু কিছুতেই চোখ মেলে চাইতে পারছে না। গলার স্বরটা আটকে আছে ঠিক স্বপ্নে যেমন হয়। ভয়ে যদি পালাতে চাও—কিছুতেই পা দুখানা নাড়াতে পারবে না—চিৎকার কর গলার স্বর ফুটবে না। মনে হ'তে লাগল—সে হয়ত স্বপ্ন দেখছে গলার স্বরটা

তার চেনা। কিন্তু কার তা মনে করতে পারছে না—দিদির, মার? গায়ে হাত দিয়ে কেউ ঠেলছে "এই ওঠ, ওঠ সাপে খোপে কাটবে—উঠে যা এখানে থেকে—" তারপরই অস্ফুট স্বরে বলল—"বেহুঁস হ'য়ে গেল নাকি রে পদ্ম—"

"গায়ে কি জ্বর নাকি—"

"না—কিজানি মনে তো হচ্ছে না—একটু জল নিয়ে আয় তো—"

"আরে এ তোমার বোনপো না—" পদ্মর হাসি শোনা গেল।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসল জটা। সামনেই বসে প্রমীলা। শরীরটা ওর এখনও টলছে আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও কাটেনি তবু চিনতে অসুবিধা হল না।

"কি হয়েছে রে তোর—এখানে এমন পড়ে আছিস—"

মাথা নিচু করে বসে রইল জটা—সহসা কথা জোগাল না মুখে। সে বেশ বুঝতে পারছিল চোখে তার জল এসে যাচ্ছে।

"নাও, তোমরা এখন আদিখ্যেতা কর—আমি যাই—আমার বাবা বকবে—"পদ্ম চ'লে গেল।

প্রমীলা কোমল গলায় বলল—"কি হয়েছে— মা মেরেছে? দিদির সঙ্গে মাবামারি করেছিস—"

মার নামে অভিমান উথলে উঠল জটার—নিজেকে আর সামলাতে পারল না কাঁদতে কাঁদতে বলল— "দিদি আমায় সারাদিন খেতে দেযনি—মাকে বলতে গেলাম—ওরা আমায় মারল—তাড়িযে দিল—"

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রমীলা জানতে চাইল— "কারা মারল—।"

"এই হাসপাতালের শয়তান গুলো—"

"হাসপাতালে কাজ করে বুঝি তোর মা—"

"না, না, মাকে হাসপাতালে দিয়েছে তো— বাবা এমন মেরেছে"

"তোর দিদি কোথায়—"

"কে জানে সকাল থেকে বাড়ি নেই—সকাল থেকে কতবার বাড়ি গেলাম—খালি দরজা বন্ধ—"

সারাদিন না খেয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা। কি জানি ভালো করে খেতেও পায় না হয়ত রোজ। বুকের কোথায় যেন একটু খানি ব্যথা অনুভব করল প্রমীলা এই বেয়াদপ ছেলেটার জন্য। আঁচলে গিট খুলে কয়েকটা পয়সা জটার হাতে দিয়ে বলল—"রুটি কিনে নিয়ে বাড়ি যা— দেখবি দিদি বাড়ি এসে গেছে—"

শক্ত হয়ে বসে রইল জটা— "না, আমি বাড়ি যাব না।"

"দুর, এখানে রাতে ভূত-প্রেত আসে। অন্ধকারে এসে ঘাড় মটকে দিয়ে যায়।"

জটা ভয়ে সরে এলো গায়ের কাছে—বলল "তাহলে তোমার কাছে থাকব।"

প্রমীলা জোরে জোরে হেসে উঠল "আমার কি বাড়ি আছে নাকি? পরের বাড়ি থাকি, তোকে তো ঢুকতেই দেবে না।"

"তোমার যদি ছেলে থাকত—"

"তাকেও ঢুকতে দিত না—নে, ওঠ, বাড়ি যা—" প্রমীলার গলায় অসীম ক্লান্তি। জটা পায়ে পায়ে প্রমীলার গা ঘেঁষে পার্কের বাইরে এল। তাব ছোট মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে। জটা অনুভব করল প্রমীলার গলায় কেমন অচেনা একটা দুঃখী দুঃখী ভাব—যেমন তার মার গলায় সে কখনও কখনও শুনেছে। জটার ইচ্ছে হল আরও কিছুক্ষণ সে প্রমীলার কাছে থাকে। কিন্তু প্রমীলা বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে জটা দাঁড়িয়েই রইল।

এরপর থেকে দিনগুলো ক্রমে অনিশ্চিত হ'য়ে উঠল। প্রায়ই খাওয়া জোটে না। বাবার কারখানায়ও আর খাবার নিয়ে যেতে হয় না। দুপুরের রান্না বন্ধ হয়ে গেছে। জটাকে আর দিদির পিছন পিছন ঘুরে কাজ করতে হয় না। যেন পথের ছেলে হয়ে উঠেছে সে। সারাদিন পথেই কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যেবেলা এক একদিন দিদি রাঁধতে বসে ওকে আদর করে হাত পা ডলে ডলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়—কাচা জামা পরতে দেয়। সে সব দিন জটার কান্না পায় কিন্তু কিছুতেই কাঁদে না। ওর মনে হয় দিদিরও চোখ ছলছল করে। ও কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছে ওর দিদিরও ওর মত কষ্ট। তাই এখন আর ওর অভিমান হয় না, শুধুই কষ্ট হয়। বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। এখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ দেখলে দরজার কোলে মাটিতেই শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

দিদিকে আবার একদিন বলল জটা—"একটা থলি দেনা—আমি তোর জন্য পয়সা নিয়ে আসব।"

ওর দিদি ঠিক সেদিনের মতই অবাক হয়ে যায়— 'থলি! থলি দিয়ে কি হবে?"

দিদিকে পরিকল্পনাটা বেশ করে গুছিয়ে বলে জটা। দিদি ভ্রু কুঁচকে বলে—"ওঃ আচ্ছা মা আসুক তোকে এবার ইস্কুলে পাঠাব। জটা আবাক হয়ে যায়। মাতো কবে থেকেই বলে আসছে ইস্কুলে দেবে। হুঁ খেতে পায় না আবার ইস্কুল। মুখ গোমড়া করে বসে রইল জটা—রোজ রোজ না খেয়ে থাকার চেয়ে কাগজ কুড়ানো বুঝি খুব খারাপ।

ওর গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে মালা হেসে বলল—"ডাক্তার বলেছে মা শিগ্‌গিরই ছুটি পাবে—তুই আর আমি আনতে যাব—" জটা বলে— "কেন বাবা যাবে না—মাতো ভালো হয়ে গেছে—" সঙ্গে সঙ্গে মালার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—"কি জানি"

এর কদিন পরেই বাবা এল রাত্তির বেলা—ও শুয়ে বিছানায়। দরজা দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই চিৎকার শুরু ক'রে দিল— "দিন নেই, রাত নেই থাকিস কোথায়। বলি তোদের মান সম্মান নেই বলে কি আমারও সব গেছে নাকি! আমার মুখে চূনকালি দিবি ভেবেছিস—যেমন মার চরিত্তির—তেমনি তাঁর গুণধরী কন্যা—"

মালা তখন উনুনে হওয়া দিচ্ছিল—উনুনের শিখা থেকে এক একবার লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছিল মুখে—যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। পাথরের মত শক্ত মুখখানা একটু

আড় করে বলল-- "আমাকে মা পাওনি— অত চোটপাট কিসের—আমাদের জন্যে কত তোমার দরদ—মা যে হাসপাতালে গেছে ক' পয়সা দিয়েছ শুনি—খেয়েছ তো—টাকা এল কোত্থেকে—গাছ থেকে নাকি—এ মাসে এক টাকাও তো দিলে না—"

বাবা ছুটে গিয়ে মালার চুল ধরে টেনে তুলল—"এক থাপ্পড়ে মুখ ভেঙ্গে দেব হারামজাদী—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—" মালাও সমানে চিৎকার করে বলল—"বলব না, একশবার বলব—ভাত দাও না-অত শাসন কিসের। আমি আমার মা পথে নেমেছি তোমার জন্যে-" বাবার ধাক্কায় দিদিকে দেওয়ালের ওপর ছিটকে পড়তে দেখে জটা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল—"খুন করে ফেলেছে গো—ও পুলিশ, ও পুলিশ—"

বাবা লাফিয়ে এসে জটার মুখখানা চেপে ধরল-"চুপ চুপ, ফের চেঁচাবি তো গলা টিপে ধরব-"

জটা আতঙ্ক মেশা বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। যেন বাবার হাতখানা ওর গলার ওপর চেপে বসেছে।

দেওয়ালে লেগে মালার কপালটা ছড়ে গেছে, রক্ত জমে উঠেছে সেখানে। সোজা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"ফের আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ— আমিও বাপের বেটি—তোমাকে খুন করে ফেলব—"

বাবা জটার পাশে বসে ছিল। ভয়ে জটা নড়তে পর্যন্ত পারছিল না। দিদি উনুনের সামনে পিছন ফিরে বসল এদিকে আর তাকিয়েও দেখল না। বাবা কোমরের গোঁজ খুলে দুখানা নোট বার করে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল "এই দিলাম আর আমার কাছে নেই"

দিদি যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। উনুনে আঁচ উঠে গেছে সেদিকে তার খেয়ালও নেই বোধ হয়। জটা বুঝতে পারছিল দিদি কাঁদছে কারণ ওর পিঠটা একটু কাঁপছিল। বাবা অতশত দেখেওনি নিশ্চল বসে থেকে থেকে হঠাৎই উঠে চলে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক বাতাস এসে নোট দুখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরের কোণে। জটা চেঁচিয়ে উঠল—"টাকা উড়ে যাচ্ছে ধর ধর"।

দিদি একান্ত অনিচ্ছায় সামান্য আড় হয়ে নোট দুখানার ওপর একটা কৌটা চাপা দিল।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জটা কিছুই জানে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল মোড়ের ওই বাড়িটার মস্ত হলঘরখানায় কি করে ঢুকে পড়েছে ও। লাল টকটকে কার্পেটের ওপর রাশি রাশি নোট হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে, কোন কোনটা একেবারে ওর গায়ে এসে লাগছে। জটা হাত বাড়িয়ে কখানা ধ'রে ফেলেছে—এমন সময় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে নোট কখানা ছিনিয়ে নিল সেই কাগজ কুড়নো বড় ছেলেটা। জটা চিৎকার ক'রে উঠল "প্রমীলা মাসি—" সঙ্গে সঙ্গে সে ওকে এক ধাক্কায় নোটের গাদার ওপর ফেলে দিয়ে বিশ্রীভাবে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। জটার কি যেন হ'ল সে যত উঠতে চেষ্টা করছে ততই

নোট গুলোতে আঠার মত আটকে যাচ্ছে—তুলবার জন্য ডাকল, কেউ এল না—ভয়ে হাঁস ফাঁস করতে করতে জটার ঘুম ভাঙ্গল।

মনটা তেতো হয়ে গেল। ইচ্ছে হ'তে লাগল—পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে বিছানা বালিশগুলো মাটিতে ফেলে দেয় মশারির দড়িগুলো পট পট ক'রে ছিঁড়ে-হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে ঘরময় দাপিয়ে হাঁড়িকুড়ি উল্টে দেয়, শিশি বোতল ভাঙ্গে, দিদি ধরতে এলে তার চুল ছিঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কিন্তু গভীর এক আলস্য তাকে বিছানায় অনড় ক'রে রাখল। হাঁক-ডাক করে দিদির সাড়া নেবার শক্তিটুকুও যেন ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তখনই ওর মনে পড়ল বাবা টাকা দিয়ে গেছে আজ আর ওকে না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে না। আজ দিদি ঠিক রাঁধবে। মনে হ'তে আরামে বালিশটা ভালো করে জড়িয়ে ধরে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশীক্ষণ হয়ত ঘুমোয়নি—দিদি এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙ্গালো। "কি কুঁড়ে রে বাবা, কখন সকাল হ'য়ে গেছে—পাছে কাজ করতে হয় তাই ভান ধ'রে পড়ে আছিস না—নে ওঠ মুড়ি মেখেছি চা দিয়ে খা—"

খেতে খেতে মালা বলল—"আজ আমরা মাকে আনতে যাব—"

"কাল বাবাকে বললি না কেন"—

"কেন বলব—বাবা খোঁজ নিলেই জানতে পারবে—" একটু ভেবে বলল—"বোধহয় জানে—নাহ'লে টাকা দিল কেন?"

"বাবা গেলে ভাল হত—"

"বেশ,হ'ত তো হ'ত-তুই না যাস, আমি যাব-ট্যাক্সি করে নিয়ে আসব মাকে দেখিস—"

ট্যাক্সির নামে জটার ওজর গুলো নিমেষে হওয়া হয়ে গেল। উত্তেজনায় শিরায় শিরায় রক্তের ঘোড়দৌড় শুরু হল। জটা আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল— "আমিও যাব দিদি, ট্যাক্সি চড়বো—" নিতান্ত আগ্রহের ভঙ্গিতে মালা বলল— "গেলে,যাবি—"

তারপর কিছু যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলল—"মা ফিরলেই বলব তোকে ইস্কুলে দিতে, উচ্ছন্নে যাচ্ছিস একেবারে—"

জটা বেজার মুখে বসে রইল। সেই কাগজ কুড়ানোর পরিকল্পনাটা বলা থেকে দিদি ধ'রেই নিয়েছে ও গোল্লায় গেছে। ওরাও তো মানুষ রে বাবা! ঠিকই ছেলেগুলো ভাল নয়— তা যে কাজ করে! পরক্ষণেই মনে হ'ল বাবা তো ভালো কাজ করে বাবা কি ভাল! তবু বাবার জন্য দিদি রোজ রেঁধেছে, গুছিয়ে খেতেও দিয়েছে—কতদিন ধ'রে ও গিয়ে ভাত দিয়ে এসেছে কারখানায়। তাহ'লে ওই ছেলেগুলোর কি দোষ। কাগজ বেচে ওরাই হয়ত ওদের মা বোনকে টাকা দেয়। জটাও তো তাই চেয়েছিল। দিদির মনে কেন যে এমন উল্টো ধারণা হ'ল কিছুই বুঝতে পারল না সে। আর ইস্কুল—হ্যাঁ তোমরা যদি দাও ইস্কুল যাবো। কখনও বলেনি ইস্কুলে যাবো না।

মাকে ট্যাক্সি ক'রে আনলেও বস্তিতে ঢুকে ঘরে পৌঁছাতেও অনেকটা হাঁটতে হ'ল। দিদির কাঁধে ভর দিয়ে জটার হাত ধরে ঘরে ঢুকে মা একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

মালা হাত পাখা এনে হাওয়া করতে করতে বলল "জল খাবে মা—" বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল কপালে—আঁচলে যত্ন ক'রে মুছে দিল। উৎকণ্ঠিত মুখে নিতান্ত অপরাধীর মত এক কোণে দাঁড়িয়ে জটা দেখতে লাগল মার বুকটা কত দ্রুত উঠছে নামছে।

একটু সুস্থির হ'তে ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— "কিছু হয়নি মা, এমন পোড়া জান কি যায় রে" মালার চোখে জল এসে পড়ল— "তুমি মরে গেলে আমরা কার কাছে থাকতাম-তুমি যে ছিলে না—জটাকে আমি কতদিন একমুঠো ভাতও খেতে দিতে পারিনি। ঘরে এসে হুজ্জোতি করবে—তাই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে থেকেছি—"

মা দুর্বল হাতখানা দিদির পিঠে রেখে বললেন—"তোর খুব কষ্ট হয়েছে না রে—হাসপাতালে শুয়ে কি আমারও শান্তি ছিল মা—কেবল ভেবেছি জটাকে আর বাঁচাতে পারলাম না—ও যে বড্ড ছোট—"

চোখের কোনে জল জমল—বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে—"আর তোর যে কি হবে ?—তোর বাবা কি আর কিছু করবে।" সঙ্গে সঙ্গে সেদিন রাতের কথাটা মালার মনের উপর ভেসে উঠল। মাকে ও কিছুই বলেনি, বলবেও না।

জটা এগিয়ে এসে বলল "আমি টাকা এনে দেব মা—"

জটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা বললেন "তা তো দিবি বাবা—আগে বড় হও"

তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন "হ্যাঁরে, মালা আমার কাজটা ধরেছিস তো ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ধরেছি। গিন্নিমাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলে এসেছি তুমি হাসপাতাল থেকে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়েই কাজে লাগবে"

"সে কি তুই করছিস না—ওরা যদি নতুন লোক রাখে।"

"তুমি দেখ, ওরা তোমায় তাড়াবে না আর তাড়ালেই বা কাজের কি অভাব—"

"দূর বোকা, বিপদে আপদে গিন্নিমার কাছে যে আমি কত সাহায্য পেয়েছি সে কি সবাই করে রে। ওনাদের কল্যাণে আমি তোদের বাঁচিয়েছি। তোর বাবাকেও একবার যমের মুখ থেকে টেনে এনেছি—তুই কাজটা ধরতে পারতিস—"

"আমি কাজ ধরিচি মা। অত কম টাকায় আমাদের পোষাবে না। আমি ওই মোড়ের বড় বাড়িটায় কাজ ধরেছি"—

মা আঁতকে উঠলেন "ওই বাড়ি! জানিস তোর বাবার আগের কারখানাটা বেচে দিয়ে ওরা আমাদের তিন বছর উপোস করিয়েছিল। সেই থেকেই তো আমার সংসারটায় এমন আগুন লেগে গেল—"

"তা কি হবে, মাসে একশ টাকা করে দেবে থাকার ঘর দেবে, এই দেখ শাড়ি দিয়েছে—"

শাড়িটা টেনে বার করতেই জটার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। এটা যে প্রমীলা মাসির শাড়ি! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জটা। মা মুখ ফিরিয়েই রইলেন। তাকিয়ে দেখার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। বোধহয় সেই দিনগুলোর কথা তখন

তাঁর দুর্বল স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল।

মার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মালা আবার কথা পাড়ল "কি করে কাজটা পেলাম জান?" মা ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। মালা সোৎসাহে বলতে লাগল—"ওদের একটা ঝিকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে, কিছুদিন থেকে অসুখে ভুগছিল। মালিক বলল বাড়ি চলে যাও' শরীর ভাল হ'লে এস কাজের ব্যবস্থা করে দেব। অনেক দিনের লোক, খুব হাতে পায়ে ধরেছিল—তোমাদের ঘরে খেটে খেটে অসুখ করেছে তোমরা চিকিচ্চে করাও হাসপাতালে দাও বাড়িতে আমার কেউ নেই—কে দেখবে'—ওরা গ্রাহ্যই করেনি। লোক দিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। বেচারা যাওয়ার সময় হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলেছে। দেশে গেলে আমি আর বাঁচব না"

"কি পিশাচ মা—"

যন্ত্রণায় দুমড়ে গেল জটার শরীর। ইচ্ছে হল প্রচন্ড ঘুঁষিতে দিদির কথাগুলো ও বন্ধ ক'রে দেয়। শাড়িখানা কুচি কুচি ক'রে ছেঁড়ে। ওকে যদি একবার বলত দিদি তাহলে ও ঠিক প্রমীলা মাসীকে বাড়িতে নিয়ে আসত, হাসপাতালে নিয়ে যেত। প্রমীলা মাসি তো ওকেও বলতে পারত সেদিন পার্কে যখন দেখা হল। দুঃখে ক্ষোভে আক্রোশে নিজের নখ দিয়ে মাটির দেওয়ালটা আঁচড়াতে লাগল।

মা ধীরে ধীরে ক্লান্ত গলায় বললেন, "ও চাকরিটা তুই না নিলেই পারতিস। আমরা যে গরিব, গরিবের চোখের জল আমাদের সয় না—"

মালা ইতস্ততঃ ক'রে বলল "কিন্তু অনেকগুলো টাকা—" মা জোর দিয়ে বললেন "তা হোক, কাজের কি অভাব? ও কাজ তুই নিতে পারবি না—" জটার আঙ্গুল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল—তবুও সে থামতে পারল না। তার ছোট্ট হৃদয়টা অনেক বেশি রক্তাক্ত।

ক'নে দেখা

শুভা বড্ড কালো। ইদানীং দেখা যাচ্ছে এটাই একটা প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। শুভার মা নলিনী ক্ষোভের সাথে বলেন—"কালো কি হয় না কতই হয়, কালো মেয়েরও একটা ছিরি ছাঁদ থাকে। আপদ, যেন পাকানো দড়ি—"

ওর বাবা সুবল মিনমিন করে বলার চেষ্টা করেন—"তা তো হবেই সেই ছোট্টবেলা থেকে তোমার সাথে সাথে সংসারের কাজ করছে—"

"না, খাটে কি আর কারো মেয়ে—সব টবের ফুল করে সাজিয়ে রাখে,একে তো কালপেঁচা তায় যদি কাজে কম্মে না হয় লোকে নেবে কি দেখে—"

শুভা বাবা-মার প্রথম সন্তান, জ্ঞান বুদ্ধি হ'য়ে থেকে শুনে এসেছে তার চেহারায় আকৃষ্ট হবার কিছু নেই। স্কুলে, পাড়ায় তার সমবয়সী মেয়েরাও এনিয়ে হাসি মস্করা কম করে না। বয়স্করা সামনাসামনি বলেছেন—"মাকে বলিস, একটু দুধ ঘি 'বেশি' করে খাওয়াতে—"

শুভা মনমরা নির্জীব মেয়ে। শুকনো পাপড়ির মত গুটিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে আছে। বাড়িতে সে সকলের চোখের আড়ালে স'রে থাকতেই ভালোবাসে, যাতায়াতের পথে কারো দিকেই চোখ তুলে তাকায় না। তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই—নিস্তেজ,নিরুৎসুক একঘেঁয়ে তার কথা বলার ধরন। অথচ তার নিজস্ব কোন জগতেরও অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। মা, ঠাকুমা, পিসিমাকে নিয়ে তাদের সংসার। তাঁদের মন বুঝেই শুভা সর্বদা চলে এসেছে। ছোট বেলায় সে ছিল লক্ষ্মী মেয়ে-পড়াশুনো করে, কাজেকর্মে চমৎকার। বড় হ'তেই গোল বেঁধেছে। স্কুলের শেষ ক্লাসে উঠেই পাড়ায় তার বয়সী মেয়েদের একের পর এক বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। শুভার এক আধটা সম্বন্ধ এল। কিন্তু তারপর যা হ'ল তাতে মা ঠাকুমা পিসিমা মেয়ের চেহারা সম্পর্কে অধিক সচেতন হ'লেন। সকলে একমত হ'য়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এ মেয়েকে বেশি লেখাপড়া শেখালে শেষে পাত্র জোটান মুশকিল হবে। আর বয়স কম থাকতে বিয়ে দিলে তবু যা হোক কোন সম্ভাবনা আছে—চেহরায় বয়সের ছাপ পড়ে গেলে আর বিয়ে দেবার আশাই থাকবে না।

কিছু না কিছু না করেও শুভা বার পাঁচেক দর্শনীয় বস্তু হিসাবে বাজারে হাজির হয়েছে— আর সসম্মানে ফিরেও এসেছে। ইতিমধ্যে যে সময়টা পার হ'য়ে গেছে তারই সুযোগে সে শেষ পর্যন্ত বি এ, পাস করে ফেলেছে।

সুবল খুশি হ'য়ে বললেন—"বসে থেকে আর কি করবে, বিটি টিটি কিছু একটা পড়ুক বরং।"

মা ঠাকুমা পিসিমা রুখে দাঁড়ালেন—"এখনও তো ভিটেমাটি চাটি হয়নি। কালে কালে আর একজন ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, এটাকে আগে বিদেয় কর।"

ঠাকুমা আফসোস করে বললেন—"কত কানা খোঁড়া মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে" সুবল বাধা দিয়ে বললেন—"হবে না কেন মা, আমি তো লাখ দুলাখ খরচা করতে পারব না—তোমার আরও দুজন নাতনি রয়েছে তো—"

"হবে কি করে, উনি আগেই গিয়ে হাত জোড় করে বলতে শুরু করবেন—"আমি ছা পোষা মানুষ-তেমন কিছু খরচা পাতি করার মত ক্ষমতা নেই—"

মা অবিকল বাবার ভঙ্গি নকল করে বললেন।

পিসীমা হাসতে হাসতে বলেন—"তুই বাপু হাসাতে পারিস বটে বড় বৌ—"

"না ন'দি এ হাসির কথা না—আমার হাড় পিত্তি জ্বলে গেছে—আমি মা বলেই মেয়ের সম্বন্ধ দেখি—অন্য কেউ হ'লে বলতাম ওই কালপেঁচা মেয়ে নিয়ে চুলোয় যাও"—মা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সুবল আস্তে আস্তে উঠে যান। বাড়িটা পৈতৃক। মফঃস্বল শহর—কলকাতার কোল ঘেঁষে। তবু গ্রাম্যতা টিঁকে আছে। শুধু যে প্রাকৃতিক পরিবেশেই তা নয়, টিঁকে আছে মানুষের সংস্কারে, ক্রিয়া-কর্মে, আচার অনুষ্ঠানে। তাঁরা যে একেবারে এখানকার বনেদী বাসিন্দা। মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাঁর কোন ভাবনা নেই! কিন্তু কোথাও পৌঁছাতে পারছেন না। সুবল নিজেও তেমন দৃঢ়চেতা পুরুষ নয়। কিছু একটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরবেন সে জোর নেই। অনেকটা যেন তাঁর নিরুপায় মেয়ের সঙ্গে তাঁরও একটা মিল আছে। নিরুত্তাপ নির্বিরোধী মানুষ, চাকরি করেন ঘরসংসার করেন এর বেশি কোন কিছুতে জড়াতে চান না। এখন মেয়েটা ফেলেছে বিপাকে।

স্ত্রী নলিনী উঠতে বসতে, জানাতে ত্রুটি রাখেন না যে শুভা তার বাবার মতই—যেমন চেহারায়—তেমনি স্বভাবে। মেয়ের বিয়ে দিতে শেষে বসতবাড়িটা বিকিয়ে দেবেন তাতো সম্ভব নয়!

সংসারে কোনে প্রচেষ্টাই পুরোপুরি ব্যর্থ হয় না। শুভার পিসীমার ননদ আশলতা একটি সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। পাত্র মোটামুটি চাকরি বাকরি করে—বাড়িতে বুড়ো মা আছেন। সকলের ছোট—বড় ভায়েরা পৃথক অন্ন। পাত্রের মা ঘরোয়া একটি মেয়ে চান। আশা শতমুখে শুভার প্রশংসা করেছেন তাঁর কাছে—"খুবই ঠান্ডা, খুবই কাজের মেয়ে, ঠাকুমা, পিসিমা নিয়েই তো ওদের সংসার। পাঁচজনকে নিয়ে থাকার মত মন আছে—"

মা বাটা সাজিয়ে পান গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন—"মেয়ের রং কালো সে কথাটা বলে নিয়েছেন তো!"

"তা বলেছি—বাপু তবে একটু নরম করে—বলেছি তেমন ফর্সা নয়—মাজা বলা যায়" —নিজের বাকপটুতায় নিজেই খুশি হ'য়ে হাসেন আশালতা।

দূরে দূরে থাকে শুভা, তবু সবই কানে আসে তার। আবার তাকে একদল লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভেবে মনটা আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। প্রথম প্রথম এমনি সেজে গুজে গিয়ে হাজির হওয়াটাকে সে পুতুল খেলার মতই নির্বিকারভাবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাপ মায়ের আশাহত কালিপড়া চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়েছে। সবার থেকে আড়াল করা গলির দিকে জানালায় দাঁড়িয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলেছে। সেই সব দর্শকদের নিষ্প্রাণ শীতল দৃষ্টির স্মৃতি তাকে নতুন করে পীড়িত করে তুলল।

শুভার পরের বোন নিভা দিদিকে খুঁজে পেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—"ঠাকুমা তোকে ডাকছে যে—শুনতে পাসনি—"

"কেন রে"—শুভা অলস গলায় বলে।

ঠোঁট টিপে গালে টোল ফেলে নিভা বলে—"আমি তার কি জানি, নিজে গিয়ে দেখেই এস না।"

শুভা এসে দাঁড়ালে ঠাকুমা বলেন—"প্রণাম কর পিসিমাকে—পিসিমার ননদ পিসিমাই হন।"

শুভা সঙ্গে সঙ্গে গড় হয়ে প্রণাম করে। আশা শুভার থুঁতনি ছুঁয়ে চুমো খান—মুখখানা একটু তুলে ধরে বলেন—"শাশুড়িকে এমনি গড় হয়ে প্রণাম করবি তাহলেই কেল্লা ফতে!"

মা টেনে টেনে হাসেন—"বিয়ে বলে কথা দিদি, লাখ কথা না পাড়লে কি বিয়ে হয়—। আজকাল আর ওসব কেউ দেখে না দিদি, আমার মেয়ে বলে বলছি না—শুভাকে এমন করে শিক্ষা দিইছি—যেন শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি কথা শুনতে না হয়।"

"কি যে বল, আমি যেন আর তা জানি না—আমি জোর গলায় সব্বাইকে বলি—শুভাকে দ্যাখ, লেখাপড়া তো কম শেখেনি, দেখে আয় তার চাল চলতি।"

"ঘরকন্নার কাজ বল, ঠাকুরদেবতার সেবা বল—কি না শিখিয়েছি"—পিসিমা যোগ করে দেন।

শুভা এক কোণে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা হেসে বললেন—"যাও তো দিদি এখান থেকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন বিয়ের কথা শুনতে হবে না।"

শুভা পালিয়ে বাঁচে।

"মেয়ের আমাদের লজ্জাশরমও খুব। পাড়ায় দেখগে মেয়েগুলোর নামে কত কেচ্চা—আমাদের শুভার নামে অতিবড় শত্রুও কিছু বলতে পারবে না, সে আমরা বুক ফুলিয়ে বলব"—ঠাকুমা যথেষ্ট জোরের সাথেই বলেন।

আশা পিসিমা বাড়িতে যেন আশার তরঙ্গ তুলে দিয়ে গেলেন। বাবা, মা, ঠাকুমা, পিসিমা অসাধারণ তৎপর হয়ে উঠলেন।

পিসিমা ঘন ঘন আশালতার বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। ঠাকুমা গুরুদেবকে দিয়ে গুনিয়ে পড়িয়ে শুভদিন বেছে নিয়ে এলেন। বাবা আর পিসিমা সেই দিনক্ষণ মত পাত্রপক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন।

আর নলিনী পড়লেন শুভাকে নিয়ে—নানা জায়গা থেকে রকমারি সব জিনিস সংগ্রহ করে এনে কোনটা বেটে, কোনটা সেদ্ধ করে, কিছু সকালে কিছু রাত্রে কখনও মালিশ কখনও প্রলেপ পুলটিশ দিয়ে শুভার গায়ের রঙে চাকচিক্য ফোটানোর কঠিন প্রচেষ্টা চালালেন। বাবা মাখন কিনে দিলেন—সারা দিনে চারবেলা ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। ঠাকুমার ইচ্ছে ছিল শুভাকে দিয়ে শিবের উপোস করানো—কিন্তু পাছে শরীরটা আরও শুকিয়ে যায় তাই অগত্যা ভোরবেলা স্নান সেরে বাসি মুখে শিবের মাথায় জল ঢালাতেই রফা করতে হলো।

বাড়ির ঠিকে ঝি বাসনার মা ঘাট সেরে এসে বাসনের গোছা সাজাতে সাজাতে বলল—তোমার মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে, পাড়ায় তো একেবারে চোখ টাটিয়ে বাঁচে না।

"ওমা তারা কার কাছে শুনল। এ যে দেখছি যার বিয়ে তার হুঁশ নেই পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

মা এগিয়ে এলেন, ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন।

বাসনার মা বলল—"বলতে আর লাগবে কিসে—মেয়ে যাচ্ছে শিবের মাথায় জল ঢালতে।"

"মুখপোড়া পাড়ার লোকগুলো কী নচ্ছার—লোকে কি ব্রত পাব্বণ উঠিয়ে দিয়েছে নাকি আজকাল—এ পাড়ায় সব খেরেস্তান হয়েছে"—ঠাকুমা খর খর করে ওঠেন।

বাসনার মা জানতে চায়—"তা সম্বন্ধ কোথায় কি, আমরা তো দশ বিশ হাজার ঢালতে পারব না মা, আমার কালো মানিক কে নেবে?"

"পিসিমা যোগ করে দেন—এখন মেয়ের বরাত।"

"সে তো হাজার বার" বাসনার মা কথায় ইস্তফা দিয়ে নিজের কাজে চলে যায়।

সব কিছুর অন্তরালে নির্দিষ্ট দিনটি গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। নলিনী ক্রমশ হতাশ হয়ে দেখতে লাগলেন কোথায় কি? শুভার গায়ে গতরে না লেগেছে একরত্তি মেদ, না ধরেছে রঙে একটু চাকচিক্য। ঠাকুমা, পিসিমা বাবা সকলের চোখে মুখেই ওর এই বাগ না মানা চেহারার জন্য আশঙ্কার কালো ছায়া দুলতে থাকল। আর মরমে মরে যেতে লাগল শুভা।

অবশেষে একদিন রাত্রে সুবল আশঙ্কাটাকে পরিষ্কার ভাষায় রূপ দিলেন—"সরকারদা বলছিল যোগব্যায়ামে নাকি রোগাকে মোটা করা যায়, একটু আগে থাকতে যদি জানতাম।"

নলিনী ফ্যাঁস করে ওঠেন—"রাখ তোমার যোগব্যায়াম। কালো রঙ তো ফর্সা হবে না। একে দড়ির মতে পাকানো চেহারা, আরও পাকিয়ে যাক।"

সুবল নলিনীর কথার জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবনায় ডুবে গেলেন। তারপর হঠাৎ একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠলেন, "ওরা তো আর চেহারা চায়নি, শোভাকে যদি পছন্দ করে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাই খরচা করে দেব।"

নলিনী শুধু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখেন একবার, পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে নেন।

এদিকে কোন আয়োজনই থেমে রইল না। বাড়ি ঘর সাফসুফ হল—নলিনী একবারও শুভাকে কোন কাজে ডাকলেন না। শুভা ঘুরে ফিরে বারে বারে আয়নায় নিজেকে দেখল, চোখের কোলে কালি লেপা গর্তটা তেমনি গভীর, চোয়ালের হাড়ের তিনটি কোনা তেমনি প্রকট। আতঙ্কে আরও কালচে মেরে যেতে লাগল তার চেহারা। এক একবার ভাবল মাকে বলে, সে আর যাবে না কারো সামনে। কিন্তু কোথায় একটা দ্বিধা—একটা সঙ্কোচ তাকে বেঁধে রাখল।

অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে জোর মতভেদ হয়ে গেল বাবার সঙ্গে মা-পিসিমার। সুবলের বক্তব্য শুধু শুধু এখুনি কতকগুলো টাকা খসিয়ে কি লাভ।

সুকুমারদার মতে—আগে ওরা দেখেশুনে যাক পছন্দ করুক। মত দিক তারপর নয় আশীর্বাদে ভালো মন্দ খাওয়ালেই হবে।

নলিনী বললেন—"যাই হোক আত্মীয়ের মধ্যে পড়ে তো—তাছাড়া সকলে মিলে বলা কওয়ার সময় পাওয়া যায়—"

সুবলকে সুকুমারদার মত থেকে সরানো গেল না—। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে নির্দিষ্ট দিনে ওদের আনতে চলে গেলেন। নলিনী শুভাকে সাত তাড়াতাড়ি খাওয়াতে বসালেন। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে যদি মুখখানা একটু ভরাট লাগে। শুভা অবশ্য একমুঠো ভাতও গিলতে পারল না। কেবলই বমি আসছে, হাত পা ঠাণ্ডা হিম, ঘাম জমছে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে তার।

হাবভাব দেখেশুনে পিসিমা বললেন, "পেটে গ্যাস হয়েছে বোধহয়, সরবত করে দাও আর দিন পেলেন না -আজকেই তো উনি রোগ বাধিয়ে বসলেন—"

ঠাকুমা বললেন—"হ্যাঁ লো ছুড়ি বিয়ের চিন্তায় ঘুম ধরে না বুঝি—" শুভা কারুর কথায় জবাব দেয় না—সে জানে ওরই মত জ্বর বিকারে ভুগছে আজ বাড়িসুদ্ধ সবাই। এই নিয়ে পাঁচবার শুভাকে দেখতে এল—কে জানে এবারও পাত্রস্থ করা যাবে কিনা!

বিছানায় শুয়ে সারাটা দুপুরে একা একা ছটফট করেই কাটাল শুভা। আড়াইটে তিনটে নাগাদ বাবার বন্ধুর পুত্রবধূ এলেন ওকে সাজাতে। দিনক্ষণ কাঁটায় কাঁটায় হিসেব করে সুবল ভিতরে এলেন মেয়েকে বাইরে নিয়ে যেতে। শুভার সামনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। মেয়েকে চেনাই শক্ত। শুভা বুঝতে পারল বাবার অবস্থা। চড়া হাতের সাজানো মুখখানা কাচের পুতুলের মত ভাবলেশহীন লাগছে। হঠাৎই মাথাটা ঘুরে উঠল-বমি এসে গেল শুভার। বাবা ওকে ধরে বাইরে নিয়ে

এলেন—মা ছুটে এলেন—চোখে মুখে জলের ছিটে দিলেন-অসম্ভব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখখানা। মা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখলেন আলতো করে থুতনিটা ছুঁয়ে চুমু খেলেন। শুভার দুচোখে জল ভরে উঠল। বাবা বলে উঠলেন—"একি—একি শুভক্ষণে কাঁদতে বসলে তোমরা—"।

নলিনী নিজের চোখ মুছলেন, মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিলেন। দুহাত জুড়ে কারো উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন হয়ত মেয়ের সাফল্য কামনা করলেন।

শুভাকে মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুবল সোজা হাজির করলেন অতিথিদের সামনে। তিন চার জন নানা বয়সের মহিলা। একজনই মাত্র বয়স্ক ভদ্রলোক। মাটিতে বসার ব্যবস্থা—শুভা জড়সড় হ'য়ে আসনের একপাশে বসে পড়ল। চোখ আনত—হাতে শাড়ির আঁচলের একটি কোণ শক্ত করে ধরা। চোখ না তুলেও সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে অভ্যাগতদের নড়া চড়া, কাপড়ের খসখসানি, নিঃশ্বাসের ওঠা নামা অনুভব করে যাচ্ছে। সে ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সবাই যে কয়েক মিনিটের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল একটি নিঃশ্বাসও পড়েনি এটা শুভার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে। মেয়ের রঙ কালো এটা তাঁরা শুনেই এসেছেন কিন্তু এত কালো ধরতে পারেননি সম্ভবতঃ।

ছেলের মা প্রথম কথা বললেন—"তুমি বি এ পাস করেছ না মা—" বেশ সহানুভূতিভরা গলা।

শুভা নিচু গলায় ফিস ফিস করে বলল— "হ্যাঁ"

আর পড়বে না—" অন্য একজন প্রশ্ন করল।

শুভা একবার দরজার দিকে তাকাল—দেখা না গেলেও মা যে দরজার কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন এটা সে জানে—বলল—"না—তবে—যদি"—এখানেই থেমে গেল ঠিক কি বলার ইচ্ছে ছিল মনে করতে পারল না।

ছেলের মা আবার প্রশ্ন করলেন—"রান্নাবান্না জানো তো মা—"

পিসিমা হেসে বললেন—"শাক সুক্তো থেকে সব রকম—"

অল্পবয়সী একটি মেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল—"বা-বা" পেছনে বসে থাকা বউটি উঠে এসে শুভার পাশে বসল—"সেলাই জানেন—"সুবল একগাল হেসে বললেন—"সেলাই বোনা, গান কিছুই শেখাতে বাকি রাখিনি। তাছাড়া ওর মারও হাতের কাজ খুব সুক্ষ্ম—"

"ক্রুশের বোনা না কাঁটার—"ও পাশের বৌটি জানতে চায়। পিসিমা তাড়াতাড়ি কতকগুলো সেলাই টেনে এনে সামনে মেলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলল—"গান গাইতে বলুন না বৌদি—"

সুবল তাড়াতাড়ি গিয়ে হারমোনিয়াম নামিয়ে আনলেন।

বৌটি জানতে চাইল কি গান সে শেখে। মেয়েটার ফরমাস মান্না দে'র পুজোর গান।

শুভা আবার দরজার দিকে তাকাল—মা দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে। এক ফাঁকে শাড়িটা বদলে এসেছেন। ছোট ভাই বোনেরা মার গা ঘেঁষে লেপটে রয়েছে। আগের মতই মিনমিনে গলায় শুভা জানাল—"আধুনিক তো শিখিনি—আমাদের বাড়িতে পছন্দ করে না—"

"শ্যামা সঙ্গীত, কীর্তন এসব ও জানে দিদি—সবই দু'চারখানা শিখে রেখেছে যেখানে যেমন চলে"—ছেলের মাকে উদ্দেশ্য করে জানিয়ে রাখলেন।

ততক্ষণে শুভা হারমোনিয়াম ধরেছে—কিছুটা জড়তা কেটেছে।

সুবল বললেন—"আর একবার চা আনতে বলি কি বলেন—"

শুভা দেখল বাবা সেই থেকে জোড়া হাত করেই আছেন—কি নিদারণ বিপন্ন চেহারা। নিজের উপর বিতৃষ্ণা এল, উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করল।

তারপর চোখ বুঁজে গান ধরল—"চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে—"

বৌটি ভদ্রলোককে বললেন—"গলা মন্দ না-কি বলেন—"

সকলেই অনর্গল কথা বলে চলেছে। মা আবার একবার চা জলখাবার দিয়ে গেছেন—। তারই মধ্যে শুভার গান শেষ হল।

বৌটি হঠাৎ শুভার খোঁপাটা টিপে ধরে বলল—"বেশ ফাঁপিয়ে বাঁধা তবে চুল আছে মোটামুটি—"

ভদ্রমহিলা বললেন—"খুলতেই বল না—"

"আর খুলতে হবে না সামনে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দেখুন—কিছু মনে করবেন না—ঠাকুরপো বলেছে হাতের লেখাটা একটু দেখে যেতে—"

বাবাকে নিরস্ত করে শুভাই উঠে দাঁড়াল। বৌটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলল—"মোটামুটি লম্বা তবে বড্ড রোগা—"

পিসিমা কথা পড়তে দিলেন না— বোধহয় প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন—"বিয়ের জল পড়লে দেখবে মা-শাঁসে জলে চেহারা কেমন খুলে যাবে—"

শুভা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ভদ্রমহিলা এবার পিসিমাকে নিয়ে পড়লেন—"তবে তোমার ননদ যে বলেছিল—মেয়ের রং কিন্তু বেশ কালো—"

পিসিমা চিঁড়ে ভেজান গলায় বললেন—"এই শুধু আমাদের কপালের দোষ দিদি।"

ঠাকুমা বললেন—"না হলে আমার নাতনি বলে বলছিনে অমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে, জুড়ি মেলা ভার।"

শুভা কলেজের একটা নোটখাতা এনে বৌটির হাতে দিল। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখার জন্য। উল্টে পাল্টে দেখে বৌটি খাতা ফেরত দিয়ে দিল। শুভা ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এল। ভদ্রমহিলা ওর মাথায় হাত রেখেছিলেন—কিন্তু কি যে বললেন শুভা ধরতে পারেনি।

গলির ধারের জানালাটার সামনে শুভা একা আধো অন্ধকার বাইরেটার দিকে

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। ওদের শীতল দৃষ্টি ওর গরম মোমের মত আকারহীন তারল্যের ওপর নিথর কঠিন স্তর জমিয়ে দিচ্ছে যেন।

নলিনী এসে অতিথিদের সামনে বসেছেন, জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন দেখলেন মেয়ে।"

ভদ্রমহিলার বদলে বৌটিই জবাব দিল—"মন্দ কি, তবে আমাদের পছন্দ অপছন্দে কি হবে বলুন, ছেলের যদি পছন্দ হয়।"

পিসিমা ভদ্রমহিলাকে ধরে বসলেন— "আশা কিন্তু বলল—আপনার পছন্দই সব।"

ভদ্রমহিলা ভালমানুষের মত হাসলেন—"আজকালকার ছেলে তো, তার পছন্দ অপছন্দের কথাটাও তো দেখতে হবে। আমাদের কালে ছিল বাপমায়ে বিয়ে দিত—বৌ হত দাসী বাঁদী। এখন কি আর কেউ ভাবতে পারে ছেলের বৌ এসে ভাত রেঁধে খাওয়াবে।"

বৌটি হাসতে হাসতে বলল—"আরও দুটি মেয়ের সন্ধান আছে সেগুলো দেখা হলে তবে ঠিক হবে।"

সুবল তেমনি হাত জোড়া ভঙ্গিতেই বললেন— "সে তো বটেই। তাহলে আমরা —থেমে গিয়ে বললেন, আপনাদের মতামত জানাবেন তো।"

ভদ্রমহিলা উঠতে উঠতে বললেন— "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশা তো সবই জানতে পারবে —তবে কি জানেন আপনারা চেনা জানা আত্মীয়ের মধ্যে—আপনার মেয়েকে নিতে পারলে খুবই খুশি হব—নরম তরিবত মেয়ে—"

সুবল, নলিনী, পিসিমা ঠাকুমাকে নিশ্চুপ করে দিয়ে ওঁরা উঠলেন। সুবল ওঁদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। সুবলকে আর তাঁরা সঙ্গে নিতে চাইলেন না।

শুভাদের বাড়িতে সেদিন যে আঁধার নামল তা বোধহয় আলকাতরার চেয়েও গাঢ়। সবাই যেন অপরাধী—গর্হিত কিছু করে কেউ আর কারো মুখের দিকে চোখতুলে তাকাতে পারছে না। জ্বর বিকার কেটে গেছে, এখন শুধু সীমাহীন অবসাদ। ভাই বোনেরা যেন বোবা হ'য়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে একবার একে একবার ওকে দেখছে।

দেখতে দেখতে দিন পনের পেরিয়ে গেল—কোন খবর এল না। নতুন কিছু নয়। এরকমটাই ঘটবার কথা।

পিসিমা বললেন—"বুড়ি মহা টেঁটিয়া। হাজার দশেক ছাড়ব বললে এখুনি রাজি হ'য়ে যায়। টাকা খিঁচবার ধান্ধা আর কি—"

নলিনী ফ্যাকাশে মুখে যন্ত্রের মত চলছেন ফিরছেন। ঠাকুমার প্রেসার বেড়েছে। সুবল বিছানা নিলেন তাঁর রক্তচাপ বড্ডকম। শুভা একদিন সন্ধার অন্ধকারে বাবার বিছানার পাশে বসে গরম দুধ ঠান্ডা করতে করতে বলল—"বাবা আমি চাকরি করব"—

সুবল ওই শরীরেও তড়াক করে উঠে বসলেন—"চাকরি করবি—"

"হ্যাঁ 'বাবা—তোমরা আর আমার জন্য ওসব করো না—" শুভা কেঁদে ফেলে —"এতদিন বসে না থেকে কিছু একটা করলেই হ'ত"—

সুবল মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন—"ঠিকই তো —সুকুমারদা কবেই আমাকে বলেছিলেন— কিন্তু তোর মা-রা রাজি হবে তো—" তুমি চুপ করে শোও তো —সে আমি দেখব—আর এ সবের মধ্যে যাবোই না—"

সুবল সবাইকে ডেকে ডেকে শোনালেন মেয়ের অভিমত। ঠাকুমা পিসিমা স্তব্ধ বিমূঢ় হ'য়ে রইলেন খানিকক্ষণ তারপর বললেন— "তা কি করে —বড়র বিয়ে না হ'লে তো পরেরটারও বিয়ে আটকে যাবে—"

সুবল ক্লান্ত সুরে বললেন— "ওই তো আমার প্রথম সন্তান—সংসারে দুটো বাড়তি টাকা-মানে আমার সাহায্য—" থেমে একটু দম নিয়ে বললেন— "তাছাড়া আজকাল চাকরি কি মেলে —বিয়ের চেষ্টা যেমন চলছে চলুক—সে তো আর তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ না—পেলে বিয়ে দিয়ে দেব—"

শুভা এই প্রথম বাড়িতে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করল। টাইপ শিখতে ভর্তি হল একটা স্কুলে। আশালতা অবশ্য বেশ কিছুদিন পরে খবর এনেছিল—কালোয় ওদের আপত্তি ছিল না, মেয়ে একেবারে হাড়গিলে—শুনে ছেলে আর দেখতে আসতে চায়নি।

এরপর বছর দুয়েক পার হয়ে গেছে। ওদের শহরে সরকার থেকে একটা কাপড়ের দোকান উদ্বোধন হ'ল—আর সেখানে চাকরি পেল শুভা। প্রথমে খবরটা গোপন থাকলেও দুচারদিনের মধ্যে পাড়াময় চাউর হয়ে গেল। মফঃস্বল শহরে একটা মেয়ে দোকানে চাকরি করছে—প্রতিবেশী মহলে তার প্রতিক্রিয়াটা বিরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মার মুখ কালো, ঠাকুমা পিসিমা সুবলকে ধরে ছিছিক্কার করলেন। ভদ্র ঘরের মেয়ে দোকানে চাকরি নিলে পরিবারের মান সম্মান যে কতখানি নেমে যায় আর তাতে করে যে অন্য মেয়েদুটোর বিয়ে দিতে কত ঘোল খেতে হবে! কোন্ আক্কোল এ কাজ সুবল করলেন— নিশ্চয়ই মেয়ের পরামর্শে— নিপাট ভালো মানুষ মেয়ে—দেখে কে বলবে—তাঁরা তো কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেছেন।

পাড়ার লোক বলল—"যেমন মেয়ের ছিরি—তেমনি তার চাকরি" মা আফসোস করে বললেন—" অফিসের চাকরি যদি হ'ত—কেউ কি আর একটা কথা বলতে পারত!"

সুবল মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— "যেতে দে দুদিন—দুনিয়াটা কার বশ—না টাকার!"

অবশ্য প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে দোকানের একখানা চমৎকার শাড়ি এনে দিল শুভা মাকে। মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কি আড়াল করলেন নলিনী মেয়ের কাছ থেকে—খুশি খুশি লজ্জা না বিরক্তি ধরতে পারল না শুভা। বোনেরা এসে টানাটানি শুরু করল শাড়িখানা নিয়ে। সুবল কাপড় হাতে নিয়ে মাকে বললেন—"মনে আছে মা—আমি চাকরি পেয়ে তোমায় ফরাসডাঙ্গার কাপড় এনে দিয়েছিলাম?"

ঠাকুমা পিসিমা শুকনো মুখে বসে রইলেন-একটি কথাও বললেন না।

ধীরে ধীরে তিক্ততা কমে এল। চাকরিটা গা সওয়া হ'ল। তার আর্থিক দিকটাও গণ্য হ'তে শুরু করল। তবু নলিনী একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে সুবলকে বললেন—"মেয়ের খাবে কতদিন—ওকে বিদেয় না করলে যে আর একটার সম্বন্ধ দেখতে পারছি না।—"

সুবল হাসেন—"ওর কোথায় খাই—টাকা তো ব্যাঙ্কে রাখছি—দেখনা তোমরা—বলেই তো রেখেছি—পেলে বিয়ে দিয়ে দেব—"

সবাই বলেছিল সিলভার টনিক পড়ুক—শুভার চেহারা দেখতে দেখতে ফিরে যাবে। কিন্তু না—হাড়ের কাঠামো যেমন ছিল তেমনিই আছে। কালো রঙ ফিকে হয়নি। শুধু চোখ মুখের সেই নির্জীব নিস্পৃহ ভাবটা কেটে গিয়ে একটা স্বাভাবিক সাবলীলতা ফুটে উঠেছে। নিজেকে নিয়ে লজ্জা, সকলের চোখের সামনে অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব বিদায় নিয়েছে। বেশ স্থিতধী—নিজের বক্তব্য সহজেই প্রকাশের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সব চেয়ে বেশি একটা প্রাণচাঞ্চল্য ওকে আগাগোড়া নতুন করে দিয়েছে। মা পিসিমা শাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন—মেয়েটা না বেচাল হয়ে যায়—শুভা প্রাণখুলে হাসে—হাসিতে ঝরনার সুর বেজে ওঠে ওঁরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখেন—ভাবনা বাড়ে, মনে স্বস্তি পান না।

এমন সময় পিসিমার ননদ আবার একদিন এলেন। সেই ছেলের সম্বন্ধ করতে। পিসিমা গালে হাত দিলেন—" ওমা মেয়ে নাকি হাড়গিলে—তাই ছেলে দেখতেও চাইল না—"

আশা বললেন—"কাণ্ড কাকে বলে—দোকানে শুভাকে দেখে ছেলের পছন্দ হ'য়ে গেছে—ওর সেই বন্ধুর বৌ কাপড় কিনতে এসে ওকে দেখেছে—"

শুভা বাড়ি ফিরতেই নিভা এসে খবরটা শুনিয়ে যায়। এবার ছেলে নিজে আসছে শুভাকে দেখতে—একেবারে পাকা দেখা। শুভা ওকে হাঁকিয়ে দেয়—"ভাগ আমি ওদের সামনে যাবই না—"

"আচ্ছা দেখা যাবে—" নিভা শাসিয়ে যায় "—মা পিসিমা নাচছে—ঠাকুমা মানত করেছে, বলছে শিবের মাথায় জল ঢেলেছিলি—সে কি বৃথা যাবে—"

"আমি কিছু শুনতে চাইনে তুই যা এখান থেকে—" বিরক্ত হ'য়ে ওঠে শুভা।

"আমাকে রাগ দেখিয়ে কি হবে বাপু—। তোর শাশুড়ি বুড়িটা বলেছে নাকি ছেলের মনে মতলব ছিল চাকরে মেয়ে বিয়ে করবার, শুধু শুধু আমাকে এতকাল নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাল—"

শুভা ধীরে সুস্থে মাকে গিয়ে বলল— "ওখানে আমি বিয়ে করব না মা—"

"ও দিদি তোমার ভাইঝি কি বলে শোন—ওনার বর জোটাতে আমার বলে হাড়মাস কালি হ'য়ে গেল—আর এখন উনি সাধা ভাত পায়ে ঠেলেছেন—"

পিসিমা একটু উপরে উঠলেন—"বাছাকে বিশ্বাস কি—সব ঠিকঠাক হ'য়ে আছে

নাকি? তাহ'লে বাপকে গিয়ে বল—দুহাত এক করে দিক—আমাদের দেখে শুনে দিতে হ'লে আমাদের পছন্দমত ঘরেই দেব—"

"বাঃ ওরা তোমাদের কতখানি অপদস্ত করল—দেখবে না সেটা—"

"অপদস্তর হয়েছে কি রে? বিয়ের বাজারে ওরকম কত কি হয়—পাকা দেখার পরেও কত বিয়ে ভেঙে যায়— ওরা শুধু দেখতেই এসেছিল—"

শুভা বলে বসল—"তোমরা যাই কর আমি কিন্তু ওদের সামনে গিয়ে বসব না—"

নলিনী শক্ত করে ধরলেন শুভাকে—"কি মতলব শুনি—কোন অজাত বেজাতের হাতে কিন্তু আমি তোমাকে তুলে দেব না—"

সুবল এসে দাঁড়িয়েছিলেন—হেসে বললেন—"কি হয়েছে, শুভাকে যদি কেউ পছন্দ করে—টাকা নয়, কাজকম্মের দক্ষতা নয়, শুধু ও যেমন তেমনি—তাহ'লে তার হাতে দিতে দোষ কি—আয়রে শুভা—"

মা পিসিমাকে হতভম্ব করে দিয়ে সুবল শুভাকে নিয়ে গেলেন। কেবল বললেন—"কে বিচার করবে—কে বেজাত—"

প্রতিনিধি

ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়খানা গায়ে মাথায় টেনেটুনে কুলিয়ে নিয়েছে। আঁটি বাঁধা শুকনো গাছ-গাছালির বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘরে ফিরছে সে। উঠোনে হাঁড়িতে ধান সেদ্ধ চাপানো। আঁচ নিভে এসেছে। একপাশে কাঠ কুটোগুলো ঝপ করে নামিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—"ও লেবু লেবু আগুন যে নিবেই গেল, দুটো পাতা গুঁজে দিতে পারিসনি"—সাড়া না পেয়ে নিজেই উনুনে ঝুরো পাতা, শুকনো গাছ গাছালি গুঁজে ফুঁ দিয়ে আগুনটা উসকে নিল। তারপরে গামছায় জড়িয়ে আনা শাকপাতার গোছাটা দাওয়ার একপাশে রাখতে রাখতে নিজের মনেই বলল—দেখ কান্ডটা একবার—মেয়াডা কুথায় যে পাল্যে গেল— উনুনটা এট্টু দ্যাখবে তাও হবার জো নেই—

তখনই লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ফুলমনবিবি এসে ঢুকল—"আর গাল পাড়লি কি হবে—তারে তো দেখলাম তীরের মত ছুটে চলে গেল—।" জিজ্ঞেস করলাম—"হ্যারা তোর আম্মা ঘরে আছে, কানই দেলে না—"

সরো অবাক হয়ে গেল "চাচী তুমি এদ্দুর আসতি পারলে—কোমরে ব্যথা তবে এট্টু কমিছে—"

'আসিলাম তো ওই মাজারে—ওনাদের তেলপাড়ায় ইলাজ্ অব্যথ—ওখেনে কি শুনলাম সরো, সবাই বলতিছে তোরে বলে ইবারের পঞ্চায়েত নেচ্ছে—"

সরো এড়াবার চেষ্টা করে—তুমারে নিয়ে মস্করা করিছে বুঝি—আর তুমি অমনি পেত্যয় করতি এদ্দুর কষ্ট করে আসলে।

'নুকুচ্ছিস কেন রে? নোকে কি তোর ভাগ নেবে? মস্করা তো করতিই পারে, কিন্তু ওই তোদের কিষক সমিতির আসরাফ—সে যে বলল 'হ্যাঁ চাচী এবারে এট্টা মেয়েছেলেরে আমরা পঞ্চায়েতে জিতাব। মেয়ে মানুষের হরেক কিসিম সমিস্যে। আর এই মোসলমানের ঘরের বিবি গুলোন বাইরি তো বেরুতি পারে না—তাদের সমিস্যেগুলো শুনার এট্টা লোক তো চাই'—শুনে আর আমি দাঁড়াইনি—ছুটি আসলাম তোর কাছে—"

অনর্গল কথা বলে যাওয়ার অভ্যাস ফুলমন বিবির। হাতের আন্দাজে উনুনে কাঠকুটো ঠেলেই চলেছে সরো। মনের মধ্যে অনেক ভাবনার আনাগোনা। সে পঞ্চায়েতে যাচ্ছে—এরকম একটা কতাবার্তা তার কানেও এসেছে—কিন্তু তার মত

মুখ্য সুখ্য এক খেতমজুরের বউকে যে সত্যিই পঞ্চায়েতে নেওয়া সম্ভব এটা তার তখনও বিশ্বাস হয়নি। পঞ্চায়েতের কাজ তো চাট্টিখানি ব্যাপার না। সেই বন্যার সময় লেবুর ইস্কুলের মাস্টারমশাই হিসাবে লিখতে ভুল করে ফেলেছিল আর তাতে সে কি হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না হল। বলে নাকি, খবরের কাগজে সব ছাপা হয়ে গেল। সরো সেখেনে পঞ্চায়েতে যাবে কি আরও একটা বেইজ্জতি কাণ্ড বাধাতে। আর গাঁয়ের পাঁচটা মানুষ তারে মানবেই বা কেন? সে কথার মোড় ঘোরাতে বলে—"দেখেছ চাচী, লেবুরি বলে গেলাম—জ্বালাডা দ্যাখ—আমি কখান কাঠপাতা জড়ো করে আনি গে—"

"ওই গুলোন বুঝি—ও যে অনেক—কার জমিনিরতে আনলি—" চাচী জানতে চায়।

সরো প্রমাদ গোনে—অনির্দিষ্টভাবে বলে—" ওই সেই বাদাবনের ধারের জঙ্গলডায় গেলাম—আর কুথায় কাঠ পাবো—সব তো সাফা হয়ে গেছে—"

"তওবা, তওবা, তোর জীন দত্যির ভয়ডর নেই—ওখেনে ঠিক দুপুরি গেলি ডাইনে ভয় করে জানিস না........"

"কি করব—কাজকাম নেই, শাকপাতা যা হোক দুটো ফুটোয় তো খাতে হবে—"

একগাল হেসে ফুলমন বিবি আশ্বাসের সুরে বলে— "এবারে তোর দুঃখ ঘুচে যাবে রে সরো—তুই তো বড় মানুষ হ'য়ে গেলি— কত মান্যি হবে তোর।" সরোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়— "এমনি ছেঁড়া ত্যানা পরে মিটিন ঘরে বসবি নাকি হ্যাঁরা—একখান ভদ্দর মতন কাপড় তো তোর কিনতি হবে—অবিশ্যি ভাবনার কিছু নেই—সব হবে—তোগে মিঞা চাচা যেবার পঞ্চায়েত গেল—" কি যেন বলতে গিয়েও সামলে নিল বুড়ি "কিচ্ছুর আর অভাব থাকবে না তোর—এই বুড়ি চাচীর কথাডা তখন মনে রাখিস—সুখ হলি সবাই দুঃখির দিনির কথা ভুলে যায়—" বড় খেদের সঙ্গে কথাটা আর শেষ করে না ফুলমন বিবি। হঠাৎ সরোর হাত দুটো চেপে ধরে ভাঙা গলায় ককিয়ে ওঠে— "সরোরে—আমারে এট্টু দেখিস—আমি বেওয়া মানুষ—আমার কেউ নেই—এই পঞ্চায়েতের কেউ আমার জন্যি কিছু করল না—হাসিনার মত আমারেও বেওয়া ভাতা জোগাড় করে দিতি হবে এবার—"

"ওমা তুমি কি কও—তুমার জন্যি কিছু করেনি? তুমি যে এখনও নিজির ভিটেয় ঘর তুলে বাস করতিছ—। খেদায়ে দিইল না তোমারে—"

"সে তো আমার হক্কের জিনিস—হাসিনার যে মুফতে বাস্তু দিল, ভাতা দিল—ওর সোয়ামীডা ওই কিষক সমিতির জন্যি জান কবুল করল তাই—তোদের দলের লোক কিনা—আমার জন্যি করবে কেন—"

"রোজগেরে ছেলে থাকলি, জমি জায়গা থাকলি বিধবা ভাতা দেয় না শুনিছি—" সরো বুঝিয়ে বলে।

খেপে ওঠে বুড়ি,—"জমি জমা, রোজগেরে ছেলে—তা আমার কি? তোর মিঞাচাচা কব্বর গেল—অমনি আমারে পেথগ করে দিল ছেলেরা— তালপাতার ছেঁচে

থাকি আর এর ওর দোরে খাই—হাসিনার চে আমার দুঃখ কম— ? তুই বল—যে সুখির মুখ দেখিয়ে তারে দুঃখ গোড়ায় বেশি—"

সরো ধানের হাঁড়িটা তুলে ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে দেয়। চাচী তাকিয়ে দেখছিল—"মুড়ি ভাজবি নাকি ?"

সরো শুকনো মুখে হাসল— "লেবুরা ভাতের মুখ দেখেনি আজ কয়দিন—রোদের যা তেজ মেলে দিলি আজই শুকোয়ে যাবে—তাই না চাচী।"

"ধান কিনলি কতোয়—" চাচী সচকিত হ'য়ে ওঠে।

"কিনেছেই হবে—লেবুর বাপ আমারে তো কিছু বলল না—"

'ব্যাটাছেলের এট্টু ভার গম্ভীর থাকতি হয়—মেয়ে মানুষের মত ভর ভর করে পেটের কথা উগ্‌রোনো মোটে সহ্যি হয় না আমার" একটু থেমে বলে— "হ্যাঁরে সরো তুই যে পঞ্চায়েতে যাবি তা লেবুর বাপ কি বলে ?—লোকে তো তাজ্জব বনে যাচ্ছে—যে শুনতিছে সেই কচ্ছে বাপের জন্মিতে কেউ শুনিছে নাকি মেয়েছেলে পঞ্চায়েতে যায় ? ম্যাস্টারনি হয়, টিকেওলা হয়, আপিসি কাজ করে— কিন্তুক পঞ্চায়েতে—বলতিছে ছ্যাঃ ছ্যাঃ গেরামে বুঝি সব হাড়হদ্দ হাভাতের দল—এট্টাও শক্ত সমত্থ জোয়ান মদ্দ নেই"— বুড়ি খ্যা খ্যা করে হাসে—"বুঝলি হোসেনেরে বললাম— 'কেন তুরা হতি পারতিছিস না— সরো গে কি করতি পারবে ? মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষ আমরা হাঁড়ি কুড়ি উনুনপাড় চিনি—আমাদের চেয়ার টেবিলে বসায়ে দিলিই অম্নি জাদুর চিরাগে কাজ ফতে করবে'—তা কথা মোকে পড়তি দেয় না—বলে, কেন বন্যার সময় দেখনি আমাদের সরো দিদি কি করতি পারে। যত লোক আসিছে ম্যায় খবরের কাগজওয়ালোরাও কত পেরশংসা করিছে'—বললাম—থো তোর খবরের কাগজ, আমারে আর ওসব দ্যাখাস না—সরো তো খালি তোদের পিছে পিছে ঘুর ঘুর করে বেড়াত—"

সরো সঙ্গে সঙ্গে বলে— "সে তো ঠিকই বলিছ—কি মেকদারের মানুষ আমরা—সব তো তোমার জানা—কিন্তুক ওরা নাছোড়বান্দা—আজ ভোরে নক্ষণ মিস্ত্রি খবর পাঠায়ে দেছে আজ গেরাম ঘুরতি আমারে বেরুতি হবে শুনেই তো হাত পা পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে"—

"যাবেই তো"—চাচী সাগ্রহে বলে—"নোকে যদি এট্টা বাত তোর ঠেঙে পুছে—জবাব দিতি তুই তো ভিরমি খেয়ে যাবি"—

এমন সময় কলবর করতে করতে লেবু হাজির হল— "ওমা—মা—লক্ষণ কাকারা আসতিছে—"

"ধান দেখিলি তুই—" ঝাঁকিয়ে ওঠে সরো— "তোরে যে পই পই করে বলে গেলাম—" গরম হাঁড়ী থেকে সেদ্ধ ধানগুলো উঠোনে ঢালতে থাকে সে। লেবু লাফাতে থাকে—"হয়ে গেছে ধানসিদ্ধ—দাঁড়াও আমি মেলে দিচ্ছি"। সরো বাধা দেয়—"আসিস না, আসিস না পুড়ে মরবি—"

—"তুমি যাবা মা—"

"না, তুই সরতো—কুথাগ যাব আমি—"

"তাই তো, কুথায় যাবে—মেয়েছেলে কুনো জম্মে এসব পারে নাকি—"

হাসান মোল্লা, লক্ষণ আরও দুজন কৃষক সমিতির কর্মী রাস্তা থেকে হাঁক দিল—"কি ভাইবৌ হয়নি এখনও—"

চাচী লাঠিখানা তুলে নিয়ে হাসান মোল্লার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—"আমি তোরে বলিনি হুসেন—মুখ্য মেয়েমানুষের কাম নয়—উসব—" হোসেন মোল্লা হেসে বলে—"তুমি, আমি আমরা সবাই তো মুখ্য—তালি গরিব মুখ্য মানুষগুলোর সুখ দুঃখ বুঝতি এমনি ধারা মানুষই তো দরকার—"

লক্ষণ সরোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—"নেও নেও ভাব দ্যাখ না, যেন বাবুগে বাবুগে বাড়ির বৌ—পাছ ফিরে বসে থাকলি হবে—", চারদিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে "লেবুর বাপেরে বারে বারে বলিলাম ঘরে থাকিস— তা সেই ছ্যাঁচড়াটা ভাগিছে বুঝি—"

সরোর ভিতরটা হিম হ'য়ে আসছে—! সে মানুষটা বার বার মানা করে গেছে—"খবরদার উসবের মধ্যি যাবি না— আমরা কিষক সমিতি আছি—ঠিক আছি। মালিক মহাজনের সঙ্গে লড়তি বল—কুছ পরোয়া নেই—ঘরের বউ ঝিদের টানাটানি হবে উসবের মধ্যে নেই। মাস্টার পন্ডিতি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, আকাট মুখ্যু নিয়ে ওনারা সেই কাজ সারবেন—ইসব মতলব আমার একদম ভাল ঠেকতিছে না—বেশ মুখ্যুতি যে ঠেকবে না— তা ওনাদের হিসেব কিতেব খাতা লিখা ইসব করবে কিডা—কার কত জ্ঞান গম্যির দৌড় সে আমার তো জানতি বাকি নেই।" কঠিন করে শাসিয়ে গেছে তাকে—"এখুন যদি তোর টিপছাপ নিয়ে কোন কুকম্ম কেউ করে—ঠেকাচ্ছে কিডা। মাঝমদ্দি হাতে দড়ি পড়বে—না'লি গোকুল পন্ডার মতন গলায় দড়ি দিতি হবে।" ভাল করে বুঝিয়েছে তাকে লেবুর বাপ—"আমরা হলাম গে গরিব—পেটের ভাত নেই—বেশি খাটলি—বেশি রোজগার। পরের মেশিনে তেল দিতে গেলি—আমাদের মেশিন অচল হ'য়ে যাবে—চুপি চুপি গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলেছে—"এতকাল কিষক সমিতি করতিছি—বুঝলি না—সরকার যাতি না যাতি সব জানি এক একজন লবাবপুত্তুর হ'য়ে উঠেছেন—এস ডি ও, জে এল আর ও অফিসি গেলি এহন চেয়ার ঠেলে বসতি দেচ্ছে, চার কাপ হাতে দেচ্ছে—সব এখন বোলচাল পাল্টে যাচ্ছে—গায়ে কুঁড়ো, ঠেঁটিপরা মানুষের আর গেরাহ্যি নেই—".

সরো অবশ্য নিঃশব্দে সব শুনে যায়নি—"মা গো মা, এসব কি কচ্ছ তুমি—বিয়ে করে আনিছ পরের থে দেখতিছিনা-কিষক সমিতির নামে তুমার কি নাচানাচি—তুমার মা বাপের কি ডর—ছেলেডারে কুথায় না খুন করে পাঁকের তলায় পুতে রাখে—"

লেবুর বাপ থতমত খেয়ে যায় কিন্তু লজ্জিত হয় না বলে—"জোয়ান বয়েসে পেথম পেথম রক্ত অমনি গরম থাকে— তাছাড়া তখন শুনিলাম খেতমজুরদের জমি দেবে—মহাজনের ঘরের জমি ফেরত পাওয়া যাবে—"

সরো তীক্ষ্ণ গলায় বলে—"কিষক সমিতি এইসব বলত নাকি—"বেনাম জমি, খাস জমি নোকে পায়নি—"

"এই গাঁয়ে কিডা কি পাইছে তার হিসেব হবে এখন—যা না ভোট করতি। এ তোর বিধানসভার ভোট না—কোথায় কারে কি রাজা গজা করিছিস তাতে পঞ্চায়েত ভোট হবে না—এ গাঁয়ে কিছু হয়নি—সবাই এখন সেই কথা জানতি চাচ্ছে"—

সরো অবাক হয়ে লেবুর বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—উল্টে গেল লোকটা রাতারাতি। সরোর নামটা পঞ্চায়েতে উঠেছে শুনে থেকে দম মেরে ছিল—প্রাণ খুলে যেন গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিল। "মেয়েছেলে দে পঞ্চায়েত চালাবে—খেলা না—গাঁয়ের মানুষ সব ভেড়ুয়া এ্যাঁ—"বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল লেবুর বাপ।

লেবুর বাপ এসব বলেছে শুনলে এরা তাকে ছেড়ে দেবে না—আর অশান্তির শেষ থাকবে না ঘরে। সরো মিন মিন করে বলে—"আমার লজ্জা করতিছে—

নিজির জন্যি ভোট চাতি —"

হাঁ হাঁ করে উঠল লক্ষ্মণ—সে লেবুর দূর সম্পর্কে জ্ঞাতি—আবার বন্ধুও। "লজ্জা—বলিহারি যাই এই সেদিন এট্টা ভোট হয়ে গেল—তুমিগিছিলে না ভাইবউ আমাগে সাথে-কিসির তোমার ভোট-এ লালঝান্ডার ভোট। লালঝান্ডার জন্যি ভোট চাতি তোমার লজ্জা করবে।—হাত পাতি আট টাকা মজুরি নিতি লজ্জা করবে না তো?"

ফুলমন বিবি ফুঁসে উঠল—"তুমরাই বা কেমনধারা। ঘরের মেয়েছেলেরে ভোট ভোট করে ফুঁসলাছ কেন বাপু। মেয়েছেলে নাজনজ্জা থাকবে না? রাস্তায় রাস্তায় তুমাদের পিছে পিছে ঘুরলি মান বাড়বে নাকি—" সরোর হাসি পায়—বুড়ি এরই মধ্যে ভুলে গেছে—সাত সকালে কেন সে ছুটে এসেছে তার কাছে।

লক্ষ্মণের চোখ এড়িয়ে বৃদ্ধ হাসান মোল্লাকে বলে—"দ্যাখেন লালঝান্ডা আমার জানপ্রাণ, লালঝান্ডার জন্যি ভোট চাতি আমি দশখান গাঁ ঘুরতি পারি, বিশ পঞ্চাশজন মেয়েছেলের মিছিল করতি পারি— কিন্তু নিজির জন্যি যাতি আমার পা উঠতিছে না—আপনারা আমার বদলি আর কাউরি নেন—"

"তা যা বলিছিস সরো, সমিতিতে তো মানুষ ধরে না এখন—মেয়ে মানুষের অভাব নেই—যারে দিবি সে একই হবে—"

"চুপ করো চাচী" হাসান মোল্লা ঝাঁঝিয়ে ওঠে—"আমরা বুঝি না নাকি কারে দিলি ভালো হবে?" হাত জোড় করে বলে— "ন্যাও সরোদিদি, বোকার মতন কথা ক'য়ো না—লোক কি তোমারে দেখে, তোমার নাম শুনি ভোট দেবে? লোকে দ্যাখবে তুমি কার জন্যি লড়তিছ। কংগ্রেস তো মৌলভী সাহেবের বিবিরে দাঁড় কারাচ্ছে—লোক তার মুখই দেখেনি কোনদিন—"

"তাওবা, তাওবা—কি আর কব—শেষকালে মৌলভী সাহেবের বিবিও ভোটে নামতিছে?—"

"দ্যাখবা নাকি চাচী একবার তার কাছে যেয়ে—" লক্ষণ ফুট কাটে। হোসেন মোল্লা হো হো করে হেসে ওঠেন।

হাসে সরোও।

লক্ষণ বলে— "হেসো না-হেসো না—লালঝান্ডার মান রাখতি যদি পেরানড দিতি হয় তাও দেবা কিনা বুকি হাত দিয়ে বল— ?"

সরো মাথা নিচু করে। এরপর লক্ষণ কি বলবে সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। লেবু তার কচিগলায় চেঁচিয়ে ওঠে— "ইস্ পেরানদা যাবে কিনা ?— ও তো কংগ্রেস—"

লক্ষণ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে— "বুদ্দির বেরস্পতি— "লেবু বেশ গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বলে—"কিন্তুক বাবা রাগ করবে"—

তুই থাম—" সরো মেয়ের মাথায় এক চাঁটি মারে— "যা এখেন তে—পড়তি যা গিয়ে—"

নিরাপদ দূরত্বে লেবু চেঁচিয়ে বলে- "বাবা বলিছে মা বেরায় না যেন দেখিস—"

লক্ষণ হোসেন মোল্লার দিকে ফিরে বলে— "আপনি রাগেন, দ্যাখেন—সাধে কি আমি ওরে ছ্যাঁচ্চড় বলি—এক রক্তের ঝাড় তো—ওরে আমি হদ্দমুদ্দ চিনি—"

হোসেন মোল্লা হাসেন— "কেমন রক্তের ঝাড় দেখতিই পাচ্ছি—" লক্ষণ কথাটা ধরতে পারে না, বলে— "মুখি দ্যাখবেন বড় বড় বুলি ঝড় বহায়ে দেবে—"

ওর কথায় সকলে হেসে ওঠে—অন্যের হাসির কারণ না বুঝতে পেরে থতমত খেয়ে যায়। হোসেন মোল্লা ওর পিঠে চাপড় দেন— "ঠিক কথা—কিন্তুক ব্যাটা যে গোলমাল পাকায়ে দিল—সামলাই কি করে এখন—"

ফুলমন বিবি ফোড়ন কাটে— "লেবুর বাপ পুরুষ মানুষ তো—বিবি মাত্বর বনে গেলি—তারে মানবে— ?

হোসেন মোল্লা চাচীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুড়ি ঠিক জায়গাটা ধরে ফেলেছে তো ?

চাচী ভারিক্কী গলায় বলে যায়—"মেয়েছেলের রাশ আলগা দিতি নেই—পাকছাট মারবে—জোয়ান মেয়েছেলে—"

মোল্লার মুখ দুশ্চিন্তায় ভ'রে যায়— সকলেই কেমন যেন মিইয়ে গেছে। লক্ষণ ফুলমন চাচীকে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে—"যাওনা—মৌলভী সাহেবের বিবি ভোটে জিতে তার দালান ঘরে তোমারে থাকতি দেবে—পাতার ঘরে আর থাকতি হবে না—" বলেই ক্ষুব্ধ লক্ষণ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়। ফুলমন চাচী লাঠি তুলে গালাগাল করতে করতে তার পিছু নেয়। ধীর পায়ে চলে যান হোসেন মোল্লাও।

সরোর মুখে একরাশ অন্ধকার। লালঝান্ডার কিছুই তো সে বুঝত না। বিয়ের পর লেবুর বাপের মুখেই সে প্রথম লালঝান্ডার নাম শোনে। বিতৃষ্ণার সাথে তার মনে হত লালঝান্ডাই তাদের মধ্যে একটা বড় দূরত্ব তৈরি করে রেখেছে। সেবার গাঁগুলো বানের জলে ভেসে না গেলে অনেকেই তার মত এই লালঝান্ডাওয়ালাদের দেখলে সরে যেত। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করত। কৃষক সমিতি এ গাঁয়ে ছিলই না

প্রায়। পুরো পঞ্চায়েত এলাকা খুঁজলে এই লেবুর বাপের মত আর মোটে হাতে গোনা জনা কয় মাত্র পাওয়া যেত। এরাই গাঁয়ে গাঁয়ে কৃষক সমিতির নাম নিয়ে ঘোরাঘুরি করত। লোকে এদের সম্পর্কে ছিল নিস্পৃহ, নিষ্কম্মা ভাবত এদের। পঞ্চায়েত যেটা প্রথমবার হ'ল—তাতে কৃষক সমিতির লোকজন জিতল কম। পঞ্চায়েত চলে গেল কংগ্রেসের হাতে।

বন্যা যেদিন এল লোক অবাক হয়ে দেখল ভয় ধরানো লোকগুলোই প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে—জাদুবলেই যেন নৌকা, ভেলা, ডোঙা, এমনকি দড়ি, খাট ভাসিয়ে, জান কবুল করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গরিব মানুষগুলোকে হাজারে হাজারে রাস্তার বাঁধের ওপর তুলেছে। ধান, চাল, গোরু, ছাগল, জিনিসপত্র, বাঁচাতে ব্যস্ত বড় ঘরের মানুষরা তাকিয়ে দেখার সময়ই পেল না। অথচ এরা একবারও নিজের বাবা-মা ছেলে-বৌ বাঁচাতে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল না। মানুষ সেদিন দেখেছে চিনেছে।

এই ফুলমন বিবির জমিজমা মোটামুটি কম নেই—ঘরে ধান, চাল, ডাল, কলাই, সবই মজুত ছিল। মাটির দোতলা ঘর, ঘরের মাঝখানে উঠেছে গোলা। জল উঠতে সব তুলল নিয়ে দোতলায়। দুদিন ছেলেপিলে নিয়ে ঘরেই রইল। তারপর যেদিন থেকে ফের জল বাড়তে লাগল—চালের উপর উঠে গামছা নেড়ে নেড়ে ডাকাডাকি শুরু করল। ছেলেপুলেদের পাঠিয়ে দিল তাঁবুতে। কৃষক সমিতির লোকেরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, অনুরোধ উপরোধ করল— "কিছু চাল, ডাল, দান না করেন—আমাদের কাছে বিক্রি করেন। সরকার টাকা দিচ্ছে আমরা কিনে নেব। হাজার হাজার মানুষকে খেতে দিতে হ'চ্ছে—কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না—বাজার হাট সব বন্ধ—"

জানো না, সব লুকোয়ে ফেলিছে, বেলাকে বিক্রি হবে—পুলিস টুলিস নিয়ে ওদের গুদামগুলো একবার দেখ না গিয়ে।" বলেছিল নেয়ামৎ খাঁ, ফুলমনের স্বামী। ওরা বলেছিল "আপনার ছেলেদের জন্যি দেন অন্ততঃ—"

ফুলমন ঝাঁপিয়ে উঠেছিল— "সরকার তো দেদার দেচ্ছে— সে কি তবে তুমাদের গর্ভে যাবে ?

সেই রাতের বৃষ্টিতে বাড়ি আর থাকতে পারেনি ফুলমন বিবিরা—কয়েক বস্তা ধান, চাল, বাসনপত্র, খাট বিছানা, মায় ট্রানজিস্টার পর্যন্ত নিয়ে তারা এসে রাস্তায় তাঁবুতে আশ্রয় নিল।

এরপর শুরু হ'ল সেই ধুন্ধমার। দল পাকিয়ে চিৎকার, মারধর, কংগ্রেস নেতাদের কাগজওয়ালাদের আনিয়ে হাজার রকম অভিযোগ—"সরকার তো দিতি কসুর করতিছে না—এই কিষক সমিতির লোকেরা আমাদের কিচ্ছু দেয় না — এই দ্যাখেন ছয়জন মানুষের জন্যি এইটুকুমাত্র—কি চাল ?— আমার বাড়ির মুনিষগুলোও খায় না— আর ওদিকি দেখে আসেন যান—ভাল ভাল জিনিস চাল, ডাল, তেল, চিনি সব, হাওয়া হয়ে যাচ্ছে—" "সেরেফ দল বাজি করতিছে, নিজিরা পোঁটলা বাঁধতিছে—"

গন্ডগোলের আঁচ পেয়েই হোসেন মোল্লা সরোকে ডেকে এনেছিল দুধ বিলি করার

কাজে। ঠিক হয়েছিল কোলে শিশু যার সেই পাবে দুধ। ঘরে ঢুকে ঢুকে নাম লিখে নিয়েছিল ওরা। একদিন দুধের বালতি টেনে ধরল ফুলমন বিবি—"সরকার দেচ্ছে আমার ছেলেরা দুধ খাবে না—তোর পীরিতের ভলেন্টাররা খাবে?" লোক জড় হয়ে গেল। সবাই ওদের লোক। হাত থেকে টেনে নিয়ে গেল দুধের বালতি।

হোসেন মোল্লা ছুটে এলেন, বেরিয়ে এল সারি সারি পলিথিনের তাঁবু থেকে বাচ্চা কোলে মায়েরা—

ওদের সবাই ব্যাপার দেখে যে যার তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। মোল্লা সাহেব ডাকলেন—"নেয়ামৎ—"

ফুলমন বিবি দুধের বালতিটা ধপাস করে নামিয়ে রেখে মুখে যা এল বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে গেল। শাসিয়ে দিল—দেখে নেবে সে সরোকে।

একটু একটু করে কাজ বেড়েছে সরোর—কবে যে সে স্টোরের দায়িত্বে চলে এল নিজেরই মনে নেই। সরোকে দেখলেই ফুলমন বিবি গালাগাল শুরু করত— "ওরা তো ভিখিরি—ওদের কিছু ছিল নাকি—পেটে ভাত জুটতো না—কি খেতি বানে ভেসে গেলি—এখেনে তিন বেলা খাচ্ছে আর পোঁটলা বাঁধছে।" কতবার লোকজন আনাল ওরা শহর থেকে—তারা হিসাবপত্র দেখে গেল—তবু ওদের মনে শান্তি নেই। চার পাঁচজন মহিলা নিয়ে ফুলমন একদিন ঢুকেই পড়ল সরোর তাঁবুতে। সরো লেবুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। বুকের দুধেই কুলিয়ে যেত লেবুর। লেবুর বাপেরও কড়া মানা ছিল রিলিফের দুধ খাওয়াতে। ছোট্ট তাঁবুর ভেতরটা ওরা তছনছ করে ফেলল। চিৎকার করে অনেক লোক জমিয়েও ফেলল। শেষ পর্যন্ত তাঁবুখানা উল্টে পাল্টে দিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে গেল তারা।

এদিকে যারা একমাস ধরে রোদ বিষ্টি জলে কাদায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করে হাড়মাস কালি করে ফেলল—এক এক জনের চেহারায় চেনবার চিহ্ন নেই। পোড়া রঙ, হাড্ডিসার, একমুখ চুলদাঁড়ির জঙ্গল—প্রতিটি তাঁবুতে, প্রতিদিনের নোংরাজমা জায়গায় ব্লীচিং ছড়ানো, খাবার জল আনা, লোকজনদের পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য বোঝানো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েকশ ছেলে জুটে গেল তাদের সঙ্গে। মহিলাও কম জোগাড় হ'ল না সরোর সাথে সাথে।

ঘরে ফিরে যাবার দিন এগিয়ে এল—জল নামছে। সকলের আগে ছুটে গেল তারাই যাদের গ্রামের মধ্যে সেরা বাড়ি। ছুটে গেল ফুলমন বিবি, নেয়ামৎ খাঁর তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। বাড়িটা কাত হ'য়ে পড়েছে—ধানের বস্তার কতক বাইরে গড়িয়ে পড়েছে। গোলাটাও ভেঙ্গে গেছে। তার মধ্যে এখনও একবুক জল।

যাবার আগে লণ্ঠন, বাসনপত্র, কাপড় জামা দেওয়া হবে। ফুলমন বিবি জনে জনে ডেকে বলতে লাগল সেই এক কথা— "ইয়া আল্লা, মজুর মুনিষরা কবে জামা

কাপড় গায় দিয়েছে অ্যাঁ, ফুটো সানকি ছাড়া বাসনই বা কি ছিল—দুখান তালের পাতা চাপিয়ে দিলেই ওদের ঘর—গেছে তো আমাদের—শেরওয়ানী, সালোয়ার-সলমার কাজ নাইলন, টেরিকট কাপড় টেরাঙ্কে বোঝাই—কখ্‌খনো পরিনি—একেবারে আনকোরা। ভালো ভালো কাঁসা, ইসটিলের বাসন—সব ভেসে গেছে—ধান গেছে, কলাই গেছে—সর্বস্ব গেছে আমাদের—ঘরে গে কি খাব তার বেন্দোবস্ত নেই—" আর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল সারাটা অঞ্চল।

সব থেকে জ্বালা ধরল যখন শুনল—সবাই দুশ টাকা করে পাবে—নতুন ঘর তোলার জন্য।

"পাঁচ হাজার টাকার বাড়ি—আজকের তো না। এখন বানাতে ঠিক দু-তিনগুন খরচা হবে—তার কম না—মোটে দুশ টাকায় এক খান শালের খুঁটিও হবে না।" ফুলমন বুক চাপড়ে কাঁদে আর বলে— "ওরা দলের লোকদেরই দেখতিছে—আমাদের দেখল না—"

লেবু এসে মার কাছে দাঁড়ায়। সরোর অন্যমনস্কতা তাকে ক্ষুব্ধ করে। —"মা ভাত রাধঁবে না—খালি ধান উগলাচ্ছ—"

ওকে বাঁ হাতে ঠেলে দিয়ে সরো বলে—"তুই পড়তি যা না—হাঁড়িতে মন্ড ছিল খাসনি—"

"বা! বাবা বলিছিল আজ ভাত খাব—"

সরোর বুকটা টন টন করে ওঠে। মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"ও ভাতের আশায় ঘুর ঘুর করতিছিস, পড়তি যাতি মন লাগতিছে না না—"

লেবু ছুটে এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কিছু বলে না।

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সরো বলে—"বোকাহাঁদা—এই তো সবে ধান সিদ্ধ হ'ল—শুকাবো কুটবো তবে ভাত রান্না হবে। রাত্তিরে ভাত খাবি—ইস্কুলি যা—ওখেনে তো খাতি দেবে—"

, হঠাৎ মুখ তুলে লেবু বলল—"মোল্লা দাদুর না খুব দুঃখ হয়েছে, জান—বাবা কিছু বোঝে না—তাই বলছিল সব্বাই।"

"আচ্ছা এখন পড়তি যা আমারে কাজ করতি দে—"

"আমি মোল্লা দাদুরি বলে আসি—তুমি যাবা--" মার অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে লেবু।

"কিছু করতি হবে না তোর, তুই পড়গে—দেখলি না সবাই খালি আমারে মুখ্যু বলে। তুই কিন্তুক পড়ালিখা শিখবি—কেউ যেন মুখ্য বুলতি না পারে—"

লেবু মার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল— "আমি তুমারে পড়তি শিখায়ে দেব মা—দেখ তোমারে কেউ মুখ্যু বলতি পারবে না—"

সরো মেয়েকে চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

"মা আমরা গরিব—না মা?" শুকনো মুখ তুলে জানতে চায় লেবু।

"গরিবই তো"—অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় সরো।

"লক্ষণ কাকা বলতিছিল--গরিবরাই তো লালঝান্ডা--" লেবু মার চোখে মুখে একবার সমর্থন খোঁজে।

সরো সজাগ হয়ে ওঠে। মেয়েকে সে কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

'লেবু'--লেবুর বাবার কড়া গলায় আওয়াজে মা মেয়ে দুজনেই চমকে যায়।

"হোসেন চাচা কি রাস্তায় দাঁড়ায়ে থাকবে- বলি পঞ্চায়েতে নাম না উঠতি এত গুমোর—"

মার কাপড় টেনে ধরে লেবু--"মা চলো, চলো, ওরা কোথায় গেছে দেখিছি আমি—" উৎসাহে টগবগিয়ে উঠেছে সে। সরোকে তবুও দাঁড়িযে থাকতে দেখে অধৈর্য হয়ে ওঠে--"ধান তো শুকোবে এখন, আমি ঠিক বসে বসে পাখি তাড়াব—তুমি চলো না—"

সাড়া

বাসটা ব্রিজের মুখে যখন এলো, কিছুই মনে হয়নি পানুর। অন্য দিনের মতই দু'ধারে পাইপের উপর সার দিয়ে লোকজন বসে। এদিকে ওদিকে দু'-পাঁচজন জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে। সাড়ে ছ'আনার ফুটপাতওয়ালা জিনিস সাজিয়ে বসে আছে। স্টপেজে পৌঁছবার আগেই হৈ হৈ করে কিছু লোক বাসের দিকে ছুটে এল। পানু স্টপেজে নামবে টিকিট চেক করতে — গেটের মুখে চলে এসেছে। গোটা কয়েক শক্ত হাত তাকে আচমকা নামিয়ে ফেলল। আর তখনই দেখতে পেল পিল পিল করে লোক ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললো বাসটাকে। পেটে একটা গোত্তা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানু। তারপর এলোপাথাড়ি মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিলে চললো তাকে একটা গলির পথে।

যাত্রীরা ছবির মত বসে। ড্রাইভার স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে আছে। কেবিনে তালা বন্ধ। দু'চারজন তাকেও টানাটানি করলো খানিকক্ষণ দুম দাম চড় কিল ছুঁড়লো। কারা রাস্তায় চেঁচিয়ে উঠল 'আগুন দে, আগুন দে'। গাড়িতে উঠে দরদী গলায় বলতে লাগলো নেবে পড়ুন, নেবে পড়ুন, এ বাস যাবে না, পিছনেই বাস আসছে—' ঢিল এসে পড়তে থাকলো বাসের গায়ে।

সকলের আগে মহিলা সিটেই চাঞ্চল্য দেখা গেল। বাচ্চা আগলে কয়েকজন উঠতে গেল। এক বৃদ্ধা আকুল হয়ে বলে উঠলেন — 'কি গেরো নেমে যাই চল—"

চাপা গলায় কণ্ডাক্টর বললো — "ক্ষেপেছেন—"

সে পানুর অবস্থা আঁচ করেই — দরজার কোনে যাত্রীদের মাঝে বসে পড়েছিল। বৃদ্ধটি খ্যাঁক করে উঠলেন 'এর মধ্যে নাববো, কি বলছো কি ?'—

খানিক বাদে ভিড় পাতলা হয়ে এলো। দেখা গেল লাঠি হাতে সাধারণ পোশাকের দু'জন লোক, পুলিস হয়তো এগিয়ে আসছে। একটু আগে জনতা পানুকে যে পথে টেনে নিয়ে গেছে তাদেরও সেদিকে নিয়ে চললো আর একটা দল।

সেই মুহূর্তে সব সুন্ সান্। কেউ কোথাও নেই। এমন কি লুকিয়ে থাকা কণ্ডাক্টরও নেই। একটু পরে কণ্ডাক্টর আর পুলিস ধরাধরি করে এনে পানুকে শুইয়ে দিল একটা সিটের ওপর। বাসটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

পানুর মুখটা প্রায় থ্যাঁতলানো। কষে রক্ত, নাকেও রক্ত। চোখ বোঁজা। জ্ঞান আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কণ্ডাক্টর সিটের নিচে থেকে বালতি বের করে জলের ঝাপটা দিল চোখে মুখে। পানু চোখ মেলেই উঠে বসতে গেল। বাস শুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। আবার শুয়ে চোখ বুজল পানু। মুখের উপর মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কণ্ডাক্টরটি — "কি রে বেজায় জখম"—

পানু কথা বলতে চেষ্টা করলো। চোয়াল নড়তে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো। কষ বেয়ে টাটকা রক্ত বেড়িয়ে এলো।

ড্রাইভার পিছন না ফিরেই জিজ্ঞাসা করলো — 'জ্ঞান ফিরলো — হারু—' হারু ক্ষুব্ধ গলায় বললো — 'শালা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই সকালে তাও অন্য রুটের বাস — বল দিকি ওকে কেন তুলে নিয়ে গেল এ সব কি অনাছিষ্টি ব্যাপার'—

পানুর চোখের উপর ভেসে উঠলো একখানা মুখ।

সে টিকিট চেয়েছিল। ছেলেটির হাতে একটা বাজারের থলে — গর্জে উঠেছে — "দেখতে পাচ্ছ না হাত বন্ধ —পালিয়ে যাচ্ছি নাকি — মুখ চিনে রাখ টিকিট দিয়ে যাব।" তিনবারের পর দু'একজন লোকও পাশ থেকে বলেছিল — "দিয়ে দিন না— ব্যাগ তো আমাদের হাতেও আছে" "বাস তো থেমে আছে, ব্যাগটা নামিয়ে রাখুন—" "ঠিক আছে আপনারা দিন—"

"আমরা দিয়েছি—"

"ভাল করেছেন — এবার চুপ মেরে যান—'

এক কথায় দু'কথায় বিতণ্ডা বাড়ছিল। ছেলেটির তেরিয়া মেজাজে অনেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ছেলেটি তখন টিকিট কাটে।

এই স্টপেজেই সে এসে পানুর গলার কাছে গেঞ্জিটা খামছে ধরেছিল ঠেসে ধরেছিল গেটের গায়ে — 'ধড় থেকে মণ্ডুটা ছিড়ে নিতে পারি জানিস.?' পানুর মতই রোগা প্যাংলা, আধময়লা পুরনো পোশাক, পায়ে রবারের স্যান্ডেল। পানু অবাক হয়ে তাকে দেখছিল।

পানু তার হাতটা চেপে ধরেছিল — 'ছাড়, ফালতু রোয়াব সবাই দেখায় — যাঃ ঘরে যা—' বলে ওর হাতটা ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল — 'চিনে রাখ এই ক্ষীরা মহেনদার একেবারে খরচ হয়ে যাবি— 'বলে হাতের একটা মুদ্রা দেখিয়ে ছুটন্ত বাস থেকে অবলীলায় নেমে গেল। অন্ধকারে ঠিক রেল ব্রিজের নিচেই। আজ ক্ষীরা ওখানে ছিল। নির্লিপ্তভাবে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে।

পানু চোখ খুললো। টিকিট চাওয়া নিয়ে খিচিমিচি হামেশাই হয়। পুজোর চাঁদা নিয়ে তো টানাটানি হ্যাঁচড়া হেঁচড়ি পর্যন্ত হয় — কিন্তু এরকম সচরাচর হয় না। পানু পাশ ফিরতে চাইল— নিশ্চয়ই তেমন কিছু হয়নি তার। না হলে রক্ত বমি-টমি হত। কুস্তির ট্রেনিং নিয়েছিল সে কিছুদিন। মার কি করে শুধু শরীর দিয়ে ঠেকানো যায় সেটা শিখেছিল অনেকটা চার্লি চ্যাপলিনের মত। সেই শিক্ষা পুঁজি করেই করে খাচ্ছিল সে। হালে তো বাসে কাজ পেয়েছে। ছুটকো হাত সাফাই করতে করতে

কয়েকবার পাবলিক আর পুলিসের ধোলাই খেতে হয়েছে। শেষবার এই চাকরি পাওয়ার সূত্রেই। দমদম দাওয়াই ভাল মতই দেওয়া হয়েছিল তাকে।

সেও এক ঘটনা। যখন তার লাইনের কারবারীরা তাকে ওস্তাদ ঠাওরাতে শুরু করেছে। দু'-তিনবার পুলিস ঘর হয়েছে। কিন্তু ফাঁসাতে পারেনি। বন্ধু গোকুল এসে পিঠ চাপড়ে বলল — "ওস্তাদ মার দিয়া কেল্লা—"

পানু তাকিয়ে রইলো। সে চায় গোকুল নিজেই ভাঙুক কথাটা।

"তোর তলব হয়েছে শালা গুরুর ডেরায়। —খিঁচ একটা পাকিয়েছে— চাই কি হাজার বিজের রোজগার—'

পানু তাকিয়েই আছে। গোকুল তার পিঠে চাপড় মেরে বলে— "আ বে ভ্যাবারাম— রাতে হাজিরা দিবি—"

ঘরে শুয়ে বসে সারাদিন পানু ভেবেছে। তার কাজ কারবার একার। অল্প ব্যবসা-ভাগীদার নেই। ঝামেলাও সামান্য। একাজে টিঁকে থাকতে কোনো শাঁসালো গুরুর দরকার নেই। গোকুলরা পয়সা কামায় বটে তবে সিংহভাগ যায় গুরুর ভোগে। বিরাট রমরমা ব্যাপার। টাকা বাজিয়ে খরচা করে। পুলিসের সাথে বন্দোবস্ত। তবে কলকাঠিটি গুরুর হাতে। বনিবনা না হলে ভোগে চলে যাবে একেবারে। পানু অল্পেই তুষ্ট। ওদের এই ভাগেযোগের কাজ পছন্দ নয় তার। আয়ের অন্য দরজা খোলা পেলে— এ অন্ধকার পথে সে কি আসতো। তার তো পাঁচটা ভাই নেই গোকুলদের মতো। বিধবা মা। তার কিছু হলে— সে ভাবতেই পারে না পানু।

তবু গিয়েছিল— খানিকটা কৌতূহল। গোকুলের গুরু রবিদা একটা ঘ্যাম। গোকুলরা তাকে ভগবানের মতো সর্বশক্তিমান মনে করে। লোকেও স্যাবা দিয়ে পথ চলে। সেই সাঙ্ঘাতিক রবিদার কি এমন খিঁচ ধরেছে— যে তাকেই দরকার। কিছুটা ভয়, কিছুটা লোভেও বটে। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল সে।

কাজটা অবশ্য জলভাত। তার লাইনের কাজ— শুধু একটা অচেনা মুখ দরকার। তবে এ যে মোক্ষম একটা লাভের গাঁওতা কাজ হাসিল হলে বখশিশের যে প্রস্তাব ছিল তাতেই ধরতে পেরেছিল পানু। সে বলেছিল— 'যদি হাজার দশ বিশও দিতেন— দু'দিনেই ফুকে যেত— তার চেয়ে আমায় একটা কাজ জোগাড় করে দিন।— বাসে, চিরকাল কেনা হয়ে থাকবো।' ইচ্ছে করেই গোলাম কথাটা বললোনা। পানুর জানা ছিল বাসের মালিকদের সাথে দহরম্ মহরম আছে রবিদার।

বাসে সেই থেকে কাজ করছে। তবে এখন সে জানে এটাও গুরুর আর একটা ব্যবসা। বাস শ্রমিকদের ঠিকাদারী। তার মত ছেলেরা নিত্য আমদানি হচ্ছে। কণ্ডাক্টর বা হেল্পারের কাজে রীতিমত ঠেলাঠেলি ভিড়। ফি হপ্তায় একজন নতুন কণ্ডাক্টরবা হেল্পার জুটে যাচ্ছে বদলির কাজে। কে কাজ করবে কোন বাসে কটা থেকে কটা, কে কে বসে যাবে কোন সপ্তাহে, সব ঠিক হয় ঠিকাদারের ডেরায়। হপ্তা পিছু কমিশন। বাইরে থেকে পানুর ধারণা ছিল এটা স্থায়ী ব্যবসা। সময় বুঝে চাকরি নট

করেও দেয় ঠিকাদার। যারা টিকে থাকে হাড় বার করে ছিবড়ে করে ছাড়ে। রোগে ভোগে শেষ হয়ে যায়।

নড়ে চড়ে উঠে বসলো পানু। এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না। এ হপ্তা তার পুরো কাজ পাওয়ার কথা। পরের হপ্তা যদি বসিয়ে দেয়। হারু এগিয়ে এল-- 'শুয়ে পড় বুদ্ধু কোথাকার-- স্ট্যান্ডে গিয়েই ডাক্তারের কাছে যাব--'

'ঘন্টা', গোঁ গোঁ করে উঠলো পানু-- 'আমাকে বসিয়ে দিক মাইরী। কষ বেয়ে টাটকা রক্ত গড়িয়ে এলো। বাঁ হাতের চেটোয় মুছে উঠে দাঁড়াল-- পা দুটো কাঁপছে একটু একটু। যাই হোক ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্ট্যান্ডে সে বাস থেকে নিজে নামতে চায়।-- তারপর-ডাক্তার ফাক্তার যা হয় হবে--

শেষ ট্রিপ আর দিতে হল না তাকে। বাড়ি পৌছে দিতে এলো হারুরা দু'তিনজন মিলে। ডাক্তার হাসপাতালেই পাঠাচ্ছিল। বাড়িতে ঢুকতে মা এসে আছড়ে পড়ল--

'হায় ভগবান - আমার কি সর্বনাশ হলো গো--'

স্টিচে, ব্যান্ডেজে ফুলে ঢোল হওয়া তার মুখখানা সত্যিই তখন বীভৎস। আর পেটে বুকে? সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না।

দু'দিন ধরে শুয়ে থাকতেই হলো-- ডাক্তারের বারণ। রবিদার কল্যাণে মালিক চিকিৎসার নামে কিছু টাকাও দিলো। একে একে সহকর্মীরা অনেকেই দেখতে এলো। আরও একজন এলো-- যাকে সে মোটেই আশা করেনি। তাদের আগের পাড়ার করুণা। করুণার বাবা কারখানায় কাজ করে। যে কারখানায় ওর বাবাও এক সময় কাজ করতো। উঠতি বয়েসে করুণার সাথে মেলামেশার চেষ্টায় ছিল সে কিছুদিন। মেয়েটির চেহারা তেমন চটকদার নয়, তাই সে ছাড়া আর কারো নজর পড়েছে বলে তার জানা ছিল না। শুধু তার হাসিটা ওর মিষ্টি লাগতো। স্কুলে যেতে আসতে পথে চোখাচোখি হলে হাসতো করুণা। বস্তির মেয়েরা যেমন বড় বয়সে নিচু ক্লাসে পড়তে থাকে, পড়তেই থাকে। পয়সা লাগে না বলে বাবা মাও তেমন আপত্তি করে না। মেয়ের কাছেও ঘর সংসার থেকে একটুখানি মুক্তি। এরাই কেউ কেউ লেখাপড়া খানিক শেখে, কেউ তাও শেখে না। করুণা শিখতো। তাকে হাইস্কুলে ভর্তি করেছিল তার বাবা। পানু ওকে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সিনেমা দেখানোর লোভ দেখিয়েছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চেয়েছে। করুণা হেসে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত পানু চেপে ধরেছিল একদিন-- কেন, যাবে না কেন--

করুণা ঘাবড়ায়নি, লজ্জিত হয়নি-- 'পাড়ায় কত সুনাম' বলে হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিল।

পানু বেশ একটু ধাক্কা খেয়েছিল। করুণাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল-- 'দেখবো, দেখবো কত ভাল পাত্র বাপে জোগাড় করে দেয়--'

ওরা দল বেঁধে তৈরি হয়েই পিছনে লেগেছিল।

'আহা, চেহারার কি চেকনাই!' --কেউ বলেছিল।

কেউ বলেছিল-- 'তবু যদি না একগণ্ডা মেয়ে হতো--' করুণা ওকে একা পেয়ে

বলেছিল— দেখার কিছু নেই, সে পড়ছে চাকরি করবে বলে— বিয়ের পাত্র জোগাড় করতে নয়—।

পানু সেইদিনই ঠিক করেছিল পাড়া ছাড়বে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ কালে-ভদ্রে হলেও আর কখনও উত্যক্ত করেনি করুণাকে। মনে মনে তাকে সে করুণাই করেছে— যেমন শুকনো আমসির মত চেহারা তেমনিতে এঁটে স্বভাব। শখ আহ্লাদ যদি না থাকে তবে জীবনে আর থাকে কি! যেন একটু হাসি মস্করা করলেই তার বিদ্যে-সাদ্দি কর্পূরের মত উবে যাবে— বিদ্যে দিগ্‌গজ একেবারে—।

ভাবে বাপে চাকরি বাকরি করলে অমন ফাঁট সাজে। হতো যদি তার মত হাভাতে হাঘরের দশা— দেখা যেতো। দুর্নাম—। আরে দুর্নাম-সুনাম কি সে ধুয়ে খাবে। পেটের ভাত জোগাড় হওয়া নিয়ে কথা। এত বছর ধরে অনেক কষ্ট করেছে তার মা— এখন তাকে একটু সুখে রাখতে চায় পানু। শুধু নিজের নয় মার পাতেও যেন পেটভরা ভাত থাকে। ভাবখানা কি! চাকরি যেন বসে আছে তার জন্যে, শুধু পাস করারই ওয়াস্তা। আহা—

যত ক্ষোভ যত বাগেই পড়ুক না কেন পানু কোথায় যেন একটা হীনমন্যতা। করুণার কাছে নিজেকে ছোট আর খুব হেয় মনে না হয়ে পারে না। তাই অনেককাল ওদিকে আর মাড়ায়নি সে।

করুণা এসেছিল। মার কাছে বসে থাকে— সেখান থেকেই চলে গেছে। ঘরে ঢোকেনি। মা বললো— করুণা এবার পরীক্ষা দেবে। পাস করলে নার্সিং-এ যাবারই ওর ইচ্ছে। কিন্তু বাবার একার আয়ে ওদের আর কুলোচ্ছে না। তারপর ছ'মাসের মত কারখানায় লক-আউট ছিল। তাতেই হাতের পাতের যা কিছু বেচেবুচে খেয়েছে। নার্সিং-এ ঢুকলে চাকরি করতে করতে অনেক দেরি— তাই ভাবছে— আর কি করা যায়। পানু চুপ করে শুয়েই ছিল— একটা কথারও জবাব দেয়নি। করুণার কি হলো না হলো তাতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এখন সে একটা রয়েল পাত্র, পাড়ায় দুর্নাম আর নেই। চোখে লাগার মত মেয়ে জোগাড় করা কি এমন শক্ত। তখন করুণার মত শুঁটো চিংড়িতে নজর দিয়েছে নিজের ওজন বুঝেই। এখন যে মন নেই তার একটাই কারণ — এই মেয়েগুলোর হাবভাব তার একদম ভাল লাগে না। বাসে চাকরির দৌলতে অনেকের হাড়হদ্দ তার জানা হয়ে গেছে।

আরও একটা কারণ, কোথাও ফেঁসে যাওয়ার আগে সে হাতে দু'পয়সা জমিয়ে নিতে চায়।

একটু সামলে নিয়ে কাজে যোগ দিতে এসে পানু অবাক হলো। তার বদলি একটা ছেলে কাজ করছে। সাদা ফ্যাকাসে মুখ, হাড় জিরজিরে বুকের খাঁচা। চুলে কতকালের যে আঠাল ময়লা। দেখেই মনে হয় ফুটপাতের বাসিন্দা। পানুকে দেখে তার মুখ ভার হয়ে গেল— চোখে যেন জল আসবে। একজন পিঠ চাপড়ে বললো— "খোঁজ খবর নিস—আবার কারও বদলি দরকার হলে তোকেই নেবে—"

দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝখানে ওই ছেলেটি একদিন এসে বললো— "রবিদা বলেছে সোমবার থেকে তুমি বাসে যাবে তোমার বদলি আমি কাজ করবো— দুর্বল শরীর এত ধকল সইবে না। তোমাকে পথ্য করার জন্য টাকাও দিয়েছে"। বলে ট্যাঁক থেকে দু'টো নোট বার করে দিল।

মেঘ ঘনিয়ে এলো পানুর চোখে মুখে। অনেক কষ্টে বজ্র বিদ্যুৎ ঠেকিয়ে রাখলো, অনিচ্ছুক হাত মেলে টাকাটাও নিল।

"তাহলে কোন্ জায়গায় বাস ধরবো—"

"স্ট্যান্ডে—" নিস্পৃহ গলায় বলল পানু।

"তোমার বদলি-- তুমি ট্রিপ ধরে আমাকে লাগিয়ে দেবে—" ছেলেটি একটু ভেবে বলল— "আমি শেয়ালদা পুলের কাছেই থাকবো—"

এক নম্বর হারামি, টেনে থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করে— মনে মনে গজরায় পানু। আমার মুখের গরাস ওনাকে তুলে দেব-কি আমার বাপের ঠাকুর। আমার পেট নেই-সে পেট পোড়ে না— মুখে হতাশ ভাব টেনে এনে বলে— "এ হপ্তা পুরো কাজে আমার —পরের হপ্তায় তুই নে না—" ছেলেটি ছোট ছোট চোখ করে তাকালো। কাঙাল ফ্যাকাসে মুখখানা সহসা ক্রুর হ'য়ে উঠলো।

"রবিদা বলেছে— তার নাম বললেই তুমি ছেড়ে দেবে—"

পানুর হাঁটুতে বল কমে গেল। মনে হতে থাকলো সত্যিই সে নির্জীব হয়ে পড়েছে। গোঁঙানোর মত করে বললো—"দেখি"।

বেশ ঘাবড়ে গেল সে।

ব্যাপার শুনে পানুর বন্ধুরা পরামর্শ দিল— "গুরুকে একটু ভাল জায়গা চাখিয়ে আন—সব ঠিক হয়ে যাবে—"

পানু নিজেও যে জানে না তা নয়। তার কাছে রবিদা কমিশন টানছে ধরাবাঁধা। এতদিন যথেষ্ট রেয়াৎ করে এসেছে— এসব বদলিতে কমিশন দেড়া। সকলের যা হয় ওরও তা হ'তে আর কত দেরি হবে! তাই কান ঘুরিয়ে নাক দেখান। পুঁজি যেটুকু জমেছিল এবার তাতেই টান পড়বে।

এখন উভয় সঙ্কট পানুর। এ শাঁখের করাত যেতে কাটে—আসতেও কাটে।

রবিদাকে নেমন্তন্ন করলো পানু মরিয়া হয়েই। মানে কম করে তিনটে সপ্তাহ কাজ না পেলে তার অবস্থা সেই আগের মতই। দু'দিন যদি পেটপুরে খায় তো বাকি দু'দিন উপোস, দু'পয়সা জমাও অসম্ভব। ঘোঁৎ ঘাঁৎ সমঝে দিয়েছিল বন্ধুরা— কোন অসুবিধাই হয়নি। পুরো তিন হপ্তা তার মঞ্জুর। কিন্তু তিনটে সপ্তাহ কাজ করা আর হয়ে উঠলো না, বেজায় জ্বরে কাবু হয়ে বাড়ি এসে শুলো।

ছুটকো চুরি-চামারিতে থাকতে সে ছিল স্বাধীন— দরকার মত কারবার করতো। একবারও পুলিস তাকে কায়দা করতে পারেনি। মাস মাইনের চাকরিতে এসে কি ফেরেই না পড়েছে। ডাক্তারখানা থেকে এসে মনের যাতনা শরীরের যাতনার তিনগুণ হলো। দু'চারজন সহকর্মী এসেছিল— এসেছিল পুরনো বন্ধুরাও। সবাইকে ভাগিয়ে

দিয়েছে। এ লজ্জা, এ গ্লানি সে কারো সাথে ভাগ করে নিতে চায় না। আর চায় না তার মা এসব জানুক।

ডাক্তার না বললেও বস্তিতে থাকে তারা। বয়স বাড়ার সাথে চোখ কান দিয়ে অনেক কথাই তাদের জানা হয়ে যায়। মা তো কবে থেকে বলেছে— "বিয়ে থা কর— আমার তো পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই—। একটা বৌ এলে দু'জনে সুখ-দুঃখের কথাও তো বলা যায়।" সবে পানু ভাবছিল আর দুটো টাকা জমলে এদিকটা একটু নিশ্চিন্তি হয়ে— দেখে শুনে বিয়েটা করেই ফেলবে। কি ঝকমারী যে হলো। সেই বদলি ছেলেটা নিশ্চয় এখন কাজ করছে। একটা আতঙ্ক শিরশিরিয়ে বয়ে গেল। এভাবে শুয়ে বসে রোগভোগ করলে চাকরি তো তার থাকবে না। রুগ্ণ বলে খেদিয়ে দেবে। জ্বর ছাড়ুক না ছাড়ুক কাজে তাকে যেতেই হবে।

পরদিন কাজে গেল পানু। বড় কষ্ট। সে যে কী দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করা। দু'দিন পরে পরেই ঘুরে ঘুরে জ্বর আসে। চেহারাটাও বুড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। চুলের গোছ পাতলা হ'তে হ'তে টাক বেরুনোর জোগাড়, মুখের উপর বর্ণহীন রুগ্ণতা, কোটরে বসা চোখ অব্যক্ত যন্ত্রণার ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন।

বন্ধুরা মমতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে— "আরে বেকুফ—এতো হাতে খড়িরে— এতেই ঘাবড়ে গেলি-ভাবিস নে— ভোগান্তি যা আছে তা তো হবেই। বুকের দোষ না জন্মানো পর্যন্ত—সব ঠিক হ্যায়—

তাদের চোখেও একই যন্ত্রণা, একই ক্ষোভ, একই হতাশা।

পানু করুণ চোখে চেয়ে রইল। মনের কথা খুলে কাউকে বলতে পারল না— রবিদা সাড়াশির মতো চেপে ধরেছিল ওর হাত, বলেছিল—'অত বোষ্টমপনা দেখাসনে পেনো পেঁদিয়ে বৃন্দাবন পাঠাব—একা-একা স্ফূর্তি হয়—।" পালাতে পারেনি পানু রবিদাকে কাটাতে পারেনি। ভয়ে-অসুখে যত না তার বেশি ভুগছে সে মনের গ্লানিতে। এরকম একটা কাজ কিছুতে মেনে নিতে পারছে না সে।

এই সময় করুণার সাথে বাসেই একদিন দেখা হলো। করুণাকে এত রাতে বাসে দেখার কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। এই সব রাতের যাত্রীদের তার চেনা। করুণাকে ঠিক সেই পর্যায়ে ফেলতে একটু বাধলো। করুণা একা—চেহারায় হাড় বের করা দৈন্য। মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। ওকে লক্ষ্য করেনি। টিকিটের পয়সা এগিয়ে দিতে পানু বললো—'থাক' একটু বোধহয় হাসল।

আর তখনই ওকে নজরে পড়ে গেল করুণার।

"তোমার শুনি শরীর খারাপ—ডিউটি করছো।"

জবাব দিল না পানু। রাতের শেষ বাস—ভিড় যথেষ্ট। অন্যদিকে সরে গেল। করুণার এমন ধারালো নজর। মুখের দিকে তাকালেই তার হাল বেহাল জানা হয়ে যাবে। এই শেষ ট্রিপগুলোতে শরীরটা খাড়া রাখতে তাকে একটু-আধটু খেতেই হয় আজকাল। নাহ'লে হাঁটুতে খিল ধরে যায়।

স্ট্যান্ড পর্যন্ত এলো করুণা।

"এখানে কি-এত রাতে—" বিরক্তি চাপতে পারলো না পানু।

"এই লাইনে লোকের টি বি হয়, যা চেহারা হয়েছে প্রাণে বাঁচলে তবে তো কাজ—"

করুণা যাবার জন্য পিছন ফিরলো।

পানুর এই গায়ে পড়া উপদেশ অসহ্য মনে হলো—। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো—চিবিয়ে চিবিয়ে বললো— "তাতে কার বাবার কি—"

করুণা ফিরেও তাকাল না।

বাড়ি ফিরে পানু মাকে বললো—"শেষকালে তোমার করুণা লাইনে নেমেছে আজ দশটার বাসে বাড়ি ফিরলো।"

"আ রামো—কার নামে কি বলিস রে—ওতো চাকরি পেয়েছে। বালিগঞ্জের দিকে একটা বাচ্চা রাখার কাজ—"

"স্কুল ফাইনাল পাস করেছিল না—"

"তা আর কি করবে—চাকরি তো আর সস্তা নয়—ওদিকে বোনগুলো সব সোমত্ত হয়ে পড়েছে—একে একে পার করতে হবে না!"

ব্যাপারটা শুনলো এই পর্যন্ত। পানুর মনে কোন দাগই কাটলো না। পুরোপুরি বিশ্বাসও করলো না। সবটাই গুল হয়তো। পানুর ভালোর জন্য এই নাটুকেপনা তার কাছে জলের মত পরিষ্কার। ওর সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা। একটা শাঁসালো খদ্দের।

তবুও কয়েকজনকে বলে রাখলো—ওর টিকিটটা যেন না নেয়। তারা অবশ্য কিছু রসালো মসকরা করতে ছাড়েনি। তবে পানু ভালই জানে করুণার যা ছিরি ছাঁদ তাতে ওদের মুখই মরে যাবে।

মাসের পর মাস ডাক্তার-বদ্যি করে করে জেরবার পানু। পর পর কয়টা কমিশনের টাকা বাকি ফেলতে বাধ্য হলো। তার এখন পেটের ভাতেই টানপড়ার জোগাড়।

কাজ তেমন টানতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই হপ্তা ফাঁক পড়ে যাচ্ছে। শেষবার রবিদার চ্যালাকে বলেছিল—"আর একটা হপ্তা করি—তারপর সব মিটিয়ে দেবো। বড়ই বিপদ চলছে—"

"বলবো রবিদাকে"—সে বলেছে "তবে তুই শালা ভোগে চলে যাবি—এত টাকা রবিদা কাউকে বাকি রাখে না মনে রাখিস—"

কাঁদ কাঁদ হয়ে পানু বলেছিল—"ফ্যান-ভাত, নুন-ভাত খেয়েও শুতে যেতাম ভাই—কিন্তু রোগে আমায় খেলো—ঠিক আছে আমিই রবিদার কাছে একবার যাব—হাতে পায়ে ধরে যেমন করে পারি—আর ক'টা দিন সময় আমার দরকার—"

গিয়ে অবশ্য লাভ কিছুই হলো না। রবিদা সেদিন রং-এ ছিল। উটকো ঝামেলায় ক্ষিপ্ত হয়ে পানুকে খিস্তি দিল— "বেজন্মা, চিপ্পু মিনি মাগনায় স্ফূর্তি করবে— কলির কেষ্ট ঠাকুর কিনা—" বলতে বলতে পিছনে ছোট্ট করে একটা লাথি কষিয়ে দিল।

পানু যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যাচ্ছিল। কে যেন ধরে ফেললো।

"গুরু এযে এলিয়ে পড়ল।—"

"মিটকি মেরে পড়েছে—ওটা ওর লাইনের দস্তুর—" একজন টিপ্পনি কাটলো। কমিশনের পুরো টাকা ফেলে তবে যেন এখান থেকে নড়ে—" বলতে বলতে রবিদা বেরিয়ে গিয়েছিল।

একটা পুরো টাকাও ওর কাছে ছিল না। সেদিন বড় কষ্টে বাড়ি ফিরেছিল পানু। শরীরে মনে চূড়ান্ত বিপর্যয় তাকে যেন পঙ্গু করে ফেলেছিল। সারারাত ধরে রবিদাকে কায়দা করার নানা অবাস্তব পরিকল্পনা, ভয়ানক সব পরিকল্পনা ভাঁজতে ভাঁজতে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিল। আর সেদিন থেকে এই চিন্তাই পেয়ে বসলো তাকে।

ঝঞ্ঝাট একটু কাটিয়ে উঠতে—মা পানুকে ধরল—"বিয়ে না করে কিছু ভাল তো দেখছি না। টাকাও জমছে না, শরীরও নষ্ট—"

পানু মনে বড় আঘাত পেল। মার কথায় বোঝাই যাচ্ছে—তাঁর কাছে কিছু গোপন নেই। অথচ মা তো জানলো না—এ তার শখ নয়, তার খেসারত। তাঁকে কে বোঝাবে—বড় অসহায়, বড় দুঃখী সে। তার বন্ধু, তার সহকর্মীরা। তারই ভাগ্যের ভাগীদাররা তারই মত মরণ মরে আছে। হতাশায় ভেঙে দুমড়ে গেছে। ঘৃণায় বিদ্বেষে বুকের মধ্যে বিষের জ্বালা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

মা কি করে জানবে রবিদাকে তুষ্ট রেখে রোজগারের কড়ি ঘরে তোলা কত কঠিন। ঠিক দু'পয়সা এসেছে কি তার শনির দৃষ্টি সেখানেই।

সময় নেই অসময় নেই। মার সেই এক কথা। আবার একদিন বলতে এলো "করুণার বাবা এসেছিল ওদের সেজ মেয়েটা কি নাম যেন কল্যাণী বোধহয় কচি বয়সে দেখতেও মন্দ ছিল না। —তুই দেখেছিস না?—"

পানু অন্যমনস্ক ছিল। একা থাকলেই সারাক্ষণ অকূল চিন্তায় ডুবে থাকে। কত কি ভাবনার ডালপালা ছড়ায়। প্রথমটায় কোন খেয়ালই করেনি। গলার স্বরে মার দিকে তাকাতে বুঝতে পারলো কিছু একটা বলছে। পানু তাকিয়ে রইল।

মা ওর গা ঘেঁসে এসে বসলো। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো "করুণার সেজ বোনটার কথা বলছি— কথা বলবো ওদের সঙ্গে—"

পানু সবেগে মাথা নেড়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলো— 'না'

নরম গলায় মা বললো— "না কেন?"

পানু মাকে দেখছিল। একটু যেন সুখের ছাপ পড়েছে তাঁর চোখেমুখে। পরিষ্কার কাপড়, চুলও আঁচড়ে বেঁধেছে। অনেকদিন যেন মাকে দেখেনি পানু। মা তা হলে নিজে খেয়েও আর একজনকে খাওয়াবার কথা ভাবছে। এটুকু উদ্বৃত্ত সে আমদানি করেছে। পানুর চোখ ঘুরে এলো ঘরের চারপাশটায়। রোজই তো শুচ্ছে বসছে, অথচ চোখেও পড়েনি ঘরখানাও যেন পাল্টেছে। আগের থেকে যেন অনেকটাই সাজানো গোছানো তকতকে।

"ঘর সাজিয়েছ। ছেলের বিয়ে দেবে—" হাসলো পানু তেতো, বিশ্রী দেঁতো হাসি। এই মুহূর্তে মায়ের এই ছোট স্বপ্নটা সে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

"দেবই তো, ছেলে বড় হয়নি—" মার মু-খ হাসিতে উজ্জ্বল, গলায় আহ্লাদী সুর।

পানু নির্বাক।

আরও কিছুদিন যাক। এখনও সময় হয়নি। একটি মেয়েকে একটি মেয়ের সুখ-আহ্লাদ — খেলনাপাতি তো নয়। 'আমি কিন্তু করুণার বাবাকে কথা দিয়েছি। আমি নেব—" পানুর সাড়া নেই। সে আবার চিন্তায় ডুবে গেছে।

শুধুই অন্ধকার, অক্ষমতার কালি। সেদিনের সে ব্যঙ্গ, সেই থুথ্‌কার। টাকা বার করতে না পেরে তার রুগ্ন জীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে রবিদার চ্যালাদের উৎকট পীড়নের উল্লাস তার নতুন মর্যাদাবোধকে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তার মন জান্তব প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

যুৎসই রাস্তা একটা, একটা উপায় তার মাথায় আসছে না। যা আসছে তা কোনদিন সে পেরে উঠবে না। অথচ শরীরও আর বয় না। কথায় কথায় যাকে তাকে খিঁচিয়ে ওঠে। সর্বদা ত্রাসের মধ্যে রয়েছে। সেই ছেলেটা হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। রবিদা হয়তো তাকে এইভাবে কোনঠাসা করে মরিয়া করে তুলতে চায়। একটা আঙ্গুলও যদি ওঠায় তাহলেই তাকে সরাবার একটা সুযোগ। রবিদাকে তুষ্ট করার কোন চেষ্টাই আর সে করেনি। বন্ধুরা সাবধান করেছে, ভয় দেখিয়েছে পানু টলেনি। বলেছে— 'মার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি—'

গোকুল বলেছিল—'আমার হয়ে তুই যা--আমি বরং খরচটা দিয়ে দেব'— তাতে আরও ক্ষেপেছে রবিদা--'আমাকে ইনসাল্ট—ওর মত কয়েকশ চুনো চানা আমার পকেটে--পিঁপড়ের পাখা গজিয়েছে রে। এবার ঝাড়েমুলে ওপড়াতে হবে--"

পানুর বড় সমস্যা--সে দাগী। রবিদা তাকে ডাকবে ডাকবে কানাঘুষো শুনেই পানুর হয়ে যায়। কিভাবে যেন পুরনো ছিঁচকে কাজে তার একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। কোথায় যে বাধে আজকাল। না হলে তো বাসে উঠতে নামতে কত মালই সে হাতাতে পারতো। হাত ওঠে না। রবিদার হিংস্র হাত যতই তাকে খুঁজে বেড়াক তার আর ওপথ মাড়ানো সম্ভব নয়। এইখানেই অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তার তফাৎ সে দাগী। রবিদার সামনে পড়ে গেলে তাই সে এখনও কাঠ হয়ে থাকে।

ভেবে পায় না পানু এই বেঁধে মার খাওয়া, সবাই কেমন সয়ে নিয়েছে। মাথার উপর খাড়া ঝোলান—অথচ চলতে ফিরতে কেউ আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাচ্ছে না। কাজ যাওয়া মানেই অনেকগুলো মুখে আহার বন্ধ। একটা অনিশ্চয়তা, একটা পিছল পথের অন্ধকার হাঁ করে থাকা। ভাবতে গিয়ে হাঁফ ধরে যায় পানুর। কি বিশাল জাল—এর মধ্যে আত্মহত্যা করে বসেছে ওদেরই এক সহকর্মী। সবাই জানে কি পরিণতি এড়াতে— কেন এই আত্মহত্যা! পানু একেবারে মুষড়ে পড়লো। সেই দড়িটা যেন তার গলাতেই প্যাঁচাতে শুরু করেছে শুধু টানের অপেক্ষা।

রবিবার রবিদা তাকে ডেকেছিল অনেক আশা ভরসা নিয়ে, অনেক কদর দেখিয়েই ডাকছিল। জরুরী, খুবই জরুরী কাজ। শরীরের এই হাল সে আর কাজ করার তাগিদ রাখে না বলে দিয়েছে। বলেছিল অনেকদিন অভ্যেস নেই— এই

শরীরে মারধর সহ্য হবে না— মুখে রক্ত উঠেই মরে যাবে—বেশ বিনয়ের সাথে কাঁদ কাঁদ হয়েই বলেছিল। বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে কোন ত্রুটিই রাখেনি। তবু রবিদার মুখের চেহারায় ভয়ানক একটা কিছু দেখেছিল সে। মনে হয়েছিল জ্যান্ত আর ফিরতে পারবে না। কিন্তু অক্ষতই ফিরেছিল। যেন একটা তেলেভাজা কুকুর শক্তিমান প্রতিপক্ষের সামনে থেকে ল্যাজ গুটিয়ে একটু একটু করে পিছিয়ে আসছে। সামান্য কুঁই কুঁই করার সাহসও আর নেই।

তখন নিজের প্রতি যে অনুকম্পা, যে ধিক্কার জেগেছিল বাড়ি ফিরে সে অনুভূতিটা কেটে গেল। বরং অবাক হয়ে ভাবলো কি রকম মারাত্মক ফলাফলের সামনে দাঁড়িয়ে সে অসম্মতি জানালো — এ সাহস পেল কোথায়! একবার ভেবেছিল রাতে বাড়িতে থাকবে না -- তবু সে বাড়িতেই রয়ে গেল। ভেবে দেখলো — বেইমানীর বদলা নেবার আরও অনেক পথ খোলা আছে রবিদার। তেমন তোড়জোড় তার না করলেই চলবে।

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কখন কোথা থেকে আচমকা আক্রমণ নেমে আসবে। তার বুকের মধ্যে নিরন্তর আগুন জ্বলছে। মুখ বুজে পীড়ন আর অপমান সয়ে সয়ে সে যেন খ্যাপা কুকুরের মত। আর খিঁচড়ে থাকা মন মাথা নিয়ে খামোকা ঝগড়া বাধিয়ে বসে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে, নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে। কারুর বেফাঁস কথা, সে হাসি মস্করাই হোক না কেন পানু ঠিক ঠিকরে পড়বে গিয়ে। এমনি করেই গায়ের ঝাল মেটায়।

ঢিক ঢিক করে বাস চলছে, ঠেসে প্যাসেঞ্জার তুলছে — বাবুরা ক্যাটর ক্যাটর করছে— "কাজকর্ম নেই, হাওয়া খেতে বাসে চড়েছি নাকি — পয়সা ফেরত দে — নেমে যাব—"

কিম্বা "হাত পা নাড়—ঘন্টাটা বাজাও — পিছনে বাস দেখলে তখন পড়ি মড়ি করে ছুটবে — প্যাসেঞ্জারদের মানুষ মনে কর না—"

নাক কান বুঁজেও স্বস্তি নেই। শুরু হয়ে যায় খিস্তি, গালাগালি—

"শালাদের খিস্তি না দিলে কান খোলে না। প্যাদানী খাবি, না বাস চলবে—"

তার ওপর টিকিট চাইলে গরম, না চাইলে গরম— "গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে ভিতরে এসে টিকিট কাট— নামিয়ে টিকিট কাটছে আমরা পচে মরছি—"

যত বেলা বাড়তে থাকে, ভিড় বাড়তে থাকে ততই মাথা গরম হতে থাকে পানুর। গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে। চড় চাপড়ও খায়। তবে বাসে একদল মারমুখী হলে আর একদল তা থামিয়ে দেয়।

শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলে মা বলতে এল— "করুণা বলছিল — তোর এই শরীর—"

মাথায় রক্ত চড়ে গেল— "জাহান্নমে যাক— আমার জন্যে এত নাকিকান্না কেন তা আর বুঝি না যেন — না? সে নাকি বিয়ে করবে না— আমার পিছনে এমন ছিনে জোঁকের মত লাগা কেন তবে?"

মা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখের চেহারায় ধরা পড়ে গেছে — নেশার ঘোরে আছে সে। শান্ত গলায় বললো — "একে তে শরীরের এই হাল এর ওপর নিত্যি নেশাভাঙ করলে তুই বাঁচবি"—

"আমি বাঁচবো না, আমি বাঁচতে পারবো না, লোকে আমাকে বাঁচতে দেবে না।" চিৎকার করে ওঠে পানু। "রোগে না মরলে অ্যাকসিডেন্টে মরবো— গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

"হয়েছে, আর চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করিস নে— স্বাস্থ্য না থাকলে সবই যাবে—"

"যাও, ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করো না সারাদিন খেটেপুটে এসে গীতা বাইবেল আওড়ানো ভাল লাগে না—"

সেই ছেলেটাকে আবার এক হপ্তার কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে পানুকে। মা বললো, "ভালই হয়েছে — তোর একটু বিশ্রাম হবে রোগা শরীর খাটতে পারিস না— কি রকম খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিস।" মা কুটনো কুটতে কুটতে বলে— "আজ আর রোদে ঘুরিস না, বাড়িতে থাক— করুণাকে আসতে বলেছি—"

"করুণা, করুণা করে তুমি দেখি আমাকে পাগল করে ছাড়লে—।" বিরক্ত হয় পানু। বলেছি না আমি মেয়েছেলের চক্করে নেই— বুড়ির দিল্লাগী দেখ— চেঁচিয়ে মেচিয়ে লাফ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় পানু। লোকের কি আজব চরিত্তির— আপনি শুতে জায়গা পায় না— শঙ্করকে ডাকে— চাকরি দেখেছে চাকরি— সব ফোঁপড়া— বুড়ি তার কি বুঝবে! কেন মিছে আশায় আশায় ঘোরানো মেয়েটাকে—

এই তো ভাল কাজকর্ম করে খাচ্ছে— চেহারায় বস্তিবাসীর শুটকো ভাব কেটে গিয়ে নতুন চেকনাই ফুটেছে। সেদিনও তো দেখল বাসে— আলতো করে চুল বেঁধেছে, রঙিন ছাপা শাড়িতে ফুর ফুরে হাওয়া —হয়ত হাত ধরে সে অনেকটা পথ যেতে পারত! কিন্তু পথ যে ফুরিয়ে যাচ্ছে—

ভোরের ট্রিপের বাস নিয়ে বেরিয়েছে পানু। ঢাকুরিয়া পৌছে দেখলো সাঁইত্রিশ নম্বরের টার্মিনাসে সব ক'টা লাইট পোস্টে লাল পতাকা উড়ছে। বাসগুলো খালি, সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টররা উত্তেজিত। দল বেঁধে কি সব কথাবার্তা বলছে। কেউ কেউ মোড়ের চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে। বাস রেখেই একবার ছুটে যাবে ভাবলো— কি হচ্ছে ওখানে! কিন্তু নেমেই বুঝলো যাওয়া চলবে না। বাধা আছে, অঘোষিত কারণ আছে। এদিকে কাজকর্ম যেমন চলছে চলবে— কেউ চা খেতেও ওদিকে যাবে না। কেউ কারো সাথে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে— কি জানি যদি মুখ ফসকে কিছু বেরিয়ে পড়ে। পানুর মনটা দমে গেল— একি অনাসৃষ্টি রে বাবা! ওরাও তো বাস-কর্মচারী! ওরা ওদের দাবিগুলো দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে। এদিকেও কয়েকখানা পড়েছিল — কিছু তার ছেঁড়াখোঁড়া— তবু বুঝতে কষ্ট হয় না ওরা চায় বাস পিছু ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের স্থায়ী চাকরি। পানুর নাচতে ইচ্ছে করছিল— ইচ্ছে করছিল ওদের দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে— শক্ত আরও শক্ত করে।

বোবার মত সিটের এক কোণে বসে একটা উড়ন্ত পতাকার দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবছিল— এই রকমই কিছু একটা আশা সে এতদিন মনে মনে পুষে আসছিল— কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু তার চিন্তায় ধরা দিচ্ছিল না। এটাই তো সেই পথ— এই পথেই সে তার বন্ধুরা রবিদাকে কায়দা করতে পারে। স্থায়ী চাকরি, শ্রমিক আইন, ঠিকাদার বরবাদ।

খবর কি চাপা থাকে। প্যাসেঞ্জাররাই বয়ে আনছে খবর। আজ বড় ভালো লাগলো তার। কেউ বলছে— দেশটা উৎসন্নে গেল, কারো রাগ— অফিস টাইমে বাসের এই বেহাল, মিনিতেও ওঠা যাচ্ছে না, কেবল দাও, দাও। খাটবো না— মাইনে দাও— কম রোজগার নাকি মশাই চুরি করে সব সাফ করে দেয়। ড্রাইভারে, কণ্ডাক্টরে আধাআধি বখরা। বাস চালান স্রেফ লোকসান।

'ওদের চাকরি তো স্থায়ী নয় মর্জিমত ছাঁটাই, আইন-কানুনের বালাই নেই— ইউনিয়ন তো নেই— সরকারি বাস দাদা নয়'

'কদিন কাজ করে একটা কণ্ডাক্টর? খাটিয়ে ছিবড়ে করে ছাড়ে—'

সহানুভূতিশীল লোকও আছে।

পানু ভাবে— কে আর জানে মাঝখানে ঠিকাদারও আছে। ওদের বোধহয় ঠিকাদারের সাথে বনছে না। বোধহয় কমিশন বেশি! কিম্বা ওরাও হয়তো ভাবছে একটা বিহিত করতে হবে—একটা পথ নিতে হবে। নিজের রোজগারের পয়সা— ক'দিন আর ভাগ দিতে প্রাণ চায়।

বাসটা বোঝাই হয়ে এসেছে— ছাড়বে। স্টার্টার হুইসিল দিল। একটু ব্যাক করে নিয়ে সামনের দিকে বাঁক নিতেই দেখা গেল ঝাণ্ডা হাতে ওই বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টররা বুকে ব্যাজ এঁটে একপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একজন বক্তৃতা দিচ্ছে— "বন্ধুগণ, আজকে বাস-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজ যদি আমরা এই ছাঁটাই না রুখতে পারি তবে আমাদের কারুর আর পার্মেন্ট স্থাযী হবে না। আমরা সবাই পার্মেন্ট চাকবি চাই, আমরা শ্রমিক — শ্রমিকের যে আইন আছে সে আইন চালু করতে হবে। যখন তখন বিনা নোটিসে ছাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। এ ছাঁটাই আমরা রুখবো—'

বাস টার্মিনাস ছাড়লেও খানিকটা গড়িয়ে এসে এদের কাছাকাছি আবার থামলো। কয়েকজন চিৎকার করে স্লোগান দিলো— "সমস্ত বাস শ্রমিক এক হও ; সমস্ত বাস শ্রমিক আমাদের পাশে দাঁড়াও।" পানু থাকতে না পেরে জোরে সিটি বাজিয়ে দিল।

বাস এগিয়ে চললো— খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলো— এদিকেও একটা দল একই রকম বক্তৃতা করছে।

দুপুরের শেষ ট্রিপ সেরে গুমটিতে এসে দেখলো অনেকেই রয়েছে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডিউটি সারা হয়েছে অথচ বাড়ি ফেরার গরজ নেই। কেমন একটা স্তব্ধতা ভারী হয়ে রয়েছে। কি যেন ভাবছে, কিসের যেন অপেক্ষা। ডিপোয় ফেরা বাস দাঁড়িয়ে পড়ছে নতুন করে ছাড়ছেও না। পানুর রক্ত চনমন করে উঠলো। বুকে

হাজার হাতির বল এসেছে। নতুন কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাকে উৎসুক চঞ্চল করেছে। দাঁড়িয়ে, বসে নির্লিপ্ততা জড়িয়ে সে হাঁফিয়ে উঠেছে।

কখন ছুটে ব্রিজের ওপরে চলে এসেছে তার খেয়াল নেই। ওপাশে দেখা যাচ্ছে বাঁশ দিয়ে চট টাঙিয়ে বানানো একটা ক্যাম্প। তার একটা খোঁটায় লাল রঙের পতাকা উড়ছে। ভিতরে মাটিতে কাগজ বিছিয়ে শুয়ে বসে আছে ওরই ভাই, ওরই সহকর্মীরা। যাদের সাথে ওর কিছু কিছু পরিচয় আছে। চায়ের দোকানে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, সুখ-দুঃখের কথাও হয়েছে। আত্মীয়ের বিপদে আত্মীয় যেমন করে ছুটে যায় ওর প্রাণটা তেমনি ছুটে যাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে। কিন্তু বেড়িটা আগে ভাঙা দরকার।

ঠিক এমনি সময় প্রায় ওর গাঁ ঘেষে একটা কিছু ছিটকে পড়লো নিচে আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটলো। মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো— জনাকয় রুক্ষ চেহারার ছেলে একটি টেম্পো এনে ঠেকিয়েছে রেলিং-এর পাশে। হাতের ইশারায় পানুকে সরে পড়তে বললো—

পানু ওদের নজরে রেখেই ধীর পায়ে এপারে চলে এলো। বোমার আওয়াজে ওদের গুমটি থেকে কেউ কেউ উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। চারিদিকে হঠাৎ হুড়োহুড়ি— কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মহিলারা ছুটে যাচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। ঠেলাঠেলিতে এক মহিলা বাচ্চা নিয়ে পড়েই গেল রাস্তায়। পানু তুলে ধরলো বাচ্চাটিকে। ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে সে। মহিলা বাচ্চাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার ছুটলেন। হঠাৎ করুণার মুখ ভেসে উঠল চোখের উপর। এই মুহূর্তে সেও হয়ত কাছাকাছি কোথাও একটি শিশুর হাত ধরে এমনি ছোটাছুটি করছে।

ওদিকে পটাপট বোমা পড়তে শুরু হয়েছে। পানু গুমটিতে ফিরে এসে বললো— 'দেখলাম তো মোটে সাত আট জন আছে ক্যাম্পে। কি হবে?' উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে সে।

যারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো তারাও পানুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের মুখে গভীর উদ্বেগ, অশুভ আশঙ্কা। অথচ এ ওর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পানু হিসাব করে দেখলো ওরা আছে কম করেও পনের-কুড়ি জন। টেম্পোটা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পের দিকে। সেখান থেকে স্লোগান উঠেছে, 'বাস শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, গুণ্ডাবাজি করে ধর্মঘট ভাঙা যায় না যাবে না—'

ওরাও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ব্রিজের মুখে। এমন সময় ব্রিজের ওপারেও শ্রমিকদের স্লোগানের প্রতিধ্বনি উঠলো— 'গুণ্ডামি করে ধর্মঘট ভাঙা যায় না যাবে না', 'বাস শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ!'

ঝান্ডা হাতে এগিয়ে আসছে একদল মানুষ শান্ত নিরস্ত্র।

আর তখনই বিপুল বেগে রে রে করে ছুটে গেল ওরা টেম্পোটার দিকে।

চায়ের রঙ লাল

ভোর হয়েছে। কুয়াশার মোড়কে ধূসর হয়ে আছে চারিদিকে। দূরের পাহাড়ে কমলাবনে ঘন সবুজ আঁধার। নিচে চা বাগান। বুক সমান হাজার থালার মত। মাঝে মাঝে ছড়ানো শাখার বড় মুকুট— ছায়াগাছ। মাইলের পর মাইল— ধাপে ধাপে উঠেছে— আবার সমতলে মিশেছে। এখন কুয়াশায় সব অস্পষ্ট-সব ধোঁয়াটে। বাতাস লেবু ফুলের গন্ধে ভারী। ভিজে গতিহীন।

কুলি বস্তিতে উনুন জ্বালা হয়েছে। চালের ওপরে ধোঁয়ার টুপি আঁট হয়ে আছে। শীত পড়েনি। তবুও খোলা হাতে পায়ে ঠান্ডার কামড় বোঝা যায়। ঘুম ঘুম চোখে গায়ের ডোক্‌লা চেপে ধরে খোলা দরজায় দাঁড়ালো মইলি। বুক ভ'রে ভিজে বাতাস টেনে নিল। কাঠের পার্টিশানের ওপিঠে জল বসিয়ে এসেছে স্টোভে। বাবা কখন বেরিয়ে গেছে টের পায়নি। খোলা দরজা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে তার। এখন অনেক কাজ। দূরের ছায়া পাহাড় থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। কুয়াশা বড় ভাল লাগে মইলির। চেনা সব কিছুই কেমন অচেনা হয়ে ওঠে। চেনা পথ, চেনা গাছ দূরের ওই চেনা পাহাড়টা যেন থেকেও নেই। মেঘের রাজ্যে চলে এসেছে যেন। ঘরের মধ্যেও সেই কুয়াশা আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে।

মায়ের গলা পেল। কাশছে। এবার উঠবে। চায়ের কেটলিতে এক মুঠো চা ভরে মার সামনে রাখল। মা ঘাগরায় চোখ মুছে চায়ের মগটা দু'হাতে তুলে নিল। চায়ের তাজা গন্ধে চোখ বুজিয়ে হাসল। চোখের দুকোণে ভাঁজ পড়ল কান পর্যন্ত ছড়ানো। মেচেতার চাপ চাপ দাগ সারা মুখে। মইলি ভাবে এই নরম নরম মা তার বড় সুন্দর। চায়ের বাগিচায় মাথায় ফুল কাটা রুমাল বেঁধে সবার সাথে সে যখন পাতা তোলে, মইলি ভাত নিয়ে বসে থাকে— শুধু মাকেই দেখে। তার ফোলা ফোলা চোখের পাতার বাঁকা টানটি যেন সকলের চেয়ে আলাদা। চাপা নাকে দু'পাশে দু'টি ফুল চিক্ চিক্ করে। মার গায়ে কাঁচা চা পাতার গন্ধ। মা যেন একটি জীবন্ত চা গাছ।

দু'জনে রান্নার কাজ সারছে। মা প্রথম বলল— তেরো বাবু কুথা গয়ে—।

মইলি আটা মাখা হাতেই একবার দরজার বাইরে উঁকি দিল। বেলা বাড়ার সাথে মাটির গায়ে কুয়াশা ঘন হয়ে নামছে। বাইরে কারা যাচ্ছে আসছে, কুয়াশা মোড়া,

ভুতুড়ে ছায়ার মত। ওপাশে পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। তার ওপিঠে সূর্য উঠেছে হয়ত। হিমে ভেজা কাঁচা সবুজ পাতায় হাল্কা আলোর চমক। আর একটু বাঁয়ে হেললে তবে তাদের বস্তির চালে আলো পড়বে— তারপর উঠোনে। এবার তো আসার সময় হয়ে গেল। কেউ একজন কুয়াশা ঠেলে চলে যাচ্ছে— মইলি চেঁচিয়ে ডাকল—বাবাকে পাঠিয়ে দাও তো—চা ঠান্ডা হয়ে গেল—

সাড়া দিল না সেই ছায়া মানুষ। তাবার ঘরে দেখে আয়— মা বলল।

মইলি শুকনো কাপড়ে ডলে ডলে হাত মুছল। জটাপাকানো অগোছাল চুলে সামনেটায় একটু কাঁকই বুলাল। টেনে টেনে ঠিক্ করল—দোমড়ান পোশাক মায় লাল স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে নিল। ফাটা আপেলের মত রং চটা গাল। কুয়াশার হিম ঘসে ঘসে খানিকটা ময়লা তুলে ফেলল। লাল হলুদ রঙ ফুটে উঠল সেখানটায়। আয়নায় নিজের মুখটা চকিতে দেখে ভেংচি কেটে বেরিয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়েই অবাক হয়ে গেল। কুয়াশা সত্ত্বেও বেশ কিছু মানুষ ওপাশে গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। তাড়াতাড়ি সেও গিয়ে দাঁড়াল। তারাই কথা বলছে নিচু গলায়. কি যেন দেখছে হাতে হাতে। সময় কোথায়। এখুনি কাজে বেরুতে হবে যে—

বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়াল মইলি। হাত ধরে টানল। চা ঠান্ডা হচ্ছে। নজর করল না ওকে কেউ।

— লাল সিং— কেয়া গরনে—

শেষ রাতে না আজ ভোরে ইস্তাহার ফেলে গেছে পোস্টার সেঁটেছে—

কুহলি লে হেরনে না পায়—ও সালে, ধের এ নারামরো-ইউনিয়ন-টটাওনেযালা

চুপ— লাল সিং থামিয়ে দিল—

-- ধর্মঘট হোবে কি না মেরো বাতলাব —

কুয়াশায় বার বার মুখগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আবার হাল্কা হলে চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠছে। কথা বলার সময় নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুন্ডলী বার হয়ে আসছে। মাথার গোর্খা টুপি ঘিরেও গোলগরম ধোঁযা। কুয়াশার আড়ালে ডুবে যাচ্ছে বিশাল পাইন বনের চির সবুজ, ডুবে যাচ্ছে কমলালেবুর বাগিচা। ফর্সা হয়ে আসছে দূরের পাহাড় চূড়া। সবে লাল আলো তার ঠোঁট ছুঁয়েছে।

মইলি আবার বাবার হাত ধরে টানল—। কেউ নড়ল না। দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে, যেন বুদ্ধের গুম্ফায় প্রার্থনা করছে।

জামার হাতায় ভিজে মুখ মুছল মইলি। ফেটে লাল হয়ে যাওয়া গাল জামার ঘষায় জ্বালা করছে।

বলল— 'তোমাদের ধর্মঘট'—

'একদম চুপ— কেউ খিঁচিয়ে উঠল। হাতের কাগজখানা দুমড়ে মুচড়ে কুচি কুচি ক'রে ছিড়ে ফেলে দিল। মইলির চোখ বড় হয়ে উঠল, ঝরনার পথে কেউ যেন পাথরের আড়ালে উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল বনের ছায়ায়।

বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরল মইলি। লাল সিং সেদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে থু থু ফেলল।

মা যাবার সময় ভার ভার মুখে বলে গেল কোথাও যাবি না— কারো সাথে যাবি না— আম্মার কাছে থাকবি—

জল আনব না—

বাবা মা দু'জনে দু'জনের দিকে এক পলক তাকিয়ে রইল— তবে একা যাসনে যেন—

মা চুমু খাওয়ার ভঙ্গীতে গালে গাল ছুঁইয়ে চুপি চুপি বলল— চারদিকে নজর রাখবি—

মইলি বস্তির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বাবার হাত ধরে এগিয়ে এল। তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একবার তার মনে হ'ল পাইন বনের আড়ালে আড়ালে একটা কিছু নড়া চড়া যেন বোঝা যাচ্ছে। সামনেই সেই পোস্টার একটা গাছের গুঁড়িতে আটকানো— লাল কুক্রী রক্তে ডোবানো—

পাহাড়ের গা থেকে কুয়াশার আবরণ খসে যাচ্ছে। ঘাস মাটি ঝোপঝাড় থেকে ঘন ধোঁয়া উঠেছে। ঘসা কাঁচের আড়ালে সূর্য দীপ্তিহীন।

তবু বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। ধনমায়াদের নতুন রেডিও গম গম করে বেজে উঠেছে। একটু আগের বুক চাপা ভার কেটে গিয়ে— এখন বেশ ভাল লাগছে। ধূসর এই সকাল, কুয়াশার আড়াল থেকে ফিরে এসেছে চেনা জগৎ ওর কাছে। কুয়াশার ঢাকা না ওঠা পর্যন্ত ওর কেবলই উৎকণ্ঠা, কেবলই। কি যেন ভয় হয়ত লেবু গন্ধে ভারী বাতাস তিন পাহাড়ের চূড়া, কমলা বন, ছোট ঝোরা, আর জঙ্গল পেরিয়ে ওপিঠের হলুদ ধানক্ষেত, বুঝি কুয়াশার সাথে সাথে সব মিলিয়ে যাবে। তার আপনার জগৎটা হারিয়ে যাবে।

দরজায় উলের গোলাটা নিয়ে বসল মইলি। বোনা শেখার চেষ্টায় জট পাকিয়ে ফেলেছে। ভরা পোয়াতী তারা এসে দাঁড়াল বালতি হাতে— পানি দে না একটু—

আনমনা থাকায় চমকে গেল—উলের গোলাটা হাত থেকে গড়িয়ে গেল— উল-কাঁটা নামিয়ে রেখে ঘর থেকে জল এনে দিল। আজ বোধহয় জল তুলে দিয়ে যায়নি গণেশ দাজু।

গেলি না কাজে— পাশের ঘরের ধনমায়া বেরিয়ে এল।

মানা গরেছ—

ধনমায়া এগিয়ে এল—

খবর জানিস— সিঙ টাম বাগানে—

ঘাড় নাড়ল তারা—

খুন হয়েছে— ফস্ ক'রে বলেই চলে গেল।

মইলি অবাক মুখ তুলে তাকাল।

ধনমায়া তারার পাশে পাশে কি যেন বলতে বলতে যাচ্ছে। মইলি অন্যমনস্ক হয়ে

গেল।

উঠোন ভ'রে বাচ্চারা খেলছে এক একটা চলন্ত কাপড়ের পুঁটলি। অগোছাল একমাথা চুলে চোখ মুখ ঢাকা।

ফুলো ফুলো লাল গালে ছোপ ছোপ ময়লা, সর্দির ধারা। তাদের ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটি হাসিকান্নার ঐকতান ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ে ঘা খেয়ে দূরে দূরান্তে। হয়ত ওদের মা বাবারা দূরের বাগানে কাজ করতে করতে এই খোস খেয়ালের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়।

আম্মা বিছানা ছেড়ে রোদে এসে বসেছে। রোদ এসেছে দুয়ারে। মুখ তার পুরানো গাছের বাকল। খাঁজ, আঁকি-বুকি চোখ নাকের হদিস নেই। ওপরের ঠোঁটে নিচের ঠোঁটে মিশে ঝুলে গিয়েছে। মুখ না খুললে রেখাটা ধরা পড়ে না। মাথায় চুলে সামান্য-গিঁট বেঁধে ওপরে তোলা। বাকিটা ভারী পোশাকের স্তূপ। মইলি চা হাতে নিয়ে দাঁড়াল। লুপ্ত প্রায় চোখে পিচুটির স্তর পেরিয়ে হাসল—দুধের সরের মত ভাঁজ পড়ল চামড়ায়, হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটি কোলের মধ্যে নিয়ে বসল।

মইলির গালে রোদ পড়েছে। গভীর চোখে ঘন কালো ছায়া। চাপা পাতলা ঠোঁটে রক্ত ফুটে উঠেছে। দু'পাশে দু'টি বেণী। আম্মার কোল ঘেঁষে বসল— বুড়ি কষ্টে কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে কচ্ছপের থাবার মত হাত বার করে ওর গালে মুখে বুলিয়ে দিল— ঘড় ঘড়ে ধরা গলায় আস্তে আস্তে ডাকল মইলি—আম্মা—

মইলি বলে বসল—সিংটম বাগানে কি হয়েছে—

বুড়ি তেমনি মুখ জোড়া হাসি হাসল— তারা কেমন আছে— ও তো বিয়োবে—

রাধা এল কাঁধে বাঁক নিয়ে— জল আনবি—

কোম্পানির কলে জল এসেছে—আম্মা জিজ্ঞাসা করে।

—কোথায়-কারা যেন লাইন ফুটো করে দিয়েছে—

মইলি উঠে দাঁড়াল।

—যাবি— আচ্ছা, জলদি জলদি ফিরে আসবি— রং ঢং করে দেরি করবি না আম্মা সাবধান করে দেয়।

ঘরে এসে ভারী কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলল মইলি। বেণী খুলে গোছা করে বেঁধে নিল মাথার উপর। বাঁকে বালতি জুড়ে দু'জনে হাল্কা পায়ে এগিয়ে চলল পাহাড়ের পথে। পাথরে পাথরে পা ফেলে গানের সুর তুলে বুনো ফুলের ঝাড়, গাছের ডাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরে উঠতে থাকলো। ক'টি রঙিন প্রজাপতি।

পাহাড়ের গায়ে ঘুরে গিয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। এখান থেকে সহসা এক টুকরো নিচের মাটি দেখা যায়। দেখা যায় ধানের গমের খেত। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝরনার ধারা যেখানটায় তাদের পাশে ঝরে পড়ছে সেটাই আবার অনেকটা দূরে গড়িয়ে গিয়ে ওপারে নেমেছে একেবারে অন্য পথে। সেই জলে খেতে সেচ দেয় চাষীরা। মেয়ে মরদে, কাচ্চা-বাচ্চায় কলরব তুলে জায়গাটা মুখর করে রাখে।

আজকে সেখানে নিঃসাড় স্তব্ধতা। ছোট ছেলে-মেয়েরা তো নেই-ই, মেয়েরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল-গল্প করছে না। চারিদিকে নিঃঝুম ন্যাড়া ন্যাড়া।

রাধা আস্তে আস্তে বলল— কেউ নেই দেখেছিস।

পিছনে ডালপালা নড়াচড়ার শব্দে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল দু'জনেই। খানিকটা উপরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখে ধীরে ধীরে সরে গেল গাছপালার আড়ালে। ছেলেটি চেনা নয়। এ বস্তির নয়— কারো ঘরে এসেছে কিনা।

নিচের ধান খেতে চোখ মইলির। ধানের ভারী শীষে হলদে আভা। অল্প বাতাসেই হেলে পড়ছে এ-ওর গায়ে। ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত খেতি—দূরে দূরে দু'চারটে ঘর-বাড়ি — নিজের নিজের উঠোনে বসে বেলা কাটায় ওরা, একেবারেই আলাদা জীবন। মেয়ে-মরদে হয খেতে নয় ঘরে। টুপি বুনছে, লুঙ্গি বুন্‌ছে, উলও বুন্‌ছে। ফুলের বাগান, শাক শব্জীর বাগান।

সামনের সালে মইলির বাবা লাল সিং বলেছিল — মইলিকে খেতি ঘরে বিয়ে দেবে। ওর মা হেসে বলেছিল— ভাত মিলবে তো?

বাবা গুম হয়ে থেকেছে। মা হেসেছে, বঙ্গালকি আচ্ছা নোকরিওয়ালা ছেলে দেখ। আপন মনে হেসে উঠল মইলি।

তার ফোলা গাল, চাপা নাকের পাতা লাল হয়ে উঠল। কলকাতামে — নোকরিওয়ালা — লেড়কা-বাবাঃ—

রাধা ওকে ঠেলা দিয়ে বলল— কাকে দেখে হাসছিস, সেই লেড়কাট? দু'জনে শব্দ করে হেসে উঠল এবার। কান পেতে সেই হাসির প্রতিধ্বনি শুনতে লাগল। খিল খিল হাসি অনেক ঝরনা হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে খেয়ে। গাছের পাতায় দোলা লাগিয়ে।

উপর থেকে আলগা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বিরাট পাথরের একটা উঁচু খাঁজে পা রেখে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে ধরে আছে আরও উপরের একটা ছড়ানো ডাল। সেই ছেলেটা নাকি।

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল— নামতে পারছে না— ধরবি নাকি — রাধা বাঁকটা খুলে এগিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ছেলেটি পাথরের আড়ালে সরে গেল। ওদের দেখে হাসল না পর্যন্ত।

লুকোচুরি খেলছে নাকি— গলা তুলে বলল মইলি। খুবই বিরক্ত হয়েছে সে- পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ তাই দেখাতে চাইছে।

ঝরনার কোলে বসে দু'জনে এসব কথাই ভুলে গেল। ততক্ষণে আরও একটি দু'টি মেয়ে জড়ো হয়েছে। সবাই মিলে ঝরনার জল ছোড়াছুড়ি করল, গা হাত পা ঘষে ঘষে ধুলো, উপুড় হয়ে স্রোতের জলে মুখ ডুবিয়ে রাখল। ভিজে চুল ঝেড়ে ঝেড়ে জল ঝরিয়ে নামতে লাগল দল বেঁধে। সবার কাঁধে জলের বাঁক।

নামতে নামতে এক এক জনের সঙ্গে দেখা হয়। বাঁক নামিয়ে বসে গলা খুলে হাসে, গল্পে ডুবে যায়— পাথরে পাথরে মেলা বসে। এখান সেখান থেকে ফুল তুলে

চুলে পরে। শেষে কেউ ওঠে, কেউ নামে। কোমর দুলিয়ে, চুল উড়িয়ে জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছে, উপচানো হাসি আড়াল করে, পাথরে পাথরে তাদের দোলায়িত চলা পাহাড়ী পথকে উচ্ছল করে তুলল।

বস্তিতে ঢোকার মুখে আপনা থেকেই মইলির চোখ চলে গেল পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে আকাশে। সূর্য উঠে এসেছে বস্তির গায়ে। রোদে ধুয়ে যাচ্ছে দূরের চা বাগান। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আটকে গেল পোস্টারে। সেই রক্তমাখা কুক্রি মইলিদের ঘর থেকে তিনটে ঘর বাদে— দেওয়ালের গায়ে। যে অস্বস্তিটা একেবারে মুছে গিয়েছিল— সেটা ফিরে এল। দ্রুত পায়ে পথটা পেরিয়ে এল। বন গোলাপ বাবলা কাঁটার ঝোপটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কাউকে যেন দেখা যাচ্ছে। —কি জানি কে—

সেই যে ছেলেটা তাকে ডেকে বলেছিল— কলকাতা যাচ্ছি— বল তুই আমাকে সাদী করবি—

মইলি তার গালে এক চড় মেরেছিল—বেসরম— মিথ্যে বলে ডেকে এনেছিস— সেই চলে গেছে। ফেরেনি আর। আম্মা বলে সত্যি সত্যি কলকাতা গেছে— নোকরি করে টাকা জমিয়ে ওকে সাদী করতে আসবে— ভাবল দেখবে নাকি ফিরে—

উপর থেকে কলকল হাসি আর কথা ভেসে এল। আর এক ঝাঁক নামছে। ঝোপটায় ফের চোখ পড়তে কাউকেই দেখতে পেল না।

এতক্ষণে রোদ ঝলমল উঠোনে বুড়োবুড়িরা জড়ো হয়েছে— জমাট আড্ডায়। জল নিয়ে ঘরে ঢুকল মইলি। রক্তে ভেজা লাল কুক্রির ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

চূড়া ছুঁয়ে সূর্য পিছনে সরে যেতে শুরু করেছে। পাহাড় ঘিরে এক আলোর মন্ডল। গাছপালার মাথায় মাথায় আলো ছায়ার নক্‌শা নিমেষে নিমেষে পাল্‌টে যাচ্ছে— বস্তির এক দিকের চালে এখন উষ্ণ আলোর মাখামাখি অন্য পাশে পায়ে পায়ে যাত্রা শুরু হল।

একটু আগে তারার শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ওরা সবাই ছিল সেখানে। সব বুড়ি আম্মারা বসেছিল সেখানে। বাচ্চাটাকে গরম জলে ধোওয়াবার সময় ও একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল আম্মার। তারা তখনও কাতরাচ্ছে। ভিতরে একবার উঁকি দেবার খুব ইচ্ছে ছিল— কিন্তু সাহস হ'ল না। বাচ্চার খারাপ হয় যদি।

আম্মা মইলিকে পাঠিয়েছে এক পাত্র গরম কাত তৈরি করে আনতে। একটা পুঁটুলি দিয়েছে ওর হাতে, সেটা গরম জলে চায়ের মত ডুবিয়ে রেখে কাত তৈরি করে তাতে মিছরি মিশিয়ে দিতে হবে।

ঘরের বাইরে পা দিতেই চা বাগিচার দিকে খানিকটা ধোঁয়া পেঁচিয়ে উপরে উঠতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পটকা পরপর ফাটলে যেমন শব্দ হয়—তেমনি শব্দ। শব্দটা ঠিক ওই ধোঁয়ার দূরত্বে কি আরও দূরে ঠাহর হলো না। অনেকেই শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে। মইলি ছুটে নিজের ঘরে ঢুকল। আর কোন শব্দ নেই। গভীর

নিঃস্তব্ধতা ভেঙে কিছু দূরে আবার কানফাটা শব্দ। এটা বোমা নিশ্চয়ই— মইলি জলের কেটলি স্টোভের উপর রেখেই বেরিয়ে এল দরজায়। আর তখনই এলোমেলো ছুটাছুটি—চিৎকার, আর্তনাদ,. হুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে। মইলির সামনে বন্দুক হাতে একটা ছেলে লাফিয়ে এসে পড়ল। কোথা থেকে যে— মইলি সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে ফেলল। আগুন আগুন ইতঃস্তত বোমা পটকা ফাটছে দাপাদাপি শাসানি— ককিয়ে কাঁদছে বাচ্চাগুলো— মারধর করছে নাকি! স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখছে— জল ফুটে এসেছে এখন কি করবে!

কাছেই কেউ চিৎকার করে উঠল— আগুন— মইলি, মইলি—

কার গলা কে জানে। আতঙ্কে গলাগুলো কেমন যেন বোঁজা। ফ্যাস ফেসে। জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়াল— কেউ কোথাও নেই— সরবতটা হয়ে গেছে। কাপে ঢালতে গিয়েও একবার ভাবল। তারপর তাক থেকে খালি বোতল নামিয়ে ভরে ফেলল। সেটা হাতে নিয়ে পার্টিশন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে— অবাক হয়ে দেখল— তাদের দরজার উপর চালটা জ্বলছে।

মইলি ছুটে জানলার কাছে এল। কি করে বেরুবে ঘর থেকে। দরজা কি খোলা যাবে! মনে হল কাদের সব পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। দরজার বাইরে সেই ছেলেটা এখনও আছে নাকি! দেখবে জানালাটা ভাঙা যায় কিনা— বাড়িটা যে সবই কাঠের— তবে শক্ত-পোক্ত।

— না। বেরুতেই হবে— ঘবে কেরোসিন রয়েছে— পুড়েই মরে যাবে যে। চালটা পুড়তে পুড়তে ভেঙে পড়ছে। জোড়গুলো খুলে যাচ্ছে—

মইলি দূর থেকে কিছু একটা দিয়ে দরজার ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করতে লাগল। নিজেই সে আটকে দিয়েছিল— ছেলেটাকে ওরকম লাফিয়ে পড়তে দেখে ভয় লেগেছিল। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। অন্ধকার হয়ে এসেছে ভিতরটা— কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না— চোখ জ্বালা করছে ভীষণ— কাশি পাচ্ছে— বুক ফেটে—

—দরজাটা খুলে গিয়েছে—ওপরের চৌকাঠে আগুন ধরেছে— হয়ত তাই ছিটকানিটা বেরিয়ে এসেছে। সামনের দিকটায় পুরোই আগুন ছড়িয়েছে। বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। সারাদিনের কুয়াশায় ভেজা কাঠ—ধোঁয়া ছড়াচ্ছে— জানালার কাছে সেঁটে রয়েছে মইলি। ওখানে একটু তো বাতাস আছে।

সশব্দে একটা তক্তা ফেটে বেঁকে দুমড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা কাঠের আড়া ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়ল। আর মইলি ঝাঁপিয়ে পড়ল। কষ্টে-সৃষ্টে আগুনের ফোকর গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে আগুনেরই ওপর। পায়ের তলায় ছেঁকা লাগল, গা-হাত-পা-কেটে গেল — জায়গায় জায়গায়। ছেঁড়া খোঁড়া জামা কাপড় ধোঁয়াচ্ছে। একটু একটু করে এগিয়ে এল ঘরের পিছনে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে—

একটা শিশুর তীক্ষ্ণ কান্না ওকে চমকে দিল। জামার পকেটে সেই সরবতের কথা মনে পড়ল। তারা— তারার ছোট্ট সেই লাল রঙের পুতুলের মত বাচ্চাটা—

ফিরে দাঁড়িয়ে কান্নাটা বোঝবার চেষ্টা কবল। ঘরগুলো কি সব জ্বলছে! ভাল কিছু দেখা যাচ্ছে না— আগুন আর ধোঁয়া। কারুর কোন সাড়া নেই কেন! চলে গেছে নাকি সবাই। ওরাই কি ডাকছিল ওকে তখন। পায়ে তেমন লাগছে না এখন আর। —ওর খুব কষ্ট হচ্ছে চলতে পারছে না-- সারা গা ঝলসে গেছে নাকি—

পুড়ে গেছে ওর মুখ! চুলগুলো জ্বলে গেছে সব!

আবার সেই তীক্ষ্ণ কান্নাটা ওকে সজাগ করে তুলল।

শরীরটাকে কষ্টে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মইলি। নেপটি, নেপটি-- মা তো ফেরেনি তারও। একা—ভয় পেয়েছে— আহারে—

চারিদিকে ঘর জ্বলছে, ধোঁয়ায় ঝাপসা। তবু অনুমানে নেপটিদের ঘরের কাছে পৌঁছে গেল মইলি। সামনে পেছনে পাশে কোথাও ঢোকার জায়গা নেই—

তবু এক জায়গায় একখানা তক্তা পুড়তে পুড়তে দুমড়ে ঝুলে পড়েছে— আগুন মিইয়ে এসেছে— বেশ চওড়া ফোকর। বিপন্ন বিহুল পশুর মত নেপটির গোঙানি নিস্তেজ হয়ে আসছে। কিছু না ভেবেই ঢুকে পড়ল সেই ফোকরের ধোঁয়ায় অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে হাতড়ে হাতড়ে বাচ্চাটার একটা হাত-- সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে টেনে নিয়ে এল ফোকরের মুখে। টেনে তোলার শক্তি তার নেই। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়বে— সেই ফোকর দিয়ে তাকে এক রকম দু'হাতে ঠেলে দিল বাইরে—

—শিথিল হয়ে আসছে মইলির দেহ—শেষবারের চেষ্টায় সেও বেরিয়ে এল—।

নিস্তেজ নেপটি যেমন পড়েছিল— তেমনি পড়ে আছে— তারই পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মইলি। ঘরগুলো ভেঙে পড়বে — এখান থেকে যেতে হবে — নেপটিকে তোলবার চেষ্টা করল— নিজেই গড়িয়ে পড়ল পাশে— ঘরের কানাচেই শুয়ে রইল।

মইলি হাঁটছে। পাথরে পাথরে পা রেখে— পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। মা আসবে— তাকে খুঁজবে— বেশি দূরে যাবে না— বনের নরম গাছপালা বিকেলের ছায়ায় ঢেকেছে — আর না— আর দূরে নয়—

মা আসবে কাঁচা চা পাতার গন্ধ মার আঙুলে, পোশাকে। এলাচ দিয়ে চা পাতা ফুটবে— গন্ধে ভোর হয়ে যাবে ঘর। বাবা ডাকবে মইলি— লেবুর গন্ধে বাতাস ম'ম'।

ধোঁয়ার মত গুলগুল করে কুয়াশা ভেসে উঠছে নিচু খাদ, ঢালু উপত্যকা বেয়ে ঝোপ-ঝাড়-লতা-গুল্ম বেয়ে। একটু একটু করে ঘোমটা টেনে দিচ্ছে গাছপালার মাথায়—

কাঁদিস না নেপটি, মা আসবে— তোর মা, আমার মা— ওরা আগুন দেখতে পাবে—

নতুন গল্প

নরম কালো বৌটির নাক পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা। হেসে কুটি কুটি হচ্ছে, আবার হাসি মুখ ঢাকছে লজ্জায়। সিঁদুরে ঘামে সারা মুখ আঠা আঠা। সিঁথি গড়িয়ে নামছে তেলা সিঁদুর, কপালের টিপ লেপটে গিয়েছে। মুখের পাশে ছোট ছোট ছাঁটা চুল খসে পড়েছে। রোদে কটা। সামান্য লাল পাড় কোরা শাড়িতে হলুদের ছোপ লেগেছে— হাতে দু'গাছি লাল চুড়ি। ধলোর বউ। সুধীর মাঝির ছোট ছেলে ধলো। বড় ছেলে সন্তোষ। তার বউ তারা পাশে বসে বউ দেখাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা দু'একজন করে আসছে— আর তারা বউ-এর মুখটি তুলে ধরছে ঘোমটার আড়াল থেকে। বউ এর ভারী চোখের পাতা চেপে বন্ধ, তির তির করে কাঁপছে, খুলে যাওয়ার ভয়ে। সেই ছায়া পড়েছে তার চকচকে গালে। চ্যাপটা নাক মুখ জোড়া, নাকের পাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছোট্ট নাকছাবি ঝিলিক দিচ্ছে। ঠোঁট পুরু কিন্তু বাটাপানা মুখে হাসিটি নয়নকাড়া।

তারা বউ দেখিয়ে তার হাতে একটু গুড় আর জল দিচ্ছে— আর বলছে আশীর্বাদ করোগো বউ যেন লক্ষ্মীমন্ত হয়।

সুধীর মাঝির জমি জিরেত বলতে মাত্র এক চিলতে বসতখানা। জীবন কেটেছে পরের জমিতে চাষ আর চাষ বিনে মাছ ধরে। সে সময় এ তল্লাটে জল ছিল হয়তো। কিন্তু এখন এ অঞ্চলে বারো মেসে খরা। তারপর গত কয় সনে চাষবাস মাথায় উঠেছে। নদী তো সরতে সরতে চলে গিয়েছে বিশ পঁচিশ মাইল। বিষ্টির জল ভরসা। তা বিষ্টি কোথা? আকাশ জ্বলছে রাবণের চিতা। রোদ যেন গলানো কাচ— গায়ে ঠেকলে ফোসকা পড়বে।

গাঁয়ের যেদিকটায় সুধীর মাঝির ঘর সেটা গরিব ও গুরবোদের পাড়া। এখানে পথঘাট ঘেঁষে কেবল বাবলা শেওড়া, ভেরেণ্ডার বন। বড় জোর দু'চারটে সজনে, শিমূল তেঁতুল। মাঠের দিকে এক আধটা পলাশ গাছও আছে। সব শুকিয়ে হাড়-পাঁজর মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্তোষের গেরস্থালি তার বাবার মতই। পরনে তেনা, উদোম শরীর শক্তপোক্ত পাকানো। জীবনের প্রথম থেকে তারও সেই কাজের ধান্দায় এ গ্রাম সে গ্রাম এমন কি ভিন জেলা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি। পুবের জেলা থেকেই তো তারাকে এনে তুলেছে

ঘরে। ধলো অবশ্য একেবারে উল্টো বেপরোয়া, বাউন্ডুলে। গাঁয়ের এই নিরীহ জীবনে তার একেবারে অরুচি। গতরে খাটা তার নিতান্তই অপছন্দ। সুখের খোঁজে একদিন তাই গাঁ ছেড়ে উধাও হয়েছিল।

এই কিছুদিন আগে ফের গাঁয়ে এসে আস্তানা নিয়েছে। সন্তোষ ভাইকে ঘরমুখো করতে দেখেশুনে বিয়ে দিল।

মালতী সেদিন দাঁড়াবার সময় পায়নি। আবার এল দিন কয়েক পরে। দুপুর বেলা। একটা পাখপাখালির আওয়াজ নেই। পথে কুকুর বেড়ালও হাঁটছে না। চারিদিক ইটের পাঁজা ভাজা ভাজা। মাটি ফুঁড়ে ভাপ উঠেছে। পা পেতে হাঁটাই দায়। মালতী কাপড়ের আঁচল জড়ো করে মাথার ওপর চাপিয়ে হন হন করে চলেছে। তাজা শরীর রোদের তাপে কচি আমের পাতার মত তামার বর্ণ। মুখে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। সারাটা বেলা সে এই রোদে রোদে। এখন তো সূয্যি মাথার ওপরে।

সন্তোষের বাড়ি ঢুকে মালতী একটু থমকে গেল। কেউ আছে বলে মনে হল না। ঘরের দাওয়ায় ধলোর থাকার যে ব্যবস্থা দেখেছিল, পাতার ঘেরা খসে পড়েছে প্রায়। পাতা শুকিয়ে বড় বড় ফাঁসা। উঠোনের এক কোণে ডাঁই করা জংলা গাছের ডালপালা কাঠিকুটো পাতা। উঠোনের মাটি চৌচির। দেওযাল ধসে চাপ চাপ মাটি ঢিবি হয়ে আছে। সজনে গাছটা এখন কঙ্কালের মত শুকনো ডোবাটার কিনারে ঝুলে রয়েছে। দু'একটা হলুদ অজর পাতা এখানে ওখানে ঝিরঝির করে ঝুমকোর মত দুলছে আর ছবি তৈরি করছে মাটিতে। মাঝ উঠোনে একখানা মুড়ো ঝাঁটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। উনুন নিকানো পরিষ্কার।

মালতী গলা তুলে ডাকল— অগ কিডা আছ— নিঃসাড় বাড়িতে নিজের গলাও তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছে।

—ঘরে কেউ নাই— অ বৌদি

ভিটেটার পিছন ঘুরে অলস পায়ে এসে দাঁড়াল নতুন বৌ। যেন ধুলোট খেলে এসেছে। প্রথম দিনের সেই শাড়িটাই তার গায়ে। একেবারে ধুলোর বরণ। মাথা ভরা ধুলো, জট পাকানো কালো চুলেও চাপ চাপ ধুলো। নেতিয়ে পড়া লতার সব চেকনাই মরে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে মালতী তাকে কাছে টেনে নিল— অ, মা কুথা ছিলি—

ই ধারকে এস্যো— ছায়া আছে— নিস্তেজ গলায় ডাকল বউটি।

—তোর নাম কি রে— ঘর কুথা— যেতে যেতে বলল মালতী।

—মোরে মায়া বলি ডাকবা— একটু থেমে মালতী চোখের ওপর স্পষ্ট করে তাকিয়ে বলল— মোদের ঘর চিনবা—

—শুনি—

বলবে কি মায়া, কেঁদেই আকুল। তার মা, তার বাবা, তাদের গাঁ, সেখানে মালতীর মত কে সয়েলা মাসী— সবার কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু বলে শেষ করতে পারে না—বুক ভরা কান্না সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মালতীর শক্ত মনটার

কোথায় যেন এই কান্নার সুর ছলছলিয়ে বাজে। তার বিয়ে, তার শ্বশুর ঘর— এমনি —ঠিক এমনি— কান্না-কান্না—। সজনে ডালের ন্যাড়া ছায়ার কাটাকাটি খেলা দু'জনের মুখের উপর। চোখের পাতা ভারী। নিজেকে সামলে নিতেই মালতী অন্য কথা পাড়ল—

—আর সব কুথা—

—গেছে কে কমনে— কান্না জবজবে গলায় বলল মায়া—

—তোদের রাঁধন হয় নাই—

—হবি—মুখ নামিয়ে বলে মায়া—সব ঘরে এসবে—

—ধলো শুনি কাজকাম কিচ্ছু করে না— তোরা খাস কি—

—কি করে, কি খায়—এত বিত্তান্ত কিসির জন্যি, চিলের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল তারা—ওঠ, উঠি যা—কথা কানে গিয়েছে—কিনা—ঝাঁঝালো গলায় শাসায় সে মায়াকে। নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে উঠে দাঁড়ায় মায়া। উঠে দাঁড়ায় মালতীও। তারা মায়াকে ধাক্কা দিয়ে উঠোনের দিকে সরিয়ে দেয়। তারপর মালতীর পথ আটকে দাঁড়ায়।

—ফুসলানী দিতি এয়ছে— নষ্টামী করার আর জায়গা পাওনা।

মালতী শুকনো হেসে বলে—তুমার ঠেঞেই আইসছিলাম।

—তা আর এসবেনি—মদ্দগুলোন যে এখনি খেতে এসবে—মালতীর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে—তুমি বসে ফুসফাস করবা—শরীর দুলিয়ে খারাপ ভঙ্গি করে তারা—

—উসব তামাশা রাখ— পঞ্চায়েতে কি লুটিশ পড়িছে শুনিছনি—কাজ হবি, আর সিখানে মেয়ে লোকেও কাজ পাবে পুরো সরকারি রোজ এট্টা লিষ্টি হচ্ছে—

কচি বউডারে শিয়ালের পালে ঢুকাবার মতলব করতিছ না— গর্জে ওঠে তারা—ধলো আজ আসুক ঘরে—

-ধলোর বউ কেন, তুমিও তো যেতি পার—

—থাক ঢের উপগার করিছ—আর কাজ নেই—বানের জলে ঘর ভাঙল গাঁয়ে কার না ঘর নতুন হলো—আমার হলো! দু'খানা বাঁশের জন্যি পায়ে পড়িছি আমরা—

—ই তুমার রাগের কথা বৌদি—তুমারে কয়বার বলব—সনাদা পঞ্চায়েতে টাকা নিয়ে ঘর সারায় নাই—

—আমাদের গাঁয়ে সবাই ঘর সারাই করি নিছে— রিণরিণে গলা তুলে শুনিয়ে দেয় মায়া। ভিটে ঘুরে সে এখন মালতীর পিছনে।

তারা ছিপটি হাতে ছুটে যায়—ছাল তুলে নেব—আবাগীর বিটি—দূরহ, যা দূর হ—তারাকে আটকায় মালতী শান্ত করতে বলে— রাখ, অই পুচকে মেয়া অর আবার কথা—তুমরা না যাও ধলোকে যেতি বল—খয়রাতির কাজ হবে অনেক—

—ধলো কইলকাতা যাবে—তাচ্ছিল্যের সাথে বলে তারা—ইখেনে কি মাটি কাটবে—কইলকাতায় মাটির তলায় রেলগাড়ি চইলবে—

—সে মুজুরী এখেনেও যা—কইলকাতায়ও তাই—মাঝের মধ্যি ঠিকাদারে ভাগ নেবে—

অ তুমরা বড় ভাল— এখন যাও দিকিনি—খেটেপিটে ঘরে আসিছি— আমার মাথার ঠিক নেই—কইরে তো খেতি হয় না—পঞ্চায়েতের পয়সা গিলছ—আর বাবু হয়ি ছড়ি ঘুরাচ্ছ—যাও—যাও— কঠিন গলায় বলতে বলতে তারা ঘরে উঠে গেল—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘুরে সে মালতীর পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল—

—ধলোর বউরি ফের ফুসলাতি আসবা—ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তারার মুখ—পুইতে ফেলব—

মায়ার কথা ভাবতে ভাবতেই হাঁটছিল মালতী। আহা কচি মেয়েটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে — খেতে দিচ্ছে না বোধহয় পেট পুরে। কাদের মেয়ে, দেখে তো মনে হয় বাপমায়ের যত্নে আদরে ছিল। ধলো শোনা যায় নেশাভাঙ করে, হাটে মাঠে পড়ে থাকে—কি করে না করে তারও কোন হদিস নেই।

সহসা সন্তোষকে সামনাসামনি দেখে মালতী তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ে। সন্তোষ হাত বাড়িয়েও আটকাতে পারল না। আবার সাহস করে পিছনে পিছনে মাঠেও নামতে পারল না। কেউ যদি দেখে। মাঠ থেকে মালতী হাত নেড়ে বলে— ঘরে যাও, বউ খেঁপিছে—

মালতীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে সন্তোষ। এবড়ো খেবড়ো মেঠো পথে স্বচ্ছন্দে হাঁটছে মালতী শরীরের প্রতিটি রেখায় ঢেউ তোলে। সন্তোষের প্রাণ কণ্ঠায় এসে আটকেছে শক্ত কাঁটার মত। শ্বাস নিতেও কষ্ট।

ইস্কুল বাড়িতে কাজ করে ফিরছে সন্তোষ। এ গাঁয়ে সবাই মিলে মাগনা খেটে এই চালটা তুলেছিল। বলেছিল, গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল হবে— আমাদের হবে না? মাগনা খাটতে সন্তোষ যায়নি। এবারে ইস্কুল টাকা পেয়েছে—বড় আটচালা হবে— বেড়াও হবে—তারপরে রোজ দেবে সরকারি রেটে। সন্তোষের হাত আছে ঘরামী কাজে। কাজটা নিয়েছিল।

সেই ইস্কুলে গিয়ে বদনে ছেলেমেয়েদের পড়তে দেখে তার মাথা গরম। সোমবছর শুয়ে কোঁকায় বদন। বউটা পাঁচ বাড়ি খেটে মরে। কদিন আগেও ন্যাড়া ন্যাংটো ছেলেপুলেগুলো লোকের দোরে ধরনা দিয়ে বেড়াত। আজ জামা গায়ে বই মেলে পড়ছে। বদন মউলে নারকেল গাছ ঝাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গেল। তার চিল চিৎকারে দিনেরাতে পাড়ার মানুষ অস্থির। সন্তোষের ভাবনাগুলো থই পাচ্ছে না—বদনার কোমর কি তবে জোড়া লেগে গেল? ডাক্তার, বদ্যি করতে পারেনি—সকলে বলেছিল আর সারবে না। যাক্—মালতীকে শুধোলেই হবে—

মালতীকে মনে পড়তে সন্তোষের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ইস্কুল ঘরের চালের বাতায় বসে গোটা গাঁ দেখা যায়। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে মালতী চরকি দিচ্ছে। চালের বাতায় গিঁট পরাবে কি তার চোখ মালতীকে ঘিরেই ঘুরপাক খেয়েছে। মেয়েটা ঘুরতে পারে বটে।

মাথার উপর পাক দিয়ে চিল ডেকে যাচ্ছে। আকাশে চোখ তুলে তাকাল সন্তোষ। চিলটাও খাবার খুঁজছে--বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তার খাবার কোথায়—একটা

ফড়িংও আর নেই। কে জানে কতদূর থেকে আসছে চিলটা। জলের খোঁজে গাঁয়ের মেয়েছেলেরা যেমন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে এটারও সেই দশা। সারা দিনটা রোদের টানে শরীর হেদিয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনখানে কি চোখ রাখা যাচ্ছে! রোদ আর রোদের চেটেপুটে খা খা করা মাটি। মানুষে আর পশুতে মিলে চামড়া খসিয়ে নিয়েছে। মাটির হাঁ করা গতরে কেন্নোর মত কিলবিল করছে ফাটল। কাছে পিঠের লম্বা লম্বা গাছগুলো একপাল হাভাতের মত চিমসে হাত তুলে কেবলই যেন দাও দাও করছে।

—কি আর দেবে! আকাশ তো শূন্যি। সেখানেও নীল রং পুড়ে ছাই হয়ে রয়েছে— লাল সূয্যি এখন কট কটে সাদা—।

এ পাড়ার বাড়িঘরে আব্রু নেই। এক আধটু জংলা গাছের ঘেরা খরায় খসিয়ে নিয়েছে। সবদিক ন্যাড়া— অন্দর পর্যন্ত চোখ যায়, যেখানেই দাঁড়াও কার বাড়িতে কি হচ্ছে নজরে পড়বেই।

সেই যে মালতী মাঠে নেমেছিল এখনও দেখা যাচ্ছে তাকে। মাঠ ছেড়ে পথে উঠে এসেছে। ডুরে শাড়ির ঘের চলনের সাথে সাথে শরীর বেয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে উঠে যাচ্ছে। সেদিকে দেখতে দেখতে ঢোক গেলার মত করেই শ্বাস চাপল সন্তোষ।

নির্বুদ্ধি আর কাকে বলে—। অবিশ্যি দোষ যদি কারো থাকে তবে তা তার নিজের স্বভাবের। মালতীর তো আজ তার ঘরেই থাকার কথা। ছোট্ট মেয়ে মালতী মা মরা, অভাবী, উপোষী। রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াত। সন্তোষ ডেকে এনে তার সাথে ভাত ভাগ করে খেত। চুরি করে ফলপাকুড় পেড়ে তার আঁচলে ঢেলে দিয়ে আসত। মাও ভালবাসত মেয়েটাকে—ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল। মন করেছিল হয়ত মেয়েটা ডাগর হলে নিজের ঘরেই নিয়ে আসবে। কিন্তু সন্তোষ বিগড়ে গেল। পূবের জেলা থেকে ডাঁসা মেয়ে তারাকে এনে ফেলল।

এখন আর আঁটসাঁট যুবতী মেয়েটাকে দেখে বুক জ্বললে কি হবে! ঘরে পা দিতেই দাপিয়ে এল তারা— তুমার পীরিতের মাগীরে আজ ঝেড়ি কাপড় পইরে দিচ্ছি— সন্তোষের মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলে— লজ্জা ঘেন্না বলতি নেই'ক, আমি হলি থুতু ফেলতিও আসতাম না—

—কি কচ্ছ কি— সাবধানে ঘড়া গড়িয়ে গামছার কোনা ভিজিয়ে নেয় সন্তোষ! কড়া হাতে মাথা মুখ রগড়ে মুছতে থাকে। গলায় চরম বিরক্তি— নাহ্-ই তল্লাটে আর বিষ্টি হবিনি— আকাশ দেখ—এক ছিঁটে মেঘ আছে—

—অ কানে শুননি— তারা খোঁচা দিয়ে বলে— তাই যায়— লালস যে আঠার মত লেপটি ধরিছে—

—ভেজাল থামাও—কটু গলায় বলে সন্তোষ—মাথা তেতি আছে— জল জল করি হাঁপসে বেড়াচ্ছে নোকে—পুরনো টিউকল ভেঙি পড়ি আছে— এট্টামাত্তর কল আর অ্যাত্তবড় গাঁ— আর কি খরা— বাপের জম্মে কেউ দেখিনি—মরি যাবে মানুষ—ছারখার হবি— সুম্মুন্দিদের এখন মনে পড়িছে— একটা টিউকল লাগছে— খালি মাতবরি—

খেতে খেতে মনে পড়ল সন্তোষের—আর সেই ছেলেপেলেগুনো—কোথা—

—পাঁচখান পেট—ঘরে সেঁধিয়ে থেকলি চলবি— বন বাদা ঘুরলি কিছু তো জোটে—

—কাল থিকে অরা ইস্কুল যাবি—

তারা গালে হাত দিয়ে বলে— অঃ পেটে ভাত নেই—ইস্কুলে গে বই সেলেট খাবি ?—

—খাবি—

—হঃ সেই মাগী মন্তর দেছে না—

—বদার ছেলে ইস্কুলি যায়— আমার ছেলেও যাবি— কড়া গলায় বলে সন্তোষ—আর এট্রা কথা না—

ব্যস্ত সমস্ত সন্তোষ ইস্কুলে হাজির হয়ে গেল। শুনে গিয়েছে 'টিপিনে' খেতে দেবে। সে নিজের চোখে দেখতে চায় খাওয়া দেয় কেমন। ততক্ষণে অবিশ্যি খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েতে মিলে এঁটো কাটা উঠিয়ে নিচ্ছে। দিদিমণিরা হাঁড়ি কুড়ি গোছাতে ব্যস্ত। মালতী একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। ছেলেবেলার মত পিছন থেকে চমকে দেবার খুব ইচ্ছে হ'ল সন্তোষের—অথচ ভাবনাটা নিজের কাছেই বেখাপ্পা লাগল। রানীর মত দাঁড়িয়ে আছে মালতী—তার সাথে কি রঙ্গ চলে! তা বাদে সন্তোষ তো ওদের মজুর।

—সনাদা—নরম গলায় বলল মালতী—ঘরে রান্না হয় নাই— সকলের আগে ঘুইরে এলা—

নাঃ গরমে ঘরে টিঁকা দায়—তাই আর বসি নাই—

মালতীর চোখ হাসিতে চিক চিক করে উঠল—তা ছায়ায় ব'স। আমি যাই

—কুথা যাবা—তুমিও বস— মনে মনে ভাবল সন্তোষ—আর রোদে রোদে চরকি পাক দিতি হবেনি— কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলা হল না। জিজ্ঞাসা করতেও পারল না মালতীর খাওয়া হয়েছে কিনা—। আকুল ইচ্ছের বাদামখানা গুটিয়ে নিয়ে বসে রইল দাওয়ায়।

তারা না হ'ক কথা শোনাতে ছাড়ে না মালতীকে। আজকেও নিশ্চয়ই আকথা কুকথা অনেক বলেছে। অথচ মালতী এমন সুরে কথা বলল—যেন কিছুই হয়নি। দরদও কি নেই একটু। পাঁচ বাড়ি পাঁচরকম কথাই হয়— কে কেমন লোক সন্তোষের জানতে বাকি নেই। মালতীও জানে—গায়ে মাখে না। বেওয়ারিশ বিধবা , ভরা যৌবন, লোকে মন্দ চোখে দেখে—বিয়ে করত যদি এ ঝঞ্ঝাট থাকত না। কিন্তু করবে না। মালতীর প্রাণে কি শখ আহ্লাদ নেই—কোন চাওয়া নেই। সন্তোষের না হয় দজ্জাল বৌ। পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে অভাব কষ্ট। আরও কত লোক রয়েছে—ওদের দলে আছে, বাইরে আছে। পঞ্চায়েতের প্রধান—খাতির করেই বিয়ে করবে! —কি জানি—এ কাজে কি সুখ—

ছেলে-মেয়েগুলো ঘরময় ছোটা ছুটি করছিল। আচমকা একটা এতটুকুন খোকা

দাওয়া থেকে নিচে পড়ে গেল। চমক ভেঙে লাফিয়ে পড়ে তাকে তুলল সন্তোষ। কোলে বসিয়ে কান্না থামাল। আর সকলে তাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল।

—কার ছেলে তুই—সন্তোষ কোলের ছেলেটিকে আদর করে জিজ্ঞাসা করল।

—ও আমার ভাই—একটি ছেলে এগিয়ে এল।

ছেলেটির মুখখানা ভাল করে তাকিয়ে দেখল সন্তোষ। চেনা লাগছে কি? বদার বড় ছেলে কি?

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। দাদাকে পেয়েই বাচ্চাটি সন্তোষের কোল থেকে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। শিশুটির ছোঁয়ায় সন্তোষের বুকের গভীরে এক বিষ বেদনা গুমরে উঠতে লাগল। কতদিন সে তার সন্তানদের ছুঁয়ে দেখেনি? কোলে নেয়নি সেও কতকাল! আহা সেই হতভাগাগুলোকে এখন যে তার কোলে পিঠে বসিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। বুকটা খালি খালি লাগছে। এই এতগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কচিকাঁচাদের মধ্যে সেগুলো তো নেই। কালকেই সেই বুনো হনুমানগুলোকে ধুইয়ে পুঁছিয়ে বুকে করে এনে এখানে বসিয়ে দিয়ে যাবে সে। তারাও এদের মত আপন মনে হাসবে খেলবে, নাচানাচি করবে। ওরা যে তার বুকভরা ভালবাসার ধন। এমন করে একথা তো তার আগে কখনও মনে হয়নি। তার ছেলেরাই যদি এখানে না এল—তবে এ ইস্কুল সে করছে কেন?

কিছুক্ষণ আগে শাখে ফুঁ দিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক অশুভ লাল আভা। গোয়ালে বাঁধা পড়ে গরু-ছাগল ছটফট করছে। দু'চারটে যা পাখপাখালি এখনও গাঁয়ে রয়ে গেছে—তাদের কিচির মিচির অস্পষ্ট। আর শোনা যাচ্ছে না। গাছপালাগুলো পাহারাদারের মত খাঁড়া দাঁড়িয়ে। বাতাস নেই একটুও। গরমের দিনে সন্ধ্যার গায়েও তাপ থেকে যায়। মাটি জুড়োয় না, শরীর জুড়োয় না।

ইস্কুল বাড়ির উঠোনে চ্যাটাই পাতা। মাঝখানে গ্যাস বাতি। দু'চারজন করে গাঁয়ের মানুষ জড়ো হচ্ছে সেখানে। পঞ্চায়েতের মেম্বাররা বসে আছে ইস্কুলের দাওয়ায়। সন্তোষ পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল। তার উস্কো-খুস্কো চুল, চোখদুটো লাল টক টক করছে। পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় ভরা। উদ্‌ভ্রান্তের মত।

ফকির মন্ডল সন্তোষকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে বসাল। কাঁধের উপর হাত রেখে নিচু গলায় বলল— কি শুনতেছি সনা— তুমি নাকি ভিতরে ছিলে—

ঘাড় নীচু করে বসে আছে সন্তোষ। তার মুখে রা নেই।

—এখন তো সালিশ বইসবে তুমার যা বলার বলবা— চুপ কইরে থাকলে বিপদ কমবে না— পাশের থেকে বলে রসিক রাঢ়ি।

দু'খানা হাত কোলের উপর জড়ো করে একভাবে বসে আছে সন্তোষ। সে কিছুই ভাবতে পারছে না। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না।

উঠোন ভর্তি লোক উত্তেজিত।

—আহা মালতী গে না পড়লি বউটা প্রাণে বাঁচত না—

—বাঁচে কি না দেখ—এখনও সাড় আসিনি—

—মালতী সেই হাসপাতালেই বসে আছে—

—আহা কচি ফুল বউটা— কেমন চিকন চাকন চেহারা ছেল।

—পাষণ্ড—পাষণ্ড— উডারে ফাঁসিতে লটকানো দরকার—

—সব কডা পাষণ্ড—এট্টাও মানুষ না—

— কি মিনষে আর কেমন মাগ— খিস্তি ছাড়া এট্টা বুলি শুনিছে কেউ—

—সনাডা অত খারাপ ছেল না—মাগের হাতে পড়ে জানোয়ার বনিছে—

মায়া আহা—মেয়েডা খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। বয়স কালের মেয়ে খিদে সহ্য করতে পারে কখনও। সন্তোষ তাকিয়েও দেখেনি। এতটুকু মেয়ে না খেয়ে আছে দিব্যি তো পেট পুরে খেয়েছে ঘুমিয়েছে। কাজ করে ভাতের উপায় করতে গিয়েছিল। একাই চলে গিয়েছিল বাঁধে কাজ করতে। সন্ধ্যে বেলায় যত্ন করে ভাত রেঁধেছিল—বসেছিল ধলোর আশায়। দু'জনে খেতে বসবে।

এক মুঠো ভাতও মুখে ওঠেনি তার। ধলোকে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। এত বড় আস্পদ্দা—ঘরের বউ যাবে বেহদা মদ্দা মানুষের সাথে কাজ করতে—মায়া শুধু বলেছিল—কেন, দোষ কিসির—মোদের গাঁয়ে সব্বাই পঞ্চায়েতে কাজ করে—

সন্তোষের সাড় নেই।

হরে উটে কি ব্যাটা ছেলে—চোখের সামনে এমুন কাণ্ড—ঠেকাতে পর্যন্ত গেল না মাগের গোলাম থুঃ। সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল সন্তোষ—কে বলল ? বদন ? বদনই তো মোটা লাঠিগাছা ধরে এগিয়ে আসছে এদিকেই—

—বসেন, এখেনে বসেন—ফকির তাড়াতাড়ি তাকে ধরে এনে বসাল।

ক্ষুব্ধ বদন তখনও বলছে—মেয়েডার বাপ মা ভাল বুঝেই তোদের হাতে তুলে দিয়েছে—

—এখন থানা পুলিশ কি না হবি—কেউ শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—

—গাঁয়ের নামে লোকে থুথু দেবে—শয়তান গুলোন—

সন্তোষ বদার হাত ধরে বলতে চেয়েছিল—তুই হাঁটতে পারছিস। কিন্তু তার শরীরটা পাথর। গলায় সীসা ঢালা।

—মেয়েডা যদি তোর হত—তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে পটল কামারের ঠাকুমা বুড়ি— ঢ্যামনারে গাঁ থেকে দূর করে দে ফকরে—নাতবৌ এর সাথে সেও এসেছে। ঠাকুমা—সন্তোষ বিড় বিড় করে বলে—আমার মেয়েডা হলি—

ফুলো ফুলো লাল চোখে সকলের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল সন্তোষ। গাঁয়ের বউ ঝি, ঝিউড়ি। গিন্নি বান্নি কারো আসতে বাকি নেই। মালতী দাঁড়িয়ে আছে সকলের সামনে।

মেয়েটার চিৎকারে পাড়ার লোক ছুটে এলে তারা তাদের আটকেছিল—ই

কেমুন কথা, সোয়ামিতে শাসন করবেনি—জোয়ান মেয়েছেলে— হুমদো হুমদো মরদদের সঙ্গে পীরিত জমাতে যাবি— গালে হাত দিয়ে বলে, আবার চোপা-- খেতি দিতে পার না— শাসন কিসির— নিজি ফূর্তি মারি বেড়াবা আর আমি শুক্যে মরব, না ? অ অজ্ঞান হইছেন— অজ্ঞান না ছাই— নষ্ট মেয়েছেলেতে অমন অনেক রং ঢং জানে—

মেয়েটা না খেয়ে খেয়ে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছিল। গাঁয়ে ঘরে কি আর কেউ বউ মারে না— ধলোই মারল। এ গাঁয়ে কেউ বউ মারে না, না মারেনি কখনও। দুঃখের ঘরে রাগ দ্বেষ তো চণ্ডাল। কে জানে অনেক দিন হয়ে গেছে—এমন কথা কানে এসেছে বলে তো মনে পড়ছে না। ধলোর মত কুপথে যাওয়া ছেলেপিলে কি নেই আরও দু'একটা। অভাবের খিটিমিটি, এই দুর্দ্দিনই তো ভয়ানক হয়ে একে অপরকে ছোবল মারে! তবে কি অভাব তার আগুনে হাঁ খানা কতক বুজিয়ে এনেছে। এই যে বছর বছর খরা এ কি বাপের জন্মে কেউ দেখেছে— অথচ মানুষের সে হুতোশ কই! আগের মত সেই জল-জঙ্গল ভেঙে দল বেঁধে ঠিকেদারের পিছে পিছে ভিন জেলায় ভেসে বেড়ান সে রেওয়াজ কই! কিছুকালের মধ্যে সেও তো বেরিয়ে পড়েনি। চাষবাস নেই তবু হাতের কাজ মেলে তো! মাটি গড়া বাঁধ।

তাছাড়া একটা মেয়েছেলের জন্যে এই যে এত মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে—এমনটা কি কেউ কখনও দেখেছে? সবাই মিলে তাকেই তো নিঃশব্দে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে— ওই দ্যাখ, মেনিমুখা মিনসে অন্যের বিপদে দাঁড়াবার মুরোদ নেই—

সন্তোষ বসে রইল। তার মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। কেন যে চোখে তার জল এল— সে জানে না।

শেষ বুলেট

শিলিগুড়ি থেকে যে সড়কটা দার্জিলিঙ উঠে গেছে—শহরের মুখে পৌঁছে তারই পাশে সাদাসিধে মর্ডান লজ। দার্জিলিঙ এলে এখানেই উঠি। রাস্তার ওপরে খাড়া পাহাড়—তারই খাঁজে খাঁজে উঠেছে একসারি ঘর। বাইরে থেকে ইট কাঠের জগাখিচুড়ি— তাতেও একটা প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য আছে। সামনের চিলতে জমিতে কখনও বুঝি ফুলের কেয়ারি ছিল— ইটের টুকরো টাকরা এখানে সেখানে মুখ উঁচিয়ে রয়েছে। গেটের বাঁ দিকে ট্রি ফার্ন—দু'তিনটি ভাঙাচোরা পাতায় স্মৃতি হয়ে টিকে আছে এখনও। আর সব কিছু গাঢ় সবুজে জমাট বাঁধা মস, ফার্ন, ঘাস। লতা ঝোপ, বন গোলাপ। গেটটা নিচু, সাধারণ ফালি কাঠ পেরেক গেঁথে তৈরি।

এ হোটেলেরও অসাধারণত্ব আছে। গেট পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে দেবদারুর মত বিশাল দীর্ঘ গাছের যে কুঞ্জটি অনেক নিচের সবুজ উপত্যকা থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আকাশের নীল-ফ্রেমে বাঁধানো ছবির কাঞ্চনজঙ্ঘা—অপরূপ। মনে হবে ফটোগ্রাফার বুঝি শটটা নিয়েছে এখানে দাঁড়িয়েই। আকাশ স্বচ্ছ থাকলে দেখুক যে কেউ চোখ ভ'রে—যত খুশি। পাহাড় এখানে খানিকটা আগু বাড়ানোয় রাস্তা চওড়া, পাথরের পাঁচিল ঘেষে দাঁড়াতে বাধা নেই—বুক দুরদুর না করলে বসাও যায় তার ওপর। সূর্যের প্রথম আলো যখন পাহাড়ের ওপিঠে আটকে—কাঞ্চনজঙ্ঘায় তখন পলকে পলকে নতুন রঙের ছোপ ধরতেই থাকে।

অসুবিধা—সে তো থাকবেই। পাতলা কাঠের নড়বড়ে তক্তপোষ, বিছানায় তুলোর বেশি ছোবড়া। আর কম্বল মনে হবে শত সহস্র মানুষ খেকো পিঁপড়ে ঘিরে ফেলেছে। তারপর সব সময় সব কিছু ভিজে সপ্‌সপে। চায়ে জিভের আড় ভাঙে না। স্নানের জলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। খানা—বাবুর্চি তো নেই—কুক দেশী। আসলে সবেতেই ইকনমি—আমরা তো ইকনমি ক্লাস।

সকলেই জানে আমার দার্জিলিঙ দৌড়ানো পেটের ধান্ধায়। ঘোরাঘুরি চকবাজারে। সস্তায় উলের খোঁজে যে কোন সূত্রের আগাপাস্তালা চষে বেড়াই—নেপাল বর্ডার কি দুর্গম গ্রাম। আমার পরিচয় দোকান বাজার হোটেল ঘরে।

ইদানীং বছর দুই তিন একটু কেমন কেমন লাগছে। চেনা জানা লোকের একটু অনিচ্ছুক বিব্রতভাব, দু'কথা বলি না বলি করে কাটিয়ে চলে যায়। যারা চুটিয়ে আড্ডা দিত— কোথায় গুটিয়ে পড়েছে কে জানে! সস্তায় লাটের মালের খবর যারা দিত আর দিচ্ছে না। চেপে ধরেছি এমন কাউকে —বলেছে ভিতরে আর যাওয়া টাওয়া হয় না। চকবাজারে অঢেল মাল—মালের আকাল—

পেটের দায় বলে কথা। এবারে এসে ইস্তক জনে জনে টোকা মেরে বেড়াচ্ছি—নিজে নিজেই ঘোরাঘুরি করছি—। সেদিন একটু বেশি রাতে হোটেল ক্যান্টিনে আমাকে ডেকে বসাল গণেশপ্রসাদ। বসে আছি—বসেই আছি। ওরা রসুই ঘরের ভিতরে—। কি করছে বোঝা যাচ্ছে না। গোছগাছ করছে ভাবতে পারতাম—কিন্তু নিঃশব্দে সেটা সম্ভব নয়। আর খাওয়া-দাওয়া সে তো তারা এখানেই সারে। অস্বস্তি নিয়ে ইতঃস্তত তাকাচ্ছি চোখ আটকে গেল দেওয়ালে। গণেশের গীটার আবহমানকাল থেকেই ওখানে আছে। ওটাকে টেনে নিয়ে কতদিন রাতের উৎসবে মেতে উঠেছি আমরা। রাত ছাড়া আর উৎসবের সময় কোথায়—। আজ গীটারের জায়গায় কয়েকখানা কুকরী গোছা বেঁধে ঝোলানো। সহসা মনে হ'তে পারে গৃহসজ্জা—দু'খানা নাগা বর্শা উলের সাজ পরানো দু'দিকে কোনাকুনি গুনিতক চিহ্নের মত আটকানো গীটারের স্পষ্ট ছাপটা দেখে বোঝা যায়—ব্যবস্থা সাম্প্রতিক। এর মধ্যে কেন যে আমার চোখে পড়েনি কে জানে। আমি হাঁ করে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি—নিষ্প্রাণ ক্যান্টিনের স্তব্ধতা আমার মনের উপর ক্রমেই চেপে বসছে—একেবারে পিঠের ওপর গণেশের চাপা গলা আমাকে চমকে দিল—কোথায় কোথায় ঘুরলেন আজ—

আমি চেয়ারটা পুরো ঘুরিয়ে তার দিকে ফিরলাম—আরে দোস্ত কি হ'ল বলত—দু'একটা টিপস দাও—মারা পড়ব যে—

গণেশ আবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াল—ওসব ফিকির ছাড়—যা পাও নিয়ে কেটে পড়—

আমাকে হতভম্ব করে সে সজোরে আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল— কাট, কাট—হাতেও স্পষ্ট ইশারা—কথা বলার আর সুযোগও পেলাম না—মনে হল কয়েকটা পদশব্দ রান্নাঘরে শোনা গেল। আমি যন্ত্রের মত উঠে পড়লাম। ঘরে ফিরে কেমন অস্থির অস্থির লাগতে লাগল।

এ হোটেলের ক্যান্টিনটা চালায় গণেশপ্রসাদ। ওরই সঙ্গী হয়ে আমি এই ক্যান্টিন ঘরে কত হল্লা গুল্লা, নাচাগানায় অংশ নিয়েছি। কত রাত পর্যন্ত তাস, দাবা—অল্প স্বল্প নির্দোষ জুয়োও খেলেছি। গণেশের কাছে তাই এরকম ব্যবহার আমি আশাই করিনি।

খাটের উপর আলগোছে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার ঘরটা আজ একদম ফাঁকা। এতদিন ধরে অন্য সিটগুলোয় কিছু কিছু লোক এসেছে গেছে—আজ কেউ নেই—চোখ ফেরাতে গিয়ে কিন্তু মনে হল কোণের দিকের একটি মাত্র সিটে কে যেন শুয়ে আছে। চেহারা মনে করতে পারলাম না। হতে পারে আনকোরা

কেউ। বিকেলের দিকে এসে থাকবে।

উঠলাম, জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কাচের ভিতর দিয়ে ঘোলাটে সাদা কুয়াশা ঢাকা বাইরেটা। যেন বরফের ওপরের ছায়া— ঘামজমা কাচে এর বেশী আর কি দেখা যাবে। বারে বারে হাত ঘষে ঘষে সেই ফাঁকটুকুতে তাকিয়ে দেখছি আর একটু একটু করে কষ্টটা থিতিয়ে নিচ্ছি। একবার যেন ক্যান্টিনের দিক থেকে একটা ভারী শোরগোল উঠল— থেমেও গেল আবার। বহুদূরে হাউইয়ের মত একটা আলো কুয়াশা ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গাড়ির হেড লাইট, পুলিস ভ্যানের সার্চ লাইট !— হবে। হতে পারে কোন ছুটন্ত রকেট—নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত।

মনটা খচ্ খচ্ করছে। অবোধ তো নই। দীর্ঘ আসা যাওয়া পরিচয়ের সূত্রে হাওয়া পরিবর্তনের আঁচ কি আর করতে পারিনি। আবার এসে খাটে বসলাম। পায়ের দিক থেকে এতক্ষণে ঠাণ্ডা চেপে ধরেছে। কম্বলে পা ঢাকা দিলাম।

কলাবতীর কথাই মনে পড়ল তখন। শান্ত সুন্দর কলাবতী। নামের মতই মধুর। আমার একান্ত আপন কলাবতী। অন্ধকারের অনিবার্য গহ্বর থেকে সেই আমাকে তুলে এনেছিল। যে উলের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আজ — সেই উল তার আমার অচ্ছেদ্য বন্ধন।

দার্জিলিঙ প্রথম এসেছিলাম দলে জুটে — । পাড়ার অনেক অনুরোধ ছিল — উলের পোশাক, নানা মাপের। তাদের মনে হয়েছিল নিতান্তই প্রমোদ ভ্রমণ এ দোকান সে দোকান ঘুরছি। মেয়েটি লক্ষ্য করে থাকবে। ডাকল ওর দোকানে। ঘিঞ্জি আঁধার মত ছোট্ট ঘর আমাকে খুশি করেনি। ঢোকার পর বুঝলাম বাইরে যেমনই হোক এখানে ভাল ব্যবসা। মেয়েটি হেসে মালিকের জন্য বসতে বলে ভিতরে চলে গেল। তেমন কোন চটক ছিল না তার — তবু তাকে আমার ভাল লাগল। সামান্য ঢিলে-ঢালা মোটা স্কার্ট, ওপরে হালকা ফ্লানেলের রঙ ওঠা জামা। পাতলা শরীর। এ পোশাক আলাদা কোন সৌন্দর্যে রমণীয় করেনি তাকে। শুধু ধবধবে গোলগোল মুখখানিতে এমন সরলতা —হাসলে সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখ গোলাপী হয়ে ওঠে। নাকের দু'টি কোণ সামান্য উঁচু, আধ বোজা চোখের পাতার ফাঁকে কালো তারা দু'টি রাতের জোনাকীর মত চিক চিক করে সে যে কী অপূর্ব শ্রী। যেন কোন দেবশিশু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অবাক হাসি হাসছে। এ হাসি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। সেদিন সেখানে বসেই আমি নতুন পথে মোড় নিলাম। সেবারে উলের দোকানে একটা সংবাদ ছিল — সোনাদা হয়ে বর্ডারের দিকে কোন একটি পাহাড়ীগঞ্জে পৌছানোর। আমার সঙ্গে যাচ্ছে কলাবতী। এর আগেও সে গিয়েছে — এখানে সেখানে বড় বড় লটে উল কিনিয়ে দিতে। মাথা ভরা চুল কলাবতীর — লম্বা বিনুনীতে বাঁধা। একটি রঙচঙ-এ স্কার্ট পরেছে — মাথায় ফুল কাটা রুমাল। মনে হচ্ছে — সে যেন চায়ের বাগানে পাতা তুলতে চলেছে।

ট্রেকারে যাচ্ছি আমরা। উঠছি ঘুমের রাস্তায় — পাহাড়ী পথ দেখা কখনও শেষ হয় না — বার বার দেখা তবুও চোখ টানবে। সঙ্গের যাত্রীদের শুরু করা কলরব

হাসাহাসি থেমে এসেছে। পথ নির্জন — একদিকে পাহাড়ের খাড়াই — অন্যদিকে খাদ। দূরে অদূরে পাহাড়ের গায়ে গিরিখাতে কত রকমের বাঁশ, বাবলা, কত যে অচেনা গাছের লতা পাতা, ফার্ন, অর্কিড, রঙিন ফুলের ছড়াছড়ি। এই ঝিরঝির জল ঝরছে, পাথরের আলগা চাঁইয়ের তলা চুইয়ে — কোথাও জলধারা ভারী। শব্দ উঠছে ঝরঝর কলকল —পাথর থেকে পাথর বেয়ে বেয়ে খাদের অতলে নেমে যাচ্ছে। এত সবুজ, এত ঘন বন —। পথের মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে মাথা বাড়ানো পাথরগুলো যেন ডাকতে থাকে -- মাথার উপরে একলা দুলতে থাকা সাহসী নীল ফুলটি হাসতে হাসতে হাত বাড়ায়—

শুধুই ট্রেকারের গর্জন। এই সবুজ মখমলে রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে — এই মেঘের তলায় মুখ ভার। ঝরঝর করে বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। এমনি যাতায়াতের পথে কত গল্প করেছি কলাবতীর সাথে -- কিন্তু কেন যেন ও একটু চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল। দেখা হলে হাসে, কাছেও আসে --। আগে চায়ের দোকানে বসেছি, বলতে বাধা নেই সিনেমা হলে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমুও খেয়েছি। শরীর একটু কাঠ কাঠ — শ্রমিক মেয়ে তুলতুলে হবে নাকি। তাই শুধু ব্যবসা নয় — ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক অন্তরঙ্গতার। কলাবতী আমাকে নিয়ে ওর মা বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমিও ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ওরও কম কৌতূহল নয়। মাটির নিচে রেল গাড়ি — শুধু এই দেখার জন্য কলকাতায় যাওয়া যায় — আমার সামনেই অন্যদের বলেছে একথা — তবু নিজে যেতে চায়নি। কতজনই তো উলের পোশাক বেচতে যায় কলকাতায় — কলাবতী যায় না —।

কলাবতী যে চা গাছের লালফুল। কোথায় যাবে সে এই পাহাড় ছেড়ে, সেকি আর কোন মাটি জলে বাঁচবে! চা গাছ যে তার জীবন, তার স্বপ্ন। চায়ের গন্ধে তার সকাল হয়, সন্ধ্যে কাটে। মায়ের পিঠে বাঁধা হয়ে বাবার হাত ধরে ঘুরেছে সে চা গাছের পাশে পাশে। গাছে গাছে ও যে নিজেকে ভাগ করে দিয়েছে। ও জানে কবে কোন গাছে কোন দুটি পাতা চোখ মেলবে, কোন গাছে কেমন গন্ধ, কার পাতায় কি রঙ। কার কত বয়স। যেদিন জেনেছিল এই আপন গাছগুলো ছেড়ে তাকে অন্য পথ খুঁজতে হবে, অন্যখানে — সেদিন সে বড় কেঁদেছিল — বাগানে নতুন মেয়ে নেওয়া বন্ধ। একথা বলতে বলতে তার চোখ সজল হয়ে যায় — সে যেন নিজেই মূল ওপড়ানো এক চা গাছ।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও এক একবার মনে হয়েছে ওর মধ্যে একটা গভীরতা আছে — যেখানে আমিও পৌঁছতে পারি না।

গাড়ি চলেছে। কলাবতীর হাত আমার উরুতে। দু'জনে গায়ে গায়ে চেপে বসে আছি। ভীষণ ভীড়। গাড়িটা একটা বাঁকের মুখে থেমে গেল। সামনে একটি ছেলে, কাঁধে থলি — সেই হাত দেখিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনদিকে ঘিরে দাঁড়াল দশ বারোজন কুকরীধারী। আমাদের ট্রেকারে দার্জিলিঙবাসী অনেক ধরনের লোক ছিলেন। সবাই

নেপালী নন — আমিই কেবল বাইরের। কলাবতীর আঙ্গলুগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসল আমার হাতে মাংসে। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম — মনে হল ওর মনে শঙ্কা জেগেছে — বোধ হয় আমাকে নিয়েই। তারা যাত্রীদের এক একজন করে নামিয়ে নিয়ে তল্লাশি করেছে আর জানতে চাইছে — কোতা বসুন হুনছ (থাকা হয় কোথায়)।

— যাচ্ছ কোথায়। — কোন পকেট কো হো—(কোন পার্টি কর)। আমরাও নেমে এলাম— দু'জনে একসঙ্গে। কলাবতী আমার বাহুতে লেপ্টে। — বাঙালীকে প্রেম করছ? হঠাৎ ওকে হিঁচড়ে টেনে নিল একজন। আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম — মুহূর্তের লজ্জায় সে সুযোগ পেলাম না —। আমার অল্প বিদ্যের নেপালীতে বললাম— আমাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা—। তারা আমাকে লক্ষ্যই করল না— তোর চা কুলি বাপ— লাল পকেটে ঢুকেছে, বাগিচায় আমাদের লোকদের আটকাচ্ছে —তোকে আমরা আটকে রাখব—আমাদের সাথে শত্রুতা করলে কি হয়— ওদের সে শিক্ষাটা দিয়ে দেব—

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র খোলা ছড়ানো, যাত্রীরা হতভম্ব। এমন একটা কচি মেয়ে— এদের হাতে পড়বে—

আমিই বললাম, আমাকে তো তা'হলে ফিরে যেতে হয়। মেয়েটিকে মালিক পাঠিয়েছে—

একজন বৃদ্ধা নেপালী মহিলাও বললেন, ওর বাপের জন্যে ওকে তোমরা ধরবে কেন--- ওর মালিক বলতে পারবে— ও এসবে আছে কি নেই—

মালিকের নামের জাদুতে হোক— কি অনেকে মিলে বলাতেই হোক-- কলাবতীর মাথাটা দু'হাতে পাথরে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলে রেখে চলে গেল তারা। বলে গেল, চিহ্ন করে দিলাম— সাবধান না হ'লে—লাশ রেখে যাব—

কলাবতীর ক্ষতস্থান বাঁধা ভীষণ জরুরী। অথচ রুমাল ছাড়া কিছু নেই কাছে। যাত্রীদের মধ্যে একজন কি একটা গাছ খুঁজে এনে থেঁতো করে নিজেদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন। ট্রেকার রওনা হ'ল।

কাছাকাছিতে একটি ছোট্ট চা বাগান। কলাবতীর জন্যে সেখানেই এলাম। ওর কপালে সেলাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে নেওয়া হ'ল। সেখানে কেউ কেউ ওর বাবাকে চেনে — তাঁরা সব শুনে ওকে ছাড়ছিলেন না।

কিন্তু কি করি— মালটা যে আমাদের ধরতেই হবে। আমি জানি কমিশনের একটা ভাল অংশ কলাবতীও পাবে।

কলাবতীর মাথাটা কোলের উপর শুইয়ে নিলাম। ইনজেকশনের জন্যেই হয়ত ঘুম ঘুম ভাব ছিল চোখে। কিন্তু এক একবার স্পষ্টই সমস্ত শরীর ঝাঁকিযে চমকে উঠছিল সে। স্বপ্নে আবার ফিরে আসছিল কিনা — সব কিছু, কে জানে।

ফেরার পথে কলাবতীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে এলাম। সামান্য জ্বর উঠেছে তখন তার। অবাক হয়ে গেলাম — ওর বাবা মা এগিয়ে এলেন, নিঃশব্দে বুকের ওপর

তুলে নিলেন—। আমি পিছনে পিছনে এলাম — পকেট থেকে ওর কমিশনের টাকাটা তাঁদের হাতে দিয়ে বললাম— এসে দেখে যাব— কেমন থাকে— আমার প্যান্টের দু'টো পায়ে রক্ত জমাট বেঁধে ছিল।

এবার এসে খবর পেয়েছিলাম —কলাবতীদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর মা বাবা উঠে গেছেন ক্যাম্পে। কলাবতী অনেক দিন হ'ল দোকান ছেড়ে দিয়েছে। সে জায়গায় অন্য যে মেয়েটি কাজ করছে— তাকে দেখেই আমার হাড় পিত্তি জ্বলে গেল। মুখে কুলুপ এঁটে আছে। চোখে মুখে চোরা চাহনী — সন্দিগ্ধ। ইচ্ছে করেই যেন একটা নিস্পৃহ ভাব দেখানোর চেষ্টা।

এতদিনের চেনা মালিক ভদ্রলোকও এমন ভাব দেখাল যেন ব্যবসার মত ঝকমারি কাজে তাঁর আর মন নেই। কাস্টমারের সাথে সম্পর্ক এমনই হেলাফেলার। আগে কত বসিয়ে চা সরবত খাইয়েছে .... ভাল লাভের কাজ করলে ডিনারেও নেমন্তন্ন করেছে।

আর গণেশ প্রধান — যার সাথে আমার জিগরী দোস্তি সেই প্রথম থেকেই— সে আমাকে আজ একরকম খেদিয়েই বার করে দিল। এ কষ্ট আমায় এখনও বিঁধছে।

ভীষণভাবে চমকে উঠলাম ঝম্ ঝম্ বাজনার শব্দে — একেবারে হোটেলের সামনের রাস্তায়। আলোয় ঝলসে উঠল সব ক'টি কাচের জানালায়। তারপর কান ফাটা শব্দে — খড় খড় করে কাঁপতে থাকল কাচের জানালা, কাঠের বাড়ি, কেঁপে উঠল খাট বিছানা, জামা কাপড়।

উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গুনে গুনে শক্তিশালী চকোলেট বোমা ছোঁড়া হ'ল রাস্তার ওপর। ফের ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠল বাজনা। শেষের শয্যাটিতে যে শুয়েছিল — লাফিয়ে উঠে বসল — এসে গেছে — এসে গেছে—

দূরে পাহাড় চূড়ায় তখন দাউ দাউ আগুন। রকেটটা তাহলে ওই দিকেই ছুটে গিয়েছে। আকাশে লাল আভা — হয়ত কাছে দূরে আরও আগুন জ্বলছে। জানি না কাঞ্চনজঙ্ঘাও লাল হয়ে উঠেছে কিনা।

সামনে রাস্তা দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে, কুকরী উঁচিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল একদল তরুণ-তরুণী। রাস্তার পাশে জড়ো হয়েছে কিছু লোক। মাঝে মাঝে স্লোগান উঠছে—

হোটেলের গেটের পাশে বিশাল বিশাল দু'টি তামার 'গাগরী'। সিঙ্কের 'ঘাদা' হাতে দাঁড়িয়ে কিছু নেপালী ছেলে। মালিকের হাতে পতাকা। আগে থেকেই সার্চ লাইটের ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়ই। আলো জ্বলে উঠল .... দেখলাম — ব্যারিকেড করে এক দঙ্গল যুদ্ধের পোশাক পরা ছেলে— কাঁধে ঝকঝকে আগ্নেয়াস্ত্র সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই সমস্ত অন্ধকারে ডুবে গেল। নিমেষে মিলিয়ে গেল সব ভোজবাজির

মতই। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই বোর্ডারটি তেমনি শুয়ে -- কি জানি সবটাই স্বপ্নে দেখলাম কিনা —

কলাবতীকে দেখতে যাব। মন বড় উদগ্রীব। হয়ত এ হোটেলেও আর থাকা যাবে না। আমার ব্যবসা অনিশ্চিত। এ কাজে কয়েকটা ছেলেকে জুটিয়েছিলাম. আমার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাগ্যেও নেমে আসবে অন্ধকার।

ক'দিন আগে উলের দোকানের মালিক চুরুট টানতে টানতে বলেছিল — আর ঘুমে কি হোবে — এখুন বিলকুল লুকসান — দুসরা সময় আসবেন —

ফিরে যাব কলকাতায় তার আগে কলাবতীর কাছে একবার যেতে হবে। তাকে আমার বলে যেতেই হবে -- দুসরা সময়ের জন্যে অপেক্ষা করো। আমি আসব —

ভোরবেলা রওনা হয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে মিনি, জোঙ্গা, ট্রেকার চেপে কত হেঁটে উপরে নিচে নেমে বিজনবাড়ি গঞ্জে এসে পৌছলাম। এখানে একটু এদিক ওদিক করতে জানা গেল — এদিককার লোকেরা এখন অনেক উপরে কাইজলি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। পুরো রাস্তা গাড়িও যাবে না। তা ছাড়া ওপথে যেতে ভয়ও আছে। পায়ে হাঁটা রাস্তাই সবচেয়ে সাংঘাতিক। চারিদিকে চা বাগান। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লোকরা কয়েক ঘর করে একসঙ্গে বাস করে। কাঠেরই ঘর। উপরে উঠবে যত বেশি বসতিও তত কমবে। আর কে কোথায় কি মতলবে আছে কে জানে।

সকালে বেরিয়েছি বেলায় বেলায় পৌছে যাব ভেবেই। চায়ের দোকানে বসে যাওয়ার কি ব্যবস্থা হয় তাই ভাবছি। খাঁকি পোশাকের পুলিস কিনা কে জানে — এসে বসল ক'জন। তাদের কথার টুকরো ধরে বুঝলাম খাবারের একটা ট্রাক যাবে কাইজল হয়ে —। এটুকুতেই বুকে ভরসা এল। ওদের সাথেই ব্যবস্থা করলাম একটা —

কাইজলির পথে চড়াই উৎরাই ভেঙে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে এগিয়ে চলেছি — মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য। যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে চা গাছ ছাড়া কিছুই নেই। রোদের তাপে চায়ের পাতা থেকে একটা গন্ধ এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে — বিষণ্ণ কলাবতী যেন আমাকে ধরে হাঁটছে - আমারই পাশাপাশি।

অচেনা পাহাড়ী পথে দিক ঠিক রাখা মুশকিল। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে নেমে — একই চা গাছের বিস্তার দেখতে দেখতে চলা, ভয় হচ্ছিল—।

প্রথমে মনে হয়েছিল আমিই বুঝি দেখলাম — পরে বুঝলাম আমাকেই নজরে রেখে একজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এলেন। —স্পষ্টত তিনি একজন চা শ্রমিক। পরণে আধ ময়লা অ্যাপ্রণ। বুকের ভিতরে হাতুড়ি পড়ছে।

আগেই বলে বসলাম — ঠিক পথে যাচ্ছি তো?

ভদ্রলোক আঙুল উঁচিয়ে ইশারা করতে দু'টি ছেলে চা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল —কোথায় যাব বুঝিয়ে দিলেন।

এগিয়ে চললাম আমরা।

দূরের কয়েকটি কাঠের বাড়ি দেখিয়ে ঝোরার এপারে আমায় রেখে চলে গেল ওরা। সাবধান করে গেল — ঘন্টা খানেকের মধ্যে না ফিরলে বিজনবাড়ি গঞ্জে আর ফেরা মুশকিল। পাহাড়ে ঝপ ঝপ করে রাত নেমে আসে।

ঝোরাটি পায়ে হেঁটে পেরিয়ে এলাম। গ্রামে ঢুকে বিরাট আটচালা কাঠের বাড়ি। সেখানেই ক্যাম্প। বাড়ির কর্তা পালিয়েছেন। এত উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ করে ক্যাম্প বানানো সম্ভব ছিল না — এই বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছে সবাই। কলাবতীর কাছে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম — তখন খিদেয়, ক্লান্তিতে দুর্ভাবনায় হাঁটু ভেঙে আসছে। বাঁশের বাখারী বেঁধে তৈরি একটা চালিতে পিঠ উঁচু করে শুয়ে আছে কলাবতী। বড্ড শুকনো, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ। বাসি হলুদ গোলাপটি যেন। আমাকে দেখে সেই প্রাণমাতানো হাসি হয়ত ফুটে উঠেছিল তার মুখে। আমার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল।

— কি করে এমন হ'ল — হাঁটু ভেঙে সামনে বসে পড়লাম আমি— গলা বুঁজে এল। চা গাছটি আমি উপরে নিতে চাইনি — এমন মুচড়ে ভাঙ্গল।

জিভের ডগায় ঠোঁট ভিজিয়ে — শান্তভাবে বলল কলাবতী — তুমি তো জান —

—সেই কলকাতা গেলে — আমাকে জানালে না — তীব্র অভিমানে বুক ভারী হয়ে এল আমার।

— কিচ্ছু ছিল না — ঘর জ্বলে গেল — ম্লান শব্দহীন ওর গলা।

কারখানায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল যে — ঘর বাড়ি জ্বলে গেল — কি করবে কলাবতী! সবাই ভেবে-চিন্তে ওর সাদী দিয়ে দিল। ছত্রর সাথে। ছত্র বাহাদুর সাধারণ ছেলে — ছোট্ট একটি দোকান চালায় ওদেরই পল্লীতে। কলাবতী তো সত্যি আর চা বাগানের মেয়ে নয় — সাধারণ মেয়ে। ওদের চক্ষুশূল তো বাগানের ইউনিয়ন।

কলাবতীর পাশে এসে বসল ছত্র। আমার চোখের সামনেই আলতো হাতখানি রাখল কলাবতী তার কোলের উপর। গভীর হতাশা আর আফসোস কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। আর দুসরা দিন দেখা তো হ'ল।

— নবজাতককে প্রথম দুধের স্বাদ শেখানোর সময়েই তারা উঠে এল গাঁয়ের পথ ধরে — ডাইনে-বাঁয়ে গুলি চালাতে চালাতে —

ডুকরে কেঁদে উঠল ছত্র বাহাদুর। দু'হাত বাড়িয়ে শিশুর আদরে তাকে বুকের উপর টেনে নিল কলাবতী। তার চুলে, তার মাথায়, তার অশ্রু ধোয়া মুখে নীরবে ঝরা পাতার মত শীর্ণ হাতখানি বুলিয়ে যেতে থাকল। ঝলসানো ক্ষতের ওপর গভীর মমতার গাঢ় প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে যেন।

কলাবতী দিয়েছে তার প্রেম, তার সন্তান। বুকের ভিতরে নৃশংশতার শেষ বুলেটটি জমা রেখে সেও দিন গুণছে — দুসরা দিন।

অদিনে

নরম পাঁকের মাঝে যেন জমাট বেঁধে রয়েছে শরীর। মাস চামড়া চুঁইয়ে হিম বসছে হাড়ে। নাকের ডগায় শির শির বয়ে যাচ্ছে বাতাস। হাতের আঙ্গুল পায়ের পাতা অসাড়। কাঠের মত হাঁটু দুটো মুড়ে কাঁথার নিচে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে শুলে ওম হতো, পায়ের পাতা হাতের পাতা উসুম হয়ে উঠত। নাড়ানো যাচ্ছে না। চেতন এসেছিল বুকের কাছটায় কপালের রগে—একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল। আঠাল পাঁকের মত আঁধার জমাট হয়ে ঘিরে রইল।

মোটর গাড়ির হেড লাইটের মত সরে সরে যাওয়া চেতনের তলায় চকিতে একটা ছবি ভেসে এল, কবেকার কোন ছবি—ডোবার পাঁকে আটকা পড়ে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে এক মাদী শুয়োর—পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার পুতুলের মত বাচ্চা কটা—শুযোরওলা বাঁশ ঢুকিয়ে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলল—ঝাঁকুনি লাগল সারা শরীরে—

চেতনা এসে কাঁপতে থাকল চোখের পাতায়। জলে ডোবা ঝিনুকের মত ভারী আঠা মাখান আর শক্ত পাতা দুটো—টস টস করছে। চেষ্টা করেও ফাঁক হলো না এক চিলতে। রাত পুইয়ে এল কি, জাড়ে যে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে—হাত দিয়ে কাঁথাটা বুকের ওপর জড়ো করে তুলবে ভাবল হলো না, আঙ্গুল ভাঙ্গল না, হাত উঠল না।

খিরি অ খিরি—ডাকল গলা তুলেই। চুপ করে রইল। কানে শব্দ বাজল না। বুকে পাথর চাপ—মরে গেছে নাকি সে। এক ঝলক কন-কনে হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল পাতা বেড়ার ফাঁক ফোকর গলিয়ে—খর খর সর সর শব্দ চার পাশ জুড়ে। কুকুরে বেড়ালে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ঢুকে পড়তে চাইছে যেন—

হেই আবাগীর বিটি—জাড়ে জমে গেলাম গো—

ঠোঁট ফাঁকা হলো কি! মুখের ভিতরে জিভ বাড়িয়ে দেখতে চাইল আড় ভেঙ্গেছে কিনা। নাকে মুখে ভিজে বাতাস, ঝরা পাতার গন্ধ। পচা ডোবার গা গোলানো আঁশটে গন্ধ—সেই যেবার পেট খোয়ালো, সূতিকায় মরণের দাখিল—তেমনি—।

চালের উপর দিয়ে ঝাড়ালো বাঁশ টেনে নামানোর চড়াক চড়াক ছড় ছড়—

—আই গো—চোখির মাতা যদি এট্টু ফাঁক হত—কুন হারামজাদা বাঁশ ঝাড় উচ্চন্নে দিলরে বলি উঠে দ্যাখ—খিরি অ খিরি—ওরে ও গতর সোগা পোড়ার মুখ—প্রাণপণে শব্দহীন গাল পাড়তে পাড়তে হঠাৎ গলার ভিতর থেকে নলিটেপা মোরগের মত কঁত কঁত শব্দ উঠল।

মেঝে থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসল খিরি—অ-মা গ—জল ঢালতিছ—এই জাড়ের মদ্দি—মানুষের এট্টু যদি চখের পাতি এক করতি দেখিছে—বুক ফাটি যায়—

গজ গজ করতে করতে উঠে বিছানা কাঁথা সরিয়ে লম্ফটা খুঁজল খিরি। পিঠে জলো হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝাপটায় শরীর থরথরিয়ে উঠল—চোয়াল আড়ষ্ট হয়ে এল। ঝাঁপটা খসে একপাশে পড়ে গিয়েছে।—চাবুকের মত বাতাস উল্টি পাল্টি খেলে বেড়ায় ঠেসে দেওয়া তালপাতায়, ফাঁক বোজানো চালের বাতায় খেজুরের পাটি, প্লাসটিকের চাদর—উড়ছে পড়ছে ফর ফর পত পত--ঝড় উঠেছে—বিষ্টি পড়েই চলেছে অঝোরে। মাচানের ওপর থেকে কড়িবালা কঁকিয়ে উঠল আবার—

খিরি ব্যস্ত হয়ে যেখানে যতটুকু শুকনো তেনা কানি, ছেঁড়া খোঁড়া কাঁথা কাপড় পেল সব এনে চেপে ধরল কড়িবালাকে।

কড়িবালার বোঁজা চোখের ভিতরে বিদ্যুৎ চমকের আবছা আলো—শব্দ উঠল আকাশ খান খান করে।

কোলের সন্তানের মত কড়িবালার হিমশরীর দু'হাতে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল খিরি। মেঝেতে জল বেয়ে যেতে লাগল। পিঠের ওপর আছড়ে পড়তে থাকল শীতের রাতের ঝড়ো বাতাস, বরফকুচিতর মত ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। চোয়ালের গর্তে ঝুলে থাকা শেষ দাঁতকটিতে প্রবল ঠোকাঠুকি। অনেক পরে কড়িবালা তার গালপাড়া শেষ করল—মাগো—জাড়ে গতর কালিয়ে গেল—আর বাঁচবনি—

শব্দকটি কম্পিত তরঙ্গ হয়েই বেরিয়ে এল শুধু। একটু একটু করে খিরির শরীর গড়িয়ে জল নামতে লাগল কড়িবালার গায়ে।

বহুদিনের অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় লতাজালের জটিল বাঁধনে বাঁধা জীর্ণ ভিটের পরে বাঁশবাগানের দীর্ঘ হাত অশান্তভাবে আছড়ে পড়তে থাকল। নির্মূল করে চলল আশপাশের অবরোধ। দুরন্ত জলের ঘূর্ণি ভেঙ্গে পড়তে থাকল চতুর্দিকে। মেঘের আস্তর জুড়ে ছুটে এল বিদ্যুতের ঝলকানি। বীভৎস শব্দে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড আক্রোশে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে, উপড়ে ছিবড়ে করে ফেলল সবুজের সমারোহ। তারি মাঝে অচেতন আচ্ছন্নের মতন নিঃসাড়ে পড়ে রইল দুটি জড়াজড়ি শরীর। সে রাতে ঘরের বেড়া খসেছে চাল উড়েছে; খোঁটা কখানাই যা খাড়া আছে এখনও।

কড়িবালা ফের চেতন হয়ে উঠল। কাকপক্ষী ডাকবে না নাকি। রাত কি ফর্সা হ'য়ে এল! শরীরে এমন পাষাণ চাপান লাগছে—কোথাও কোন শব্দ নেই। মরা চোখ দুটোয় যে ঝিনুক ডালা তেমনি আঁটো।

খিরি অ-খিরি—রাত কি ফুইরেছে।—বোঁজা ঘড়ঘড়ে গলায় বিজবিজ শব্দ উঠল।

চালখানা খসে পড়ল নিকি বুকের পরে—হাঁফ লাগছে—কতকালের পুরনো চাল—মিনসে এবার তালি আমারে ডাকিছে—। অ গো, যদার বাপ—সেই নিজির হাতে নতুন চাল বাঁধলে সে হবে বা এক কুড়ি বছর—নিদেন হয়ে এসেছে টের পেয়েছিল নাকি কে জানে—দুই ছেলে নিয়ে চাল বাঁধল। ফুট ফুটে জ্যোৎস্না। রাত হয়ে গেল চাল বাঁধতে বাঁধতে। ছেলেদের নিয়ে নেয়ে ধুয়ে খেতে বসে বলল—ঝা করে দিলাম বুঝলি টানা বিশ বচ্ছর আর হাত দিতি লাগবে নি—খড় পাল্টালেই চইলবে। গুড়ুক টানতে টানতে কত গল্প। ন্যাপাকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলল—তোর ঘরও সোন্দর করে বেঁধে দেব, ইবার ঘুরে আসি। গায়ে পায়ে দুর্বল ভাইটাকে সে বুকে করেই বাঁচিয়ে রেখেছিল। সব গিয়ে এই ভাইটাই ছিল তার আপনার। তার নক্ষণ ভাই।

রাতে মাচানে শুয়ে নতুন খড়ের গন্ধে ম' ম' ঘরে কড়িবালার চামড়া ঢাকা শরীর সাপটে ধরে যদার বাপ বলল—হ্যাঁরে তুর মুখে হাসিনি কেনরে—কালাপানা মুখ করে থাকিস সারাদিন—আজ একটু হাস দিকি—কিরক'ম ফুট ফুটে চাঁদ দেখ—ঘর সোন্দর হয়নি—কড়িবালার গোমড়া মুখ খোলসা হয় না—এক শালগাছ আনি তুলিছ ঘরে আর সুখ—

হা হা করে হাসল মিনসে। কড়িবালার শুকনো গালে দাড়ি ঘষতে ঘষতে বলে—বল দিনি অমন আমসির মত মেয়েডা অমন সোন্দর বাড় বাড়ন্ত হবে কিডা জানত—যাই বল্ ও যদি কম্মিষ্টি না হত তুই বাঁচতি!

—সোহাগ দেহি খুব—

—আহা ওর পরে তোর এত খার কেনে—ন্যাপার দিকি তাকানো যায় না—তিন তিনটে বাচ্চা বুক খালি করে চলে গেল দুঃখী মেয়েডা—

—উডা মরাঞ্চে—অলক্ষুণে

—বাঃ কি যে বলিস—ন্যাপা যে চেরডাকাল দুবলা ক্ষয়া—মন বলে—শেষেরডা সে তিন মাসের হইছিল—কমজোর বাচ্চা বুকের ওম দিয়ে এট্টু যদি যতন করতিস তুই—

—আহা শোন কথা—আমি বসে বসে সোহাগ করি—আর কাম ছার কাম কিডা করে—

—সে আবাগী যে ঘর দে বাইরে দে দিন ভোর খাটে—

—না, খাইটবেনি—বসে বসে খেঁটবে—দুই দুটো পেট—

হাঁ হাঁ করে বিছানায় উঠে বসেছিল যদার বাপ যেন সাপের লেজে পা পড়িছে।

—মিনি মাগনা খায় আমার ভাই—বচ্ছরভোর কত টাকার জাল বোনে তার হিসেব জানিস তুই—ফড়েরা অমনি অমনি ঘুর ঘুর করে না—দাদারে সব দিয়ে বসে আছে—অমন ভাই কার আছে—ঘর করব, বলল—ছেলে দুটো বাইরি পড়ি থাকে আগে তোর ঘর হোক—আর ওই শোকা তাপা মেয়েডা, মুখে এট্টু কালি নেই—

তাই বৈকি ঢলানীরে যে মনে খুব ধরিছে—কোন ফুলির ক'নে মধু তা আর বুঝি

নে—

ই কি কথা—ও আমারে বাপের মত দেখে—ওর মা এসে কত্তবার পেন্নাম করল দেখলি—বলল পোড়ামুখী এমন সোন্দর হইছে চিনতি লারছি গো—এ আপনের দয়া—আপনি ওরে বাঁচাইছেন—যদার বাপ কড়িবালার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তোর বড় বিটিটা বাঁচলে ওমনি হত না—বুকির মদ্দি খার রাখবি না—ভালবাসলি বুক খোলসা হয়—নে হাসতো দেখি আমার পেরানডা জুড়ায়ে এট্টু হাস—

শরীরের এখানে ওখানে মুখ ঘষটে ঘষটে হাসিয়ে রসিয়ে সে রাত কত সুখে শেষ হয়েছিল—ভগবান—

—খিরি আঁটকুড়ি-ঢেমনী-জন্মের ঘুম ঘুমোয় থাক—আর জানি সাড়া না ফেরে—

কড়িবালা নড়ে চড়ে শরীরে আড় ভাঙ্গার চেষ্টা করে। হল না। সেই থকথকে কাঁচা পাঁকে গেঁথেই আছে সব্ব শরীর। অনেক চেষ্টায় হাতের আঙ্গুল মুঠি ভাঙ্গল—কষ্টে ককিয়ে উঠল। মোরগ ডাকার মতই ক ক শব্দ উঠল গলায়। হাত খুলে ফের মুঠো করল।

এই পাষাণের তলা থেকে গতরটা একটু টেনে তুলতে পারলে সে নিজেই পারবে—আলোর চিকেষ দিল কিনা দেখতে। সব কেমন জ্যাবজ্যাব করছে। এমন পড়ে থাকলে বুকে কফ ধরল বলে—কে জানে জ্বরের ঘোরে শরীর এমন ভেরে .এসেছে কিনা। ভয় ধরে গেল—

খিরি অ খিরি—আমারে তোল—মুখের ওপর ফিনফিনে জলো হাওয়া-

কষ্টে ঝিনুক জোড় একটু ফাঁক হলো বুঝি—

হা কপাল মুখের উপর ঝুলে আছে ছেঁড়া খোড়া ঘোলা আকাশ। আ গো চালই তাহলে ভেঙ্গে পড়েছে কড়িবালার বুকের পরে। মন্দের ভাল মাথা বাঁচিয়ে পড়েছে। মিনসের বড় মায়ার শরীর ছিল—তার চাল কি কড়িবালাকে প্রাণে মারতে পারে।

শরীরটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে বোঝাটার তলা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কড়িবালা। গা গতর যে জল ঢোসা মরা মাছ। মেঝেতে এতক্ষণে পুকুর হয়েছে নিশ্চয়—বলিহারি ঘুম বাবা—যখন জানোয়ারগুলো বেড়া কেটে টেনে নিয়ে গেল—টেরই পেল না—সর্বনাশী—

মা গো সেই আমড়া আঠি মুখ, ওলের মত মাথায় শনের নড়ি দু'চার গাছি, খড়কেপানা মেয়েটার কেমন মোহিত করা চেহারা হল! কড়িবালা তিনবার বিইয়ে সুতিকায় ধুঁকছে। তারই মধ্যে পেট খুইয়ে এখন তখন। ডাক্তার কবরেজে বলছে বিশ্রাম-বিশ্রাম। ছেঁড়া ইজেরে ত্যানা জড়ানো পাঁশবর্ণ মেয়েটারে সামনে এনে ধরেছিল যদার বাপ। বললে, ন্যাপার সাথে বে-দিয়ে ইটারে ঘরে তুলব—ভিক্ষে দুঃখ করে খায়—

অছেদ্দায় মুখ ফিরিয়ে নিল কড়িবালা—ওমা এ যে পোক।

যদার বাপ ঘনিয়ে এসে পাশে বসল—মেয়ের মা বলিছে—মেয়ে আমার ডাগর,

অন্ন বিনে অমন দড়ি দড়ি—সে হোক্ গে—এখনি এট্টা নোক দরকার—

পেটে ভাত পড়তে না পড়তে শরীর জুড়ে অদেখা যৌবন কুল কুলিয়ে বান ভাসাল। পাঁশ বর্ণ মাজা তামার মত চক্‌চকে্। যে দেখে—বলে—ই সেই ন্যাপার বৌ! হ্যাংলা মদ্দগুলো চোখেই গিলবে বুঝি। এক বড় দোষ—কথা নেই বার্তা নেই ফিক ফিক হাসি। মরণ। হাসির জন্যে একদিন গাল টেনে ছিঁড়ে দিল কড়িবালা-ফড়েদের সামনে হেসে হেসে কতা—নোড়া দিয়ে মুখ থেঁতো করে দেব—মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল কড়িবালার। বয়েসকতালে তার গড়ন পেটন কি মন্দ ছিল—রোগে ভোগেই যেন ছ্যাতা পড়েছে, এমন বেসরম সহ্য হয়! ফড়েদের দেখে সে এখনও ঘোমটা আড়াল দিয়ে থাকে না!

ভাবনার উত্তাপ চারিয়ে গেল মাথায়। শরীর একটু খর লাগছে। নড়ে উঠল কড়িবালা হাত তুলে কাঁথা কাপড় নাড়াতে চাইল—হাতে ঠেকল যেন মানুষের শরীর—আ মরণ—তার শরীর যেঁতে শাল গাছের মত পড়ে রয়েছে খিরি—বটে! সে ভাবছে চালা খসে পড়েছে। আঁটকুড়ির সাড় নেই নাকি—হায় মা তার কি খ্যামতা হবে এই শাল গাছ ঠেলে তোলার।

তা শালগাছই বটে—বলবলিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটা—খাটত। আপনার শতেক কুড়ি—শরীর আর জুত হলো না। একা ঠেলে যেত সংসার। নিজে অপরাগ হলে কি হবে—কম যাতনা দেয়নি সে খিরিকে। ছেলেদের দিয়ে দেওরকে নিয়ে মার খাওয়াতে সে সব ফন্দি কড়িবালার কম জানা ছিল না। নিজের হাতের সুখ তো ছিলই—ছাড়ত না—ভাতেও মারত। রস একটু মরুক। সোহাগী মেঝেয় জল জমতে মাচানে উঠে এয়েছেন ইদিকে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে—প্রাণ যে বেরিয়ে যায়।

কানাচে জলে কাদায় কলকল শব্দ। ভেড়ি টেড়ি ভেসেছে নিশ্চয়—ঠিক যেন মাছ খাবলাচ্ছে। ঘুনখান রাতে পেতে রাখলে আর দেখতে হতো না—কতো মাছ যে আটকে থাকত—ন্যাপার নিজের হাতের তৈরি—

খিরি যদি উঠে দেখতো একটু—

আহা কোমর বসে যাওয়ার আগেও দুজায়ে খ্যাপলা ফিকে ছাঁকনা জালে কত মাছ, মাছের পোনা ধরেছে—বেচেছে। জেলের ঘরের বৌ, ঝি—তারে নাকি বাতে ধরল। কোমর আর তুলতি পারে না। কপাল—

ভরা বয়সেই ভোগ করা হ'ল না। জোয়ান খিরির চনমনে টানটান শরীর দেখে দেখে বুক জ্বলে—ঢেঁকিতে ধান ভানতে তার শরীরে যেন নদীর ঢেউ। কড়িবালা উবু হয়ে বসে প্যাঁকাটির মত ফ্যাকাসে হাত বার করে ঢেঁকির মুখে এলো দেয়।

খিরির পানে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তার ছিল খালি পুতের গরব। লোকের কাছে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত—ও আবাগী মরাঞ্চে।

তা সে গুমোর কি রাখলে ভগমান।

ঝড় না, বান না—বাপ-বেটা তিনজনায় ফড়েদের সনে সেই মাছ ধরতে গেল। কেউ ফিরল না। অতবড় জালখান তার সুতোও দেখতে পেল না। ফড়েরা খবর

পাঠাল—মাছধরা নিয়ে দাঙ্গায় ওরা খুন হয়ে গেছে। কে জানে সত্যি কি হলো। তখন তো দেশে পেরধান ছিল না—যে আছড়ে গিয়ে পড়বে—এর এট্টা বিহিত কর তোমরা।

তার নক্ষন ভাই যখন তখন ডুকরে ওঠে—আমার কেউ নাই গো, কেউ নাই—

আমি আছাড়ি পিছাড়ি খাই—আর চিক্কির দিয়ে কাঁদি। সে থম মেরে বসে থাকে। খাওয়ালে খায়, নাওয়ালে নায়—যেন অথব্ব।

দিনে দিনে শুকিয়ে যায় শরীর—তারে কি বাঁচানো যায়!

চড় বড় করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল—মুখে কপালে। হাওয়া উঠল—গাছ-গাছালির মাথায় মাথায় ঝটাপটি—খিরি অখিবি—

কড়িবালার কাতর চিঁ চিঁ চিৎকার সেই বাতাসে উড়ে উড়ে পাক খেয়ে ফিরল। খোলা চালের ফাঁকে আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। প্রাকৃতিক নিয়মে কি নতুন করে ঝড় জলের ঝাপটায় খিরির আচ্ছন্নতা কেটে গেল। প্রচণ্ড কাশির দমকে মাথার খুলি ফুটিফাটা হচ্ছে, যেন বুকের খাঁচার হাড়গোড়ের জোড় খুলে পড়ছে—সেই অস্বাভাবিক দমকে কড়িবালা কঁত কঁতিয়ে কাতরে উঠল—

বুকের পরে যেঁতিয়েস বসেছিস—আমার জান খাবি—ওরে আমার জন্মের শত্তুর—

খিরি যন্ত্রণায় জারিয়ে যাওয়া মাথা তুলে অতিকষ্টে উঠে বসল। ঠাণ্ডায় শরীরের সবকটি গাঁট জমে কাঠ। শরীর নাড়াতে চোখে জল এসে গেল। মাথা যেন গোড়া থেকে খসে পড়বে—বুকের মধ্যিখানে জুলুনি পুড়ুনি। জ্বর এসেছে হয়ত— নিজের কথা ভাববে কি কড়িবালার চিল চিৎকার শুরু হয়েছে। শাপ-শাপান্ত গালি-গালাজ ঝরছে কাঁচা আঁচের ফুলকির মত। তাড়াতাড়ি তার গা থেকে ভিজে কাঁথা কাপড় টেনে আড়ায় ঝুলিয়ে দিতে লাগল খিরি। এদিকে ওদিকে যেটুকু শুকনো শাকনা জুটল তাতে জড়িয়ে কড়িবালাকে তুলে এনে বসিয়ে দিল আস্ত কোনটায়।

তারপর খসে পড়া চালের তলা গলিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে উঠোনে নেমে দাঁড়াল। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পুবের কোনের খুদি জামের ঝাঁকড়া গাছটা উপড়ে পড়ে আছে উঠোনের পরে আর একটু উত্তর ঘেঁষে এলেই দু'জনে চ্যাপটা হয়ে থাকত এতক্ষণ। সবেচেয়ে মোটা ডালটা নাবার সময় ধসিয়ে নিয়েছে আধখানা চাল। লণ্ডভণ্ড চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে—এতবড় ঝড়-ঝাপটায় তারা ঠিক বেঁচে গিয়েছে। বলে না বিধবা মেয়েছেলের জান বিড়ালের মত টঙ্ক। কার ফলন্ত পেঁপে গাছের মাথা ঝুলে আছে জড়াজড়ি করে হেলেপড়ো বাবলা গাছের ডালে। ডাঙার মাটি যেন শুয়োরের পাল জুড়ে দাঁতে খুবলেছে, ঝোপঝাড় উগলে দগদগে কাঁচা মাটি বেরিয়ে পড়েছে—নাবালে জমিতে হাঁটু প্রমাণ কাদাজল।

ভিতর থেকে কড়িবালার ক্ষান্তিহীন গালাগালি ভেসে আসছে। সেদিকে মন নেই খিরির।

নিরাপদ আর পঞ্চানন পাগলের মত ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। বুকের ভিতর উথালপাথাল—আহা সোনার বরণ পাকা ধানের ডাঁটো শীর্ষগুলো—

পঞ্চাননের বুকফাটা চিৎকার ভেসে আসছে—ওরে আমার নক্ষি বেসজ্জন হয়ে

গেল রে—

নিরাপদ তাকে টানতে টানতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—অমন ক'রোনি তো—

জন লাগিয়ে আজই কেটে নুব—ঘর চল—দুটো মুখি দিবা—

—ওরে আমার পানলতা—সব নিব্বংশ—মূল খসে মাটি নিয়েছে গো— কড়ি বালা চেঁচিয়ে ডাকে বলি কি হলো, অ নিরাপদ, অ পঞ্চানন—উঃ হুহুঃ জাড়ে শরীর জমে গেল—খিরি অ খিরি—

হু হু করে কাঁপুনি লাগল খিরির জ্বর তাড়াসে শরীরে। কাঁপতে কাঁপতে ভাঙ্গা চালের নীচ গলে কষ্টে শরীর টেনে হিঁচড়ে ঘরে ঢুকে এল। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করতে করতে মাচার তলায় দেশলাই রাখা ডিবেটা টেনে নামাল। লম্ফ খুঁজেই পেল না। ঝড়ের ঝাপটায় কোন দিকে গিয়েছে খোঁজার তর সয় না।

বসে পড়ে বলে—লম্ফটা কুন দিক পানে ঠাহর হচ্ছে—

গতরে ঘুন ধরিছে—এইবার তোর মটমটানি ভাঙ্গবে—হাতড়ে হাতড়ে কড়িবালা কাদায় বসে যাওয়া লম্ফটা টেনে তুলল—

—তেলটুক আছে না গেছে—

ধোঁয়ায় হেঁচে কেশে হাঁফাতে হাঁফাতে আগুন জ্বেলে ফেলল খিরি। দু'জনে বুক দিয়ে আগলে—শরীর তাতাতে বসে গেল।

—নিরাপদরা আজই ধান কাটাবে—শরীলে জুত থাকলি—আমি

—তুই থো—অদ্দেক ধান কাদায় পাঁকে পড়ে থাকবে—মাঠ টানলে কুড়িয়ে আনব—

—খুড়ো বড় আফসাচ্ছে—

—তা আর আফসাবে না—জমিখানা জলের দরে নিল আমারে ঠকায়ে—

—দুঃখির দিন ত্যাখন—কি করবা—খানিক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকে দুজনে।

কড়িবালা প্রথম কথা বলে—পঞ্চায়েত থাকলি—এমন বোকা বানাতি পারত না।

—থাকলিই বা কি হতো—অথব্ব শরীল—সেই বার-ভুতে খেত—

চুপকর—ব্যবস্থা এট্টা হতই—হাঁরে আজ কি বার—

—মঙ্গল বুধ হবে—বার দে কি হবে—ইদিকে নোকের চাষবাস উচ্চন্নে গেল—

—যাক—মরুক—মরুক—শোন পেরধান বলিল না যেতি—

—থোও—আর যেতি পারব না—অত হাত কচলাতি পারিনে আমি—

মলিন হাসে কড়িবালা। এখনও তেজ এট্টু আছে তাই—কোমল গলায় বলে—তোর জন্যিই আমি পেরধানেরে ধরিছি রে খিরি—তুই আমার সারাডা জেবন করলি কর্মালি—আমার মতন অদিনে তোর যে কেউ থাকবে নি—খিরির অদিনের কথা ভেবে দরদে ব্যথায় কড়িবালার গলা বুঁজে আসে—কোমর বেঁকিয়ে পাছা ঘষটে ঘষটে কাছে সরে আসে সে—

মনে আছে লোকে দৌড়ে দৌড়ে এলো—খবরদার ওরে নিবিনি—

আমি জানতাম তোরে ছাড়া আমার চলবেনি—সেই জন্যই তো বললাম— ওর ঘর

ওর দোর—আমি না নেয়ার কে ?—কোমর ঘুরিয়ে দপদপিয়ে গিয়ে ঘরে দোর এঁটে দিলাম--

খিরি উঠল—মাচার তলায় হাড়ি কুড়ি ঘেঁটে ঘুঁটে—একটা গাঁটি কচু এনে আগুনে ফেলল—

জিয়ারের গম শেষ--কাতরে উঠল কড়িবালা—বাইরে অনেক আওয়াজ, ঝাঁকাঝাঁকি হাঁকাহাঁকি। খিরির ভিজে কাপড় টেনে এসেছে, ভাঙ্গা চালের তলা গলে আসতে গিয়ে থমকে যায়—

—হাত নাগাও গো নাট সাহেবের পুতরা—

ঝির ঝির কনকনে বিষ্টিতে ভিজে ভিজে চালা সরিয়ে পথটা সাফ করে দিচ্ছে ছেলেপুলেরা। ভিতরে উঁকি দিয়ে বলে—জীয়ন্ত আছ—আগুন জ্বালতি পারিছ—

—লে লে হাত লাগা—

কড়িবালা পাছা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে আসে—সোনার বাপ আমার—কার ছাওয়াল গো তুমরা—ভালমানসের পুতরা আমারে দেখতি এয়েছ—দুখী অথব্ব বিধবা মেয়েছেলে—

—আরে দড়ি কুথা—দড়িই আনিসনি—জলকাদা ভেঙ্গে ওদের দাপাদাপি ছুটোছুটি। চালটাকে টেনে তুলে দিচ্ছে বাতার উপর।

কড়িবালা বলছে—অ সোনার বাপরা মেলা মাছ এয়েছে না—রাতভোর খাবলাচ্ছে—খ্যাপলা ফেলিছ নাকি—ঘুনি পেতি রাখলি কত্ত মাছ হত—

প্রথমটা অত কান দেয়নি কেউ। বুড়ির খুনখুনে গলায় ঘ্যানঘ্যাননি—। যে ছেলে দুটো ঘরের ভিতরে ঢুকে চালটাকে নিচ থেকে ঠেলে রেখেছিল—তারা হেসে উঠল—শুধু মাছ—সে আর বলতি—মানুষ গোরু ইঁদুর বেড়াল সব উঠতিছে—

তুলে তুলে ডাঁই করে ফেলিছে—

বুড়ি জিভ কাটে কান মোচড়ায়—দুগগা দুগগা—অমন মসকরা করোনি বাপ সকল—বুড়ো মানুষরি অত হতচ্ছেদ্দা করে না সোনারা—

—মিছে কথা লয় গো ঠাগ্‌মা—তুমি তো বুঝনি—তিনখান গাঁ উজাড় হয়ে গেছে জলের তোড়ে সব ভেসে এয়েছে ইদিক পানে—আহা গো কচি কচি কোলের বাছা—চোখির জল রাখা যায় না—

—অ খিরি তয় আমরা কি খাব—সব যে ভেসি গিয়েছে—

—আ মলো যা—থামো দিকিনি—আমার বলে বুক ধড়ফড়াচ্ছে—

—অ সোনার বাবারা এ অথব্ব বুড়ির কি হবে—বকেই চলে কড়িবালা। চালটাকে ঠিকঠাক বসিয়ে দিয়ে ছেলেগুলো হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে নেমে এল।

এমনি থাকল গো ঠাগ্‌মা—পরে কখান তালপাতা কেটে ঠেসে দে যাব নে—কড়িবালা সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে—মাটি ধরে কোমর মুচড়ে ওঠবার চেষ্টা করে—

ছেলেরা হাসতে হাসতে চলে যায়—পেরধান আসতিছে—ইলিফ পাবা— নেও

আগুন ছেড়ে আর উঠোনি—

খিরির হাত ধরে তবুও ঘরের বাইরে উঠে এল কড়িবালা। —কালকের দিনমান থেকে ঝরতিছে—ই পচা বিষ্টি কি ধরবেনি রে—ই পিথিমর দশাখান দেখি—আমার বুকখানের মতন রে খিরি—দঞ্চে দঞ্চে হাড় মাস বেইরে পড়েছে—উঃ হুঃ হু—হাত পা কালিয়ে যায়—হিমেল বাতাসে সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। কড়িবালা হুমড়ি খেতে খেতে ঘরে এসে আগুন বুকে করে বসে পড়ে।

বাতাসের হু হু, আর গাছের পাতায় পাতায় জল পড়ার তির তির শুনতে শুনতে কড়িবালা অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

আচমকাই বলে বসে—খিরি—পেরধান এলি—এট্টু হাতে পায়ে ধরিস—

খিরি চমকে গিয়ে বলে—এই কথা ভাবতিছ এখুনও—মানুষ মরে ডাঁই হয়েছে—কোন আবাগীর কোল শূন্যি হয়ে গেল গা—গলা কাঠ হয়ে আসে খিরির।

—সেবার নিরাপদ টো দে নে গেল—কলকাতায়—মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নেযাবে—

হারামীর বাচ্চা নে গেল খুব, বড় রাস্তায় ফেলে কুথায় চলে গেল—বোমা পড়তিছে ইঁট পড়তিছে পুলিস লাঠি নিয়ে ধেয়ে আসতিছে—

—আর বকো নি—তুমার ইসব কথা ভাল্লাগতেছে না—কিছু ভাল লাগতেছে না—

—নিজির পেটের কথা—নিজিরই ভাবতি হবি—কেউ ভাবতি এসবেনি—কপাল পুড়বে কেন তবে—আমার কথাডা শুনলি তোর ভালই হবে—হাত বাড়িয়ে খিরির গালে শুকনো হাত রাখে কড়িবালা।

—সেই তো বলবে—হইছে হইছে এট্টু রও—অত তিড়বিড় ক'রনি—

—তোর কিছু করতে হবেনি—রাগে ক্ষোভে মুখ কালো করে গুম হয়ে বসল কড়িবালা। ওদের হাতে রাজত্বি। ওরে ধরব না কি ধরব নিরাপদের। পঞ্চা বলল মুখ্যমন্ত্রী একবার বলে দিলেই হয়ে যায়। সেকথা শুনে রাঘব হেসে বলেছে—কাগজপত্তরে তোমার নাম পঞ্চায়েত পাঠিয়ে দিয়েছে এ কলকাতার অফিসে—ওখেনেই যা এট্টু হাঁটাহাঁটি ঘাঁটাঘাঁটি—তা নোক ঠিক বলা আছে যখন হবে সবার একসঙ্গে হবে—

নিরাপদরা পাকা লোক। ক্ষমতায় থাকলে কড়িবালাকে না দিয়ে বিধবা ভাতা তার পিসির নামেই বের হয়ে যেত তা ঠিক—তবে শুলুক সন্ধান সব জানে—এবারে এই ছ্যামড়াগুলোর সঙ্গেই যাব—বড় মিটিনে কলকাতার—সামনা সামনি বলে তেনারে দেখা যায়—দিয়ে আসব হাতে হাতে—নিরাপদর লেখা চিঠিখান। আমরা গরিব বিধবা—আমার দুঃখুটা তেনি বুঝবেন।

সুখ-পাখি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের কোনে আই লাইনারে শেষ টান ছোঁয়ানো হ'ল। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে লিপিস্টিক মসৃণ করে দূরে সরে এলো কেতকী। বুকের ওপর দিয়ে কোমরের ঢাল বেয়ে শাড়ির পাড় ঠিক ক'রে বসালো। পাতলা শরীর ঘুরিয়ে পিছনের শাড়িটা পায়ের তলায় চেপে নামিয়ে আনলো। প্রতিবিম্বে মিষ্টি হাসি বিনিময় করে বাইরে এলো। এখনও কত কিছু সারতে বাকি। ঘড়ির কাঁটায় সময় ছুটছে। ঘুর ঘুর করে ঘুরে এলো এক ঝলক। অসাবধানে কিছু বাইরে রয়ে গেল কিনা। জানালা দরজা বন্ধ করতে করতে আর একবার ঘড়ি দেখলো। দেরি হলে ছেলেটা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেয়। সব বন্ধুরা চলে যায়, একা দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে।

দরজায় বেল বেজে উঠল। কেতকীর রোঁয়া তোলা ভ্রূর দীর্ঘ রেখায় ভাঁজ পড়লো। নিশ্চয়ই ইস্ত্রি কাপড়। ওঃ আবার সেই তালা টালা খোলা। সামনে সুবেশ একটি মেয়ে হাতে কাগজপত্র। নিঃশব্দে হাঁফ ছাড়লো কেতকী। মেয়েটি একগাল হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কেতকী দরজাটা টেনে বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালো। অপ্রস্তুত মেয়েটি অসহায়ভাবে বললো, বেরুচ্ছেন বৌদি, এই এক মিনিট—। না, এক মিনিটও না, পরে একদিন আসুন—বলতে বলতে কেতকী সিঁড়ি ভাঙ্গছে। মেয়েটি নির্বাক তাকিয়ে রইলো বিরক্ত বিব্রত।

বাসের ভিড়ে আর্ধেক প্রসাধন খুইয়ে শাড়ির পাট লেপটে চেপটে স্কুলের চত্বরে পা দিয়ে তবে স্বস্তি। ছুটি এখনও হয়নি। মায়েরা সব গুচ্ছে গুচ্ছে বসে দাঁড়িয়ে আলাপ জমিয়েছে।

কপালের উপর বব উড়িয়ে মন্দাকিনী কেতকীর আসার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, কি ফিগার—ব্রতী—আমার কি যে ভুড়ির সমস্যা দেখা দিয়েছে—

—খাটুনির শরীর বাছা বাঁধুনি ভালো—ভাল মানুষী করে বলে ব্রততী।

—খেটেখুটে দড়ি পাকিয়ে যায়নি, নিত্যি নিত্যি সরস—চশমাটা চোখের উপর তুলে দিয়ে ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ পাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখে অঙ্কিতা—

—হাই ব্রতী এটা দেখেছিস না—

—নাহ্ বাবা—আগেরটাই এখনও সামলাতে পারিনি—তোর পাল্লায় আর পড়ি ?

শকুন্তলা কাঁধের সামান্য ঠেলা দিয়ে আস্তে করে বলে—সাহানাদিকে ধর বিরাট লিফট পেয়েছেন মিঃ সিংহ রায়—

—তাহলে —পার্টি—সাহানাদি কি শুনছি—

—মন্দ বলিসনি—মন্দা কৌতুক ছলকানো চোখে কেতকীর দিকে ইশারা করে—

—বলনা সাহানাদিকে—তোর বরের ফার্মেই তো—

—পার্টিতো দেবেনই—কাঁচুমাচু মুখে বসতে বসতে চোখ নামিয়ে হাসলো কেতকী—সে আর আমাকে বলতে হবে কেন—আরক্ত হয়ে উঠলো তার মুখ। গলার নিচের ঘামটুকু রুমালে মুছে ফেললো চোখের ভারী কোনে ছায়া ছাড়াল। সে পার্টিতে কার না নিমন্ত্রণ হবে—মন্দা, ব্রততী, অঙ্কিতা, শকুন্তলা—কিন্তু কেতকী—না—সে হয় না।

ঝকঝকে আঙুল ছুঁইয়ে কেতকীর থুতনি তুলে ধরল মন্দা—কেতকীকে ছাড়া সে পার্টিতে আমরা কেউ যাব না—কি বলিস—অঙ্কিতা—

কুণ্ঠিত কেতকী হেসে মুখ সরিয়ে নিলো—চোখে কিছু পড়ে থাকবে বুঝি— কর কর করে উঠলো—

আর তখনই ছুটির ঘন্টা বাজলো।

বনবন ছুটতে ছুটতে সকলের আগে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল—আমি ফার্স্ট—

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পিঠে—টানাটানি ঠেলাঠেলি বই—এর ব্যাগ, জলের বোতল লোফালুফি—

মায়েরা ঝাঁপিয়ে দাপিয়ে যার যারটিকে টেনে নিয়ে খাওয়াতে বসলেন। সাথে সাথে নেমে এলো অজস্র পাখ পাখালি এ ঝোপ সে ঝোপে তাদের লুকোচুরি এই শিশুদের সাথে। এটা সেটা ছুঁড়ছে কখনও ভয় দেখাতে, কখনও মুখের খাবার—অনাবিল আনন্দের হাট।

বনবন বাক্স থেকে সন্দেশটা তুলে নিয়ে দু'হাতে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিল ঘাসের ওপর—একি একি করছ—ঝনঝন ক'রে উঠলো কেতকীর গলা। তার চোখে কঠিন দৃষ্টি—ঝট করে সামলে নিয়ে কোমল গলায় বললো, ছিঃ ছিঃ হাত নোংরা করলে—ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল কেতকীর কান নিজেরই গলার স্বরে। বনবনের সন্দেশ মাখা হাত ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে আড়চোখে পরিস্থিতিটা নজরে আনার চেষ্টা করছে—

সন্দেশের অনেক দাম—না—মা, দুম করে বলে বসল ছেলেটা। দু'গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিতে হয়, ভাবতে ভাবতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদরের সুরে বললো, যাঃ মাঠ নোংরা করতে নেই—না—

বেয়াদপ ছেলের কথাবার্তার কি ছিরি! যে যার ছেলে নিয়ে ব্যস্ত তবুও অস্বস্তিতে কুঁকড়ে রইল কেতকী। এখন পালাতে পারলে বাঁচে। কারো কানে গিয়ে থাকলে কি ধরনের আলাপ-চারিতা জ'মে উঠবে তাই মনে করে কাঁটা হয়ে গেলো।

বাক্স ব্যাগ গুছিয়ে উঠতে যাচ্ছে—ছেলেদের খাওয়া শেষ। বনবনকে টেনে নিয়ে চলে গেলো—ছুটছে হরিণগতি—বনবন সকলের আগে আগে—। আর দেরি করলে

বাসে উঠতে ভীষণ ঝামেলা হবে—কেতকী ডাকলো—এস, আর না—ব্যস্ততা দেখাতেও লজ্জা পেলো—। ওদের গাড়ি এসেছে নয় ট্যাক্সি ধরবে—মন্দা কি অপরা হয়তো বলে বসবে—রোস না—তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব—। বড় অসহায় লাগতে লাগলো তার।

পাড়ার মুখে গাড়ি থেকে নামতে খারাপ লাগে না—আবার পীড়াও দেয়। অস্বস্তি কন্টকিত মনে কেতকী নিস্পৃহ ভাবেই দেখছিলো চঞ্চল বনবন কেমন পিছলে পিছলে ওদের ধরার হাত এড়িয়ে যাচ্ছে—মেদ চর্চিত লাল আপেলের মত ছেলেরা দৌড়তে গিয়ে শরীরের ভর সামলাতে টলমলিয়ে উঠছে। বনবনের ছিমছাম লম্বাটে শরীর ঘামে ভেজা তেলতেল মুখে কিসের এক নয়নকাড়া উজ্জ্বলতা! ওদের আর্ধেক যত্ন, আদ্দেকেরও কম পুষ্টি ওকে ঝড়ের দেবদারু চারার মত কেমন প্রাণময় করেছে—আশ্চর্য!

একটি একটি করে আলো নেভার সাথে সাথে রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। এখন দূরবর্তী ল্যাম্পের সামান্য আলোয় আলো আঁধারীর পথ জোড়া ছক। এক একবার পর্দা তুলে এক এক রকম দৃশ্যান্তর ঘটে যাচ্ছে। একটু একটু করে রাত পিছিয়ে চলেছে।

শোবার আগেও বনবন জানতে চেয়েছে—বাবা কখন আসবে মা—সে খেতে চায়নি—বলেছিলো—টিভি দেখি না আরেকটু—বাবা এলে খাব—কেতকী ঘড়ির কাঁটার চলা দেখেই ধরে নিয়েছিলো—এ অপেক্ষার কোন অর্থ নেই। এ একটা বেনিয়মের দিন বিশ্বর। আজ সে ফিরবে রাত করে—বনবনের চোখ এড়িয়ে।

কেতকী জানে আজ দরজা খুলে দিতে বিশ্ব অপ্রস্তুতের মত বলবে—একটু খেয়ে এলাম। কেতকী কিছু মনে করে না। বিশ্ব তো মাতাল নয়। মাঝে মধ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে খায়—একটু ফুর্তি করার মন নিয়ে। রোজকার একঘেঁয়েমীর বিড়ম্বনা কাটাতে। সে সব দিনে কেতকীকে যেন নতুন করে ভালবাসে বিশ্ব। উজাড় করে দিতে চায় নিজেকে। কেতকীর মনে হয় একটু অপরাধবোধও মিশে থাকে যেন এই আধিক্যের সাথে। যখন সংকটে পড়ে আফসোসেরও অন্ত থাকে না তার এই অপচয়ের জন্যে। তবু পুনরাবৃত্তিও ঘটে যথানিয়মে।

বিশ্বর সঙ্গে কেতকীর বোঝাপড়া চমৎকার। মসৃণ ওদের জীবন। দরকারে অদরকারে বিশ্বর এই অপরাধবোধের সুযোগ নিতেও সে ছাড়ে না।

ছেলের পাশে খাটের উপর বসে ঢুলুনি আসছে। উঠে চোখে জল দিয়ে বসার ঘরে চলে এল। একটা সেলাই টেলাই কিছু করবে কিনা ভাবছে—কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বসতেও ইচ্ছে করছে না—

সারাদিন ধরে সন্দেশের ব্যাপারটায় তার মন তেতো হয়ে রয়েছে। সেই যে ছেলের গালে চড় কষাবার ইচ্ছেটা তাকে দমিয়ে রাখতে হলো—শেষ পর্যন্ত একটা মুখরক্ষা গোছের সমাধান করে নিলেও সেই ক্ষুব্ধতা তাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে মারছে। শিশুও বোঝে কত কৃচ্ছ্রসাধনায় মাকে তার টিফিনটুকুর ব্যয় সামলাতে হয়। এই রাম ডেঁপো ছেলে কোথায় যে কি বমশেল ফাটায় তার ঠিক কি?

মন্দা, ব্রতী, অঙ্কনা তার সঙ্গে বন্ধুর মতই মেশে, যখন তখন গাড়িতে লিফট দেয়, বনবনকে তুলে নিয়ে যায় ছেলেদের সাথে খেলতে ওদের সাজানো লনে, পিকনিকে ময়দানে। তাদের সাধ্য কি ছেলেকে এভাবে খেলাধুলায় চৌকশ করে তোলে—এরই মধ্যে বনবন স্কুলের জুনিয়র সেকশনে চ্যাম্পিয়ন, বন্ধুদের চোখে হিরো আর গেমস টিচারের নয়নের মনি। মায়ের মতই ফর্সা মিষ্টিমুখের ছেলে বনবন—বাড়ন্ত। এরই মধ্যে চেহরায় একটা পুরুষালি ব্যক্তিত্ব এসেছে যেন।

নিজের সম্পর্কে কেতকী যে সচেতন নয় এমন নয়। নিজের থেকে অনেক উপরতলায় মেলামেশার বিড়ম্বনা পদে পদে। অস্বস্তি, হীনমন্যতা কখনও কখনও তাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়—তবু অন্যভাবে আবার ভালোও লাগে। বিশ্বের এক সহকর্মীর ছেলেও পড়ে এখানে। পরিচয় আছে বৌটির সাথে—রেবা। ওদের একটা মায়েদের গ্রুপ আছে—আর সেটাই সবচেয়ে বড়। ওরা তার নাম দিয়েছে এ্যাসোসিয়েশন। সেখানে ভিড়তে পারেনি কেতকী। কি জানি ওদের সাথে বসে কেতকীর সব কথা ফুরিয়ে যায়, কথা হাতড়াতে গিয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দুঃখ দুঃখ, শুকনো শুকনো মুখ ক'রে যত গুরুগম্ভীর কথা—কথার জাহাজ—কোথায় কি হল তা নিয়ে হ্যানোত্যানো খবরের কাগজের কচকচি—কেমন যেন হিপোক্রিট মনে হয়। দুঃখ কষ্ট কি লোক দ্যাখানো জিনিস, দুষ্ট ক্ষতের মত তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাই শিষ্ঠাচার। সমস্যা কার নেই—এক একজনের এক এক রকম—এই তো সাহানাদি—বড় বড় ছেলে মেয়ে সব স্টেটস এ—এখন বুড়ো বয়সে কি সমস্যায় না পড়েছেন। তার ওপর স্বামী সামলানো—সেও নাকি এক বেজায় ঝক্কি—তাঁর নাকি ঘন ঘন প্রেমে পড়া অভ্যাস—

তাছাড়া—তাছাড়া রেবার সামনে বসলেই এক লম্বা বারান্দাওলা টিমটিম আলোর নিচে প্রাচীন ঝরাখসা একটি বসত বাড়ি চোখের উপর ভেসে ওঠে। বিশ্ববন্ধুর বোনের বিয়েতে নেমন্তন্নে গিয়েছিলো। ভাবতেও পারেনি খোদ কলকাতায় এমন বাড়ি হয়। ঠিক বিশ্বদের মেহেরপুরের বাড়ির মত।

বেশ ছিল সে যে বাড়িতে। বিশ্ব তখন ডেলি প্যাসেঞ্জার—সাধারণ চাকুরে। কেতকী আটপৌরে ঘরের কন্যাদায়। না আছে বিদ্যের ধ্বজা, না অর্থকৌলিন্য। শুধু চেহারায় পছন্দ। বিশ্বও বিধবা মায়ের এক ছেলে—দেওয়া নেওয়ার গলা কাটাকাটি ছিল না।

খুশি হয়ে এসেছিলো। সুখীও হয়ত। তবে প্রাচীনা শাশুড়ি বৈধব্যের রীতি মেনে চলতেন। আঁশ নিরামিষ ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার ছিল। সবচেয়ে অসুবিধা ছিল স্নান সেরে তবেই হেঁসেলে ঢোকা। সকালে কোন চায়ের পাট নেই—ধোয়ামোছা কাচাকাচি সেরে স্নান। নিজেই কাকভোরে উঠে এ সব সারতেন—পাতকুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে তুলে, কেতকীকেও আসতে হতো মুখ শুকিয়ে। চাকুরে মায়ের মেয়ে—যেমন তেমন ছিরি ছাঁদহীন রাঁধাবাড়ার সংসার—স্বাধীন। যে দুঃসময়ে মাকে তার চাকুরি নিতে হয়েছিলো—তখন শেখাবার কিছু ছিল না। বাপের কারখানা বন্ধ—হাঁড়ি বন্ধ। বিপদভঞ্জন মা দু মুঠো রোজগার করে আনেন—সেই কচি বয়সে

ভাই বোন আগলে সংসার ধরে রেখেছিল সে। পরে যখন দিন ফিরে এলো—বাবার কারখানা খুললো—মা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর কাজ ছাড়তে রাজি হননি। মেয়েও তো দুটি—ক্রমে নতুন সংসারের রীতিতে নিজেকে সে অভ্যস্ত করে তুলেছিল—তবুও

বিয়ে বাড়ি-কনের ঘরের ভিড়ে অফিসগন্ধী নারী পুরুষের উজ্জ্বল গুচ্ছটির দিকে দৈন্যের কুণ্ঠা নিয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকা অগুণতি চোখের সামনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল কেতকী। যেন কোন ফিস ফিস ভেসে বেড়াচ্ছে—ঐ তো কল্যাণীদির বড়দি ...... কোন রকমে ভিড় এড়িয়ে লম্বা বারান্দার অনুজ্জ্বল আলোয় এসে দাঁড়ালো কেতকী—দু পা এগুতেই।

—কোথায় যাচ্ছ মা—অপ্রত্যাশিত নারী কণ্ঠ তাকে আমূল চমকে দিল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কেতকী—বুকের পরে হাত উঠে এল আপনা আপনি—

—কলঘর ওই নিচে—এসো দেখিয়ে দিচ্ছি—

অন্ধকার গুহা গৃহ থেকে তার সামনে বেরিয়ে এলেন ধবধবে সাদা থান পরা বৃদ্ধা। প্রায় ভূত দেখার মতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল তার চেতনা—

ন্‌না—না একটু বাইরে এলাম—যা ভিড়ের চাপ—

—বসো মা মোড়া এনে দিই—

খাওয়ার ডাক পড়েছে-তাকে খুঁজতে এল রেবা। তাঁতের শাড়িতে ঘরোয়া চেহারায় পরিপাটি। গভীর প্রশান্তি উপচে পড়ছে। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য, অকুণ্ঠ হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে সে কেমন করে যেন অসাধারণ হয়ে উঠেছিলো সেদিন।

যা কিছু একদিন পিছনে রেখে এসেছে—ভাঙ্গা খাঁচার মতো। উঠে এসেছে এই সমৃদ্ধতর আস্তানায়, যাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে করে সে আজকের কেতকী সেজে উঠেছে তাকে আর পিছনে ফেরানো যায় না। সেই পাথর পাথর ঠাণ্ডা মেঝেতে পা রাখার কোন বাধা নেই তবু ক্রমেই আলগা সুদূর হয়ে উঠেছে। আর যাওয়া হয় না—কে আগলায় ঘর দোর, ছুটির দিনে ঝাড়া পোঁছা কাচাকুচি, না, আর হয় না—। নিজের মা—সেও অনেক দূর।

কেতকী উঠে দাঁড়ালো। জানালায় পর্দার কোণ তুলে বাইরে তাকালো। এখান থেকে প্রসারিত পিচঢালা বড় রাস্তা তেমন দূরে নয়—সামনের কয়েকটা বাড়িতে আড়াল পড়ে যায়। ওদিকে মার্কারি ল্যাম্পের নীলচে আলোর রেশ ভেসে আছে বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে। বিশ্ব কি একটু বেশি দেরি করছে না আজ। প্রায় জানলাতে আলো নিভছে। রাস্তা শূন্য করে উঠে গিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ যুবা তরুণেরা। একটা রিকশা সেই জনশূন্য রাস্তায় ঘন্টা দোলাতে দোলাতে আলগোছা চলে গেলো জানলার নিচে দিয়ে। শব্দটা মিলিয়ে যেতে চারিদিক নিঝুম হয়ে এলো। গলি পথের নিষ্প্রাণ ঘোলাটে আলো আকাশের নীলাভায় বিভোর হয়ে নিঃসাড় পড়ে রইলো।

ঘড়ি দেখার ইচ্ছেয় ঘরের মাঝখানে চলে এলো সে। মুখ ঘোরাতে সেদিন মাত্র যেন ড্রেসিং আয়নায় নিজের পুরো ছবিটা চোখে পড়তে চমকে উঠলো, কেমন যেন

অচেনা কেউ নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা তার ঠোঁটের ভাঁজে স্পষ্ট হয়ে ঝুলে রয়েছে যেন। স্তব্ধ রাত, নিঃসঙ্গতা, শিথিল স্নায়ু তাকে মুহূর্তে অসাড় করে দিল। তবু জোর করে হাসলো নিজের মুখের ওপরেই। —মন্দ না—তাই না। এই কেতকীকে চমৎকার মানিয়ে গেছে। সাহানাদির পার্টিতে কিছু বেমানান হবে না। ব্রতী না বললো,—'কেতকীকে না ডাকলে তোমার পার্টির আর্ধেক গ্লামারই নষ্ট।' আবার হাসলো কেতকী—বাঁ গালে টোল ফেলে আশ্চর্য মুখ আলো করা হাসি ফুটিয়ে তুললো আয়নায়। —মন্দ না—তার ডান হাতে উঠে এলা খালি গলায়। চমৎকার কিন্তু নেকলেসের ছবিটা—। তবে ছিমছাম হাল্কা কিছু, নিভাঁজ কণ্ঠ মুলে বুকের গভীর রেখার সমরেখায়—অন্তত এটুকু না হ'লে পার্টিতে যাওয়া যায় না। আর সবই হয়তো একরকম ম্যানেজ হতে পারে। অপরা, শকুন্তলা, বিশেষ করে সাহানাদির মত পাকা নজরের সামনে নকল গহনায় সাজতে সে মরে যাবে।

ধীর পায়ে বাইরের ঘরে আবার এসে বসল কেতকী। তার-বুকের কাছে অজানা সুরের এক কনসার্ট—বিশ্বর কাছেও শুনেছে—পার্টি যখন চলে তখন নাকি স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী হলে বাজনার ব্যবস্থাও থাকে। সাহানাদির ছেলের জন্মদিনে ওকে যেতে হয়েছিল বনবনকে নিয়ে— সেদিনও সন্ধ্যার জন্মদিনের আসল পার্টির আয়োজন চলছিলো। ছেলের বন্ধুদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল আলাদা একটু। তাড়াহুড়ো করেই ছোটোদের ব্যাপারটা কাঁটছাট হয়ে যায়।

বিশ্ব অবশ্য বলে এসব পার্টি ফার্টি শুধু গুছোবার ধান্দা। স্ত্রীদের বান্ধবীদের নিয়ে হর্তাকর্তারা আসেন—ফূর্তিও করেন—সাথে সাথে কে কতটা ঝোল টানতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতাও চলে। কেউ পড়ে কেউ ওঠে। বিশ্বের মত লোকেদের তদারকি, স্বাচ্ছন্দ্য বিধান—একটু গা ঘষাঘষি। আর তুষ্টিবিধানের প্রতিযোগিতা। —কে জানে সাহানাদির পার্টি—ঠিক কেমন—

বিশ্ব—বিশ্বই ওর একমাত্র ভরসা—নিজের জন্যে সে কতটুকুই বা চেয়েছে—মানুষের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষারও বয়েস আছে—আজ পরলে একটা শাড়ি পাঁচজনে তাকিয়ে দেখবে আর গহনা তার তো নেই-ই বলতে গেলে, একটা নেকলেস—এই কমদামীই—বিশ্ব তাকে না দিলে সে পাবেই বা কোথায়—

উসখুস করে উঠল কেতকী—স্থির হয়ে বসতে পারলো না—খুব কি বেশি চাওয়া—এই সংসারটুকু গড়ে তুলতে কি কম কষ্ট স্বীকার করেছে—তার কতটুকু ভাগ নিয়েছে বিশ্ব। এক একটা জিনিস এসেছে তারই রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে—

বিশ্ব আসুক। তার উজ্জ্বল আবেগের মুখে কেতকী আজ কবুল করিয়ে নেবে—সব দিতে পারার সেই মনকে ছুঁতে পারলে—হয়তো—না বিশ্বকে রাজি হতেই হবে। ব্রতী খেপে খেপে দাম দিচ্ছে—ওর তো হীরের—অঙ্কিতা কি ওর জন্যেও সে রকম একটু কিছু করে দেবে না—! বিশ্ব একটু চেষ্টা করলেই পারবে—এ ক'বছর ধরে মদে কি

তার কম খরচ হয়েছে। কেতকীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার এটুকু করা উচিত—না হয় মদ সে খাবে না—অন্তত যতদিন—

উত্তেজিত কেতকী আবার জানালায় এসে দাঁড়ায়—আবছা আলোয় নির্জন পথ ধরে কেউ একজন হেঁটে আসছে—সামান্য পায়ের শব্দটুকুও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছে কেতকী। লোকটি মাথা তুলে জানালায় তাকাতে কেতকী চমকে উঠল। বিশ্ব নয়ত— কি আশ্চর্য এরকম পায়ে হেঁটে—এভাবে সে ফেরে না তো কখনও—সবাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসে—এক এক জনকে নামাতে নামাতে যায়—তবে কি পকেট খালি করে—

কেতকী দরজা খুলে চৌকাঠে পা রেখে সিঁড়ির দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। বিশ্ব পায়ে পায়ে উঠে আসছে—কোন অসঙ্গতি নেই নিয়মিত শব্দে।

বিশ্ব পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলো। তাকে তেমন আগ্রহ নিয়ে নজরও করলো না। সোফায় বসে পড়ে মন দিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করলো। জামা খুললো, গেঞ্জী খুললো—সটান বাথরুমে ঢুকে গেলো। কেতকী স্তম্ভিত—এমন সব দিনে একাজগুলো সব কেতকীকেই করে দিতে হয়। —কিছুই যেন মিলছে না,—

কফির ধোঁয়ানো পেয়ালা নামিয়ে রাখতে রাখতে লুঙ্গিটা সাপটে নিয়ে বিশ্ব ঘরে এল।

—কফি আনলে—

—চা খেতে নাকি—

—না থাক—

বিশ্ব অন্যমনস্কভাবে কফিতে চুমুক দিল নিঃশব্দে—তারপর নিঃশব্দেই হাসলো—দাঁড়িয়ে আছ কেন বসো—

—এসো বসো—বিশ্ব ডাকল।

পাশে বসতে বাঁহাতে ওকে কাঁধবেড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সেই একই দুর্বোধ্য হাসি হাসলো।

—হাঁ করে কি দেখছ—মদটদ খাইনি—

কেতকী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—তাহ'লে খাবার বাড়ি—বিশ্ব বলল—দাও—

কেতকী টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে। বারবার রান্নাঘরে আসা যাওয়া করছে আর বিশ্ব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেতকীর মুখ শুকনো। তার সযত্ন প্রসাধন বিশ্বর অনাগ্রহী দৃষ্টির তলায় মিইয়ে গিয়েছে। চোখের পাতায় ভারী হয়ে নেমেছে অভিমান, আশঙ্কা। চলাফেরায় অস্বাচ্ছন্দ্য স্পষ্ট—হাত থেকে তরকারির ডিসটা পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল—টেবিলে ডালের বাটিতে হাতা ফসকে খানিকটা ডাল চলকে গেল—

বিশ্ব গভীর ভাবে ভাবছে—খেয়ে যাচ্ছে—যন্ত্রের মত।

মনের উপর এই চাপ কেতকীর অসহ্য লাগছে। এতদিনের চেনাশোনা জীবনযাত্রায় মানুষটির এই অসঙ্গত ব্যবহারের কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না। তার কান্না পেয়ে গেল।

বিশ্ব একবার চোখ তুলে তাকাল--কি হলো—

কেতকী বাঁ হাতের আঙ্গুলে চোখের কোণ মুছে ফেললো। কারো মুখে আর কথা নেই। নিজের থালায় খাবার নাড়াচাড়া করে আর আড়চোখে দেখে কেতকী।

—রান্না ভালো হয়নি—

—কেন—সামলে নিল বিশ্ব। ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল সে। খাচ্ছি তো—

—আজ যেন কোথায় রেখে এসেছো মনটা—

—তোমার জন্যেই তো রেখেছিলাম, খুঁজে পাচ্ছি না, পকেটমার হ'ল না তো—বিশ্ব একটু বেশি জোরেই হেসে ওঠে। হালকা হাওয়াও ক্রমে ভারী হয়ে ওঠে। কথা আর এগোয় না।

একসময় খাওয়া ব্যাপারটা শেষ করে' ফেলতেই হয়। মানসিক চাপে ক্লান্ত তিক্ত কেতকী না বলে পারে না—

—রাত অনেক হলো, আমাকে তো সেই সাত সকালে উঠতেই হবে—

—ঠিকই তো—তুমি শোও গে—

বাইরের ঘরে বিশ্ব সিগারেট টানছে। তার চোখ সামনের ফাঁকা দেওয়ালে স্থির হ'য়ে আটকে আছে। রাগে অভিমানে লম্বা পা ফেলে শোবার ঘরে এসে ঝুপ করে বিছানায় গড়িয়ে গড়ল কেতকী। আর বুক ভাসিয়ে কান্না নামলো চোখে।

রোজকার বিশ্বকে চিনতে না পারায় কষ্টে তার যেন পায়ের তলায় মাটি টলে উঠেছে। নিজের মধ্যে এভাবে গুটিয়ে থাকা তার আরও অসহ্য। কিছু যদি ঘটেই থাকে—তা সে যত নির্লজ্জ হোক না বলে ফেললেই হয়। সে তো আর অবুঝ নয় অযথা সিন ক্রিয়েট না করার মত শালীনতা সহনশীলতা তার যথেষ্ট আছে। বুকের ভিতরটা আরও খাক হয়ে যাচ্ছে সেই প্রত্যাশার ক্ষণটি এমন রূঢ়ভাবে চুরমার হয়ে যেতে। অ্যালার্ম ঘড়ির টিক টিক শব্দ বিশ্বর মাথার মধ্যে ক্রমাগত টোকা দিচ্ছে। ঘুম এসেও আসছে না। গভীর অন্ধকারে পাশেই কেতকীর নিশ্চিন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে বনবনের নিঃশ্বাসের মৃদমন্দ আওয়াজও তার মস্তিষ্কে জানান দিচ্ছে। এতটুকু নড়াচড়া করতে সঙ্কোচ হচ্ছে যদি ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলে।

হঠাৎই অন্ধকার চিরে কেতকীর তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে এল—এত কি ভাবছো, যা হয়েছে বলো না—আমি—আমি ঠিক—যেমন কর্কশ তেমনি ভাঙ্গা তার গলা। কি এমন কথা—যে তাকে বলতে বিশ্বর এত বাধছে? ওরা তো মদ খায়নি, ফুর্তি করতেও যায়নি—অথচ এতরাত অবধি ছিল কোথায়? তাছাড়া এমন সাতরাজ্যের ভাবনা মাথায় নিয়ে কেনই বা স্তব্ধ হয়ে আছে? বিশ্ব যে ঘুমোতে পারছে না এ কি সে বুঝছে না নাকি। বিছানার ওপর গুটিয়ে থাকা বিশ্বর হাতখানায় মুখ চেপে ধরে কেতকী অজানা উদ্বেগে ককিয়ে উঠল—আমাকে বলবে না, বল কি হয়েছে—

বিশ্ব দু'হাত দিয়ে শক্ত হয়ে বাঁধতে চাইল তাকে। তবু কোথায় যেন সূক্ষ্ম ফাঁক দুটি মনের সংযোগের কিনারাটি কিছুতেই ছুঁতে পারছে না।

—তুমি দেখি কান্নাকাটি শুরু করে দিলে—

কান্না উত্তাল হ'ল কেতকীর বুকে।

—আরে না, না—

কি বলবে বিশ্ব—বলতে গিয়েও থেমে গেলো। শিথিল হয়ে এল উষ্ণ রমণী দেহ ঘিরে কঠিন বন্ধন। যেন আছড়ে পড়ল এক সমুদ্র ঢেউ ওদের মাঝখানে। গর্জনে ভাঙ্গছে তীর, উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে—শিকড়—

অনেক অনেক দূর থেকে হাবুডুবু খেতে খেতে বিশ্ব যেন বলতে চাইল—আমরা শেষ হয়ে যাব কেতকী

যেন সে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে—তীরের টান ছেড়ে—আর কূলে ফিরবে না।

—আমাদের ফার্ম এখান থেকে উঠে যাচ্ছে—

ঝড়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যেন প্রাণপণে কিছু বলে চলেছে সে—শুধু অস্পষ্ট কিছু শব্দ—ফেনার মত গড়িয়ে যাচ্ছে—

খোলা বেতের মত শপাং করে উঠে বসল কেতকী। দু'হাতে বিশ্বর দু'কাঁধ চেপে ধরল সর্বশক্তি দিয়ে। বিশ্বের মনে হল তার পা ঠেকেছে নিচের চোরা স্রোতে, একটু একটু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার অসাড় শরীর—ঘুমের মত জড়িয়ে যাচ্ছে শ্বাস ফুরিয়ে আসছে—সে ডুবছে, ডুবছে

বলল—আজ থেকে শুধু দিন গোনা—

কেতকী ফিস ফিস করে বলল—আর বলো না—আমি শুনতে চাইনে—শুনতে চাইনে—

বিশ্ব সহসা রেগে গেল—ন্যাকামি—কঠিন বিদ্রূপের হাসি ঝলসে উঠল ঠোঁটের কোনে, ক্ষোভ ঠেলে উঠতে চাইছে—কান মাথা ভেদ করে বিষ্ফোরণের মত।

—শুনতেই হবে—চেঁচিয়ে উঠল সে—এবার মৃত্যুর শীতলতা যেন এক লহমায় রুখে দিয়েছে—শক্তি ফিরে আসছে মজ্জায়—

—না শুনলেও বা কি—কালই কাগজে বেরিয়ে যাচ্ছে—আচমকা কথা ফুরিয়ে শ্বাস ফুরিয়ে চুপসে গেল—নতুন ডিরেক্টর মিঃ সিংহরায় রিপোর্ট দিয়েছেন আমাদের সংস্থা লাভ দিচ্ছে না—স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

কেতকী এতকাল মাটির মত ভেঙ্গে পড়ল—কি হবে বিশ্ব—কি হবে—আহা আমার বনবন—কিছু কর—কিছু অন্তত কর—

দু'গাল বেয়ে বিরস প্রতীক্ষার প্রসাধন ধুয়ে মুঝে নামছে—গুঁড়িয়ে যাচ্ছে শরীরের সব ছন্দ, সব দুরন্ত রেখা—কেতকীর হৃদপিণ্ড যেন সহসা মুচড়ে ধরেছে কেউ শক্ত মুঠিতে—বিল বিল করে ঘাম জমছে কপালে, মুখে সর্বাঙ্গে—মাথা নেতিয়ে প'ড়েছে—দেহ নিথর।

অন্ধকারে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে বিশ্ব। মৃত্যুর চেয়েও নিষ্প্রাণ ফাঁপা একটা খোলস। আর হাতড়ে মরছে জীবনের সেই বারুদ—বুকের গভীর থেকে কবে যে সেটা খোয়া গেল—

ক্ষত

বড় রাস্তা থেকে ডান হাতে গলিটা দিয়ে মিনিট চার পাঁচ হাঁটলে একটি চৌমাথা। সামনেই এক সার ঝাঁপ বাঁধা দোকান। হঠাৎ দরকারে হাতের কাছে তারই গায়ে গায়ে চা মিষ্টির দোকানটা—নেহাৎই ছোট। বেকার ছেলে ছোকরার সকাল সন্ধ্যা কাটাবার জায়গা। দোকানগুলো বাঁয়ে রেখে যে পথটা উত্তরমুখে বেঁকে গেছে সেটা ধরে এগুলে ভুল হয়ে যাবে বুঝিবা গাঁয়ের পথ। এদিক পানে টিনের চাল, টালির চাল, ছিটে বেড়া, কচ্চিৎ কারো পাকা ভিত—একটাও ছাদ আঁটা বাড়ি নেই। বাস্তুহারা কলোনির আগের চেহারা তখনও রয়ে গেছে। সব বাড়িই ঘন গাছ গাছালির আড়ালে ঢাকা। নারকেল সুপুরি থেকে আম জাম কাঁঠাল কি নেই। বাড়িগুলোর মধ্যে সারাদিন তাই সাঁঝের অন্ধকার। এদিকেই খান কয়েক বাড়ি ছেড়ে এগুলে ফাঁকা জমির মাঝখানে ছোটমতন টিনের চালের বাড়িখানা সহজেই চোখে পড়বে। যে বাড়ির সর্বত্র অনেকদিনের অবহেলার ছাপ, কোমর সমান আগাছার মাঝখানে প্রায় অদৃশ্য সরু পথে দুই একটা ভাঙ্গা ইটের অবশেষ। বারবারান্দায় পুরনো তারের জাল মরচে খাওয়া ঝাঁঝরা। বিবর্ণ, দরজা জানালা ভিতর থেকে এঁটে বন্ধ। ফাঁকা জায়গার এক কোনে ডাঁই করা ইটের থাক। ফাঁক-ফোকরে বড় বড় গাছ। অসম্পূর্ণ ঘরের একখানা পাকা দেওয়াল নেড়া মাথায় আকাশ মুখো হয়ে আছে। সারা গায়ে শ্যাওলা—সবুজে ডোবানো।

বিকালের রোদ গাছপালার মাথায়। নিচে ঝোপঝাড়ে একটু একটু লুকানো আঁধার। ভিতর বাড়ির বারান্দা বেয়ে মুখ তুলছে উঠোন ভরা বুনো লতার চিকন ডগা। থোকা থোকা চোতরা ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গিয়েছে বাতাস। বুনো লতাপাতার বেড়াজালের মধ্যেও টিকে থাকা গন্ধরাজের একটি ডাল বেড়ে উঠেছে—কলমের আমের চারাটিতে নতুন ডালে কটি রঙ্গিন পাতা বিকালের আলোয় ঝলমল করছে। পিঁড়ের ওপর থালা বসিয়ে চাল বাছতে বসেছেন মনোরমা। মাঝে মাঝে মশা তাড়াচ্ছেন আর দু একটা করে কথা বলছেন আপন মনে। অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে একটু পরে পরেই ঘড় ঘড়ে কাশির আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে শ্বাসটানার হাঁসফাঁস।

মনোরমা গলা বাড়িয়ে বললেন—বসবা আইয়া বারান্দায়—দরজা আঁইট্টা শুইয়া আছ—বারাইলে শরীলডা জুড়ায়—

ভিতরে কোন সাড়া নেই। ক্লান্ত গলার তিক্ত সুর টেনে বলেই যান—আর কি হইব—এমনেই দিন আইব যাইব—শোও আর বহ—

কোমরে দুহাত চেপে একবার ঘাড় মাথা সোজা করেন চশমায় আর কিছু দেহি না বিছরাইয়া বিছরাইয়া চোখ ঠিকরাইয়া যায়—কবে লইছিলাম—অহনে কম্মেও নাই ধম্মেও নাই—গভীর অসহয়তায় ডুবে যায় গলা— আর কি হইব—

ভিতর থেকে শ্লেষ্মা জড়ান কাশির জমাট আওয়াজ আসে।

—মশায় ধরছে—লাইট জ্বালাইয়া যাও—চেরা গলায় ডাকেন মহীতোষ। বসা থেকে কষ্টে উঠবার চেষ্টা করতে করতে মনোরমা কাতরে ওঠেন—সামনে অমাবস্যা হইব—কোমর লইয়া বইলে আর খাড়াইতে পারি না—বেলা অহনও যায় নাই—হুদামুদা লাইট জ্বালাইয়া থাকবা—কত কই শরীরডায় হাওয়া বাতাস লাগাইতে। বুকের কষ্টটা কমবে ক্যামনে—বারাইয়া বহনা—সোন্দার হাওয়া দিতাছে—

—চোপাখান থামাইতে জান না—কাশির দমকে ছিটকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো। মনোরমা দেওয়াল ধরে এগোবার চেষ্টা করেন—পা ভারাইয়া গেছে—ওরে মারে—পা টেনে টলমল করতে করতে ঘরে ঢোকেন। সুইচ টেপেন, আলো জ্বলে না বাল্ব কাইটা গেলনি—দেহি অহনে হারিকেনডা কোনখানে—

তয় থাক—মশারি খাটাইয়া দেও—

মনোরমা বক বক করেন— দিনমানেই দরজা জানালা আঁইটা মশারি ঢাইকা শুইয়া শুইয়া—কতকাল চলব—

কাছে এসে মাথায় হাত রাখেন— চিন্তিত মুখে গলায় বুকে হাত চেপে ধরেন—গা জানি ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে— কফও ভারী হইবে—কই কি চল গিয়া ডাক্তার দেহাইয়া আই—

যাইবা তুমি যাও—কফ জড়ানো রুক্ষ গলায় বলেন মহীতোষ—কোমরের বেদনায় ঘুমাইতে পার না—

আর তোমার যে শ্বাস বুঁইজা যায়—

যাউক—একেবারে বুঁইজা যাউক না ক্যান—উত্যক্ত গলা তাঁর। মনোরমা অসহায়ভাবে বলেন—তাইলে তো আমার গিয়া সোনায় সোহাগা—গলায় দড়ি দিয়া ঝুইলা পড়ন বাকি—বেবাক জ্বালা জুড়ায়—

বাইরের কড়া নাড়ার শব্দ, তাকে ছাপিয়ে কিছু কলরব ঘরের ভিতরের নৈঃশব্দ খান খান করে দেয়।

মনোরমা মশারির পাশগুলো তুলে দিতে দিতে গাল পাড়েন—আইছে—বেজম্মা গুলান—জ্বলনের শেষ নাই— এরা আহে নুনের ছিটা দিতে—

ভিতর থেকে ডাক পাড়েন— ক্যা রা নিব্বংশের পোলারা—মরনের আর জায়গা

নাই—এই দুয়ার ছাড়া—দূর হইয়া যা—দূর হ দরজা খুইলা পড়ব—হারামজাদারা—গুতাস, ক্যান—গতরে রঙ্গ ধরে না—

দরজাডা খোলেন জ্যাঠাইমা—শহীদ দিবসের চিঠিখানা লইয়া লন—মনোরমা কপাটের এপাশে কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, গলা দিয়ে শব্দ ফোটে না—তারপরেই তারস্বরে চীৎকার করতে থাকেন—ঝাড়ে মুলে নিম্মুল হইবি—হারামজাদারা তামাশা পাইছস—দূর দূর—আমার দুয়ারে পা দিতে আস্‌স-চোখের চামনাই—তহনে গা বাজাইয়া চলছস—এহন তগো দিন আইছে, দাপাইয়া মাটি ফাঁইড়া ফেল—মোর দুয়ারে খবরদার আসবি না-বাপের দিব্বি—চেঁচিয়ে গলা চিরে যায় মনোরমার। বুক চেপে ধরে মেঝেয় বসে পড়েন—জানালার ফাঁকা গলিয়ে এখানা সাদা খাম নেমে আসে মেঝেয়। তিনি নিঝুম, সম্বিতহারা। মাঝের ঘর থেকে তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠিত গলা ভেসে এল—কি হইল-ক্যাডায় ডাকে—

যম, যম—ভাঙ্গা গলায অস্ফুট উচ্চরণ করেন মনোরমা। বিবশ হাতে বুকের কাপড় তুলে কপাল মুখ মোছেন—ভগবানের বিচার—মানুষের ঘরে সুখের হাট আমার ঘর আন্‌ধার-ঠাকুর কি বিচার করলা—

মহীতোষ হঠাৎ কাশতে শুরু করেন। বিপুল কাশির বেগে শরীরটা দুমড়ে দুমড়ে যেতে থাকে। উঠে আসতে গিয়ে মনোরমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, পড়ে যেতে যেতে দেওয়াল ধরে সামলে নেন—

পাশে বসে মহীতোষের বুকে পিঠে হাত ডলতে ডলতে বলেন—অমুন চিল্লাও ক্যান—শরীলে দেয় না—

হাঁফাতে হাঁফাতে মহীতোষ কেটে কেটে বলেন—শরীরে সব দিতাছে—কি দিতাছে না—

আস্তে আস্তে শুইয়ে দেন মনোরমা। কাশির ধকলে ঘাম জমেছে কপালে গলায়—আঁচল বুলিয়ে মুছে নেন। পাশে বসে থাকেন। দুজনেই মনের অতলে ডুব দিয়েছেন। ঘর জোড়া অন্ধকারে মশার বিন বিন, মাথার কাছে টাইম পিসের টিক টিক ছাড়া অন্য শব্দ নেই। মহীতোষ নিষ্পলক চেয়ে আছেন সামনে গাঢ় অন্ধকারে অনির্দ্দেশ্য কোনখানে। মনোরমার হাতখানি তাঁর বুকের ওপর থেমে আছে। বাইরে অজস্র পাখ পাখালির কলরব। ডানা ঝাপটানি, ডালে ডালে ওড়াউড়ি, চঞ্চলতা বিচিত্র শব্দরঙ্গে ভরিয়ে দিয়েছে দিকবিদিক। শুধু ঘরের মধ্যে সময় ক্রমেই ভারী হয়ে উঠেছে।

এক সময় গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকখালি করে। মনোরমা উঠলেন, মশারি ঠিক করলেন। নিজের চৌকিতে এসে বসলেন—দুখানা হাত জোড়া করে হাতের পাতা দুটো অন্ধকারে মেলে ধরে তাকিয়ে রইলেন—সন্ধ্যার শাঁখের আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে পাড়াময়। বাতাসে সদ্য ফোটা ফুলের মৃদু গন্ধ। আগান বাগানে ছেয়ে ফেলেছে ঘরবার তবু কোন্ অমরি গাছে বুঝি ফুল ফুটেছে। প্রাণ সহজে যায় না তো। তাঁরাও আছেন জীবনের নিয়মে—চলছেন-ফিরছেন। সেই যে মহীতোষ শয্যা

নিলেন-আর উঠে দাঁড়ালেন না। তবু তো তিনি আছেন-তাই মনোরমার এখনও জীবনটা নিয়ে কি হবে ভাববার অবকাশ হয়নি। নিজের জন্যেই তিনি চান মানুষটা উঠে দাঁড়াক—পুরুষ মানুষ সামলে উঠুন—। এই মৃত্যুপুরীতে অর্ধমৃত দুটি মানুষের তৈলহীন শিখার মত নিবু নিবু জীবন নিবেও নেবে না যে—

—বাল্‌বটা কাইটা গেল—আপনমনে বলেন মনোরমা—রাত্তির কালে আর কি করুম—

মহীতোষ সহসা প্রবল কাশির উদ্বেগে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন—

মনোরমা শান্তভাবেই বলেন—ওষুধ দিব—হাঁফি তো কমতাছে না—

মহীতোষ হাত নেড়ে নিরস্ত করেন। কাশতে কাশতে নাক মুখ দিয়ে লালা ঝরে—কাঁপা কাঁপা হাতে রোঁয়াখসা তোয়ালেখানা তুলে মুখ মোছেন—আর হাঁফাতে থাকেন—

মনোরমা বক বক করেন—কোন পাপ করছিলাম—ঠাকুর, আমাগো ক্যান নিলা না— এই বিচার করলা—

মহীতোষ হাঁসফাঁস করতে করতে বলেন—শিগগির—বমি হইয়া যাইব—চোখের জল মোছা হয় না—খাটের নিচের গামলাখানা টেনে বার করে দেন মনোরমা। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ভরে আনেন—

মহীতোষ অনেক কফ উগরে ফেলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। মনোরমা তোয়ালে ভিজিয়ে যত্ন করে মুখ মুছিয়ে দেন, চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়ে হাত বুলিয়ে আনেন, বড্ড ঘামছেন মহীতোষ পাখাটা খোলেন অনেকদিন পর—ধুলো উড়ে উড়ে পড়তে থাকে। বারে বারে ভিজে তোয়ালেতে ঘাম মুছে নেন। এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে উদ্বিগ্ন গলায় বলেন—জিব খান বার কর দেহি ওষুধটুক দিয়া দি—এট্টু সামলাইয়া লও—পরে নে ডাক্তার দেহাইয়া আনি—মহীতোষ হাতের ধাক্কায় ওষুধের পুরিয়া ঠেলে দেন— চোখে মুখে দুঃসহ ক্রোধ—পোড়ার মুখ দেহামুনা কাউরে—দেহুমওনা—

মনোরমা বিমর্ষ গলায় বলেন—মুখ পোড়ছে অগো—আমাগো কি—কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেন—সাইধা মরণ না হইলে এক আন্ধায় আর এক আন্ধারে ধইরাই বাঁচে—ঠাকুরের যেমুন বিচার—

ঘরের ভিতর কঠিন স্তব্ধতা জমাট বাঁধে। মহীতোষ অনেকটা কাবু হয়ে পড়েছেন—একটু বুঝি ঝিমুনীভাব এসেছে। মনোরমা বাইরে উদ্দেশ্যহিন তাকিয়ে আছেন—দুটো একটা জোনাকি জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে জ্বলন্ত কয়েকটা সন্ধানী চোখের মত। একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। বারান্দার বাতিটা ঘিরে অজস্র পোকার টুপটাপ শব্দ।

নিরিবিলি পাড়াটাকে চমকে দিয়ে দূরে কোথাও প্রবল একটা চীৎকার উঠল, গোলমালের মিশ্রিত আওয়াজ। নিজের অজান্তে কেঁপে ওঠেন মনোরমা আবছা আঁধারে নিস্পন্দ মহীতোষের দিকে একবার তাকান। শব্দটা এদিকেই আসছে—এই

পথে। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে যান বারান্দায়—আওয়াজ এখন স্পষ্ট—শহীদ তোমায় ভুলিনি ভুলব না—

কাঁপতে কাঁপতে মনোরমা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েন—এতগুলো বছর গেল তবু এই শব্দ তাঁর কানে সীসা ঢেলে দেয় যেন, বুকখানা ফালা ফালা হয়ে যায়—মহীতোষ চালের নীচে চ্যাটাই-এর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। যেখানে একটা হাঁ হয়ে থাকা ফোকর অন্ধ চোখের ফাঁকা গর্তটার মত প্রকট হয়ে আছে। মিছিল এগিয়ে আসে, পায়ে পায়ে পার হয়ে যায়—দূরে আরও দূরে। দুটি মানুষের বুকে অখন্ড নৈঃশব্দ ভারী পাথরের মত চেপে বসে থাকে। মৃতের মতই পড়ে থাকেন দুইজন—নিথর নিস্পন্দ। মাথার ভিতরে মিছিল ঘুরে ঘুরে মাড়িয়ে যেতে থাকে অনন্ত পথ।

মনোরমা প্রথম উঠে বসেন—তাম্‌শা দেইখা বুক জ্বইলা যায়— হারামজাদারা নাইচা কুঁইদা পাড়া উজাগর দিতাছে—ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার—

—হইছে,বেশী প্যাচাল পাইড়ো না—মহীতোষ কর্কশ ভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন।

—ক্যান থামুম, ক্যান........ উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠেন মনোরমা—আমারে নিলো না ক্যান ঠাকুর—ক্যান নিলো না—কত জ্বলনে জলুম আমি—ও—হো—হো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে। নিরেট অন্ধকারে শুধু দুটি মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস, অস্ফুট কান্না, কাতরতা —এর যেন শেষ নেই। কান্না মুছে মনোরমাকেই উঠতে হয। পাশের ঘরে গিয়ে স্টোভ বার করে তেল ভরেন। খালি বোতলটা রাখতে রাখতে বলেন—কেরাসিন ফুরাইল—কি দিয়া কি রাঁধুম। নিশিপাওয়ার মত খুটখাট নড়াচড়া করেন খানিকক্ষণ। তারপর এ ঘরে আসেন—

—কি রাঁধুম—

—আর রান্ধন লাগব না—দুগা হুড়ুম খামুনে—

—হইছে, রোজ হুড়ুম খাইলে বল হইবে— দুখান গরম রুটি সেঁইকা দিই—দুধে চুবাইয়া খাও, কি ভাজা ভুজি দিয়া খাও—মনোরমা অপেক্ষা করেন। মহীতোষ জবাব দেন না।

—শরীলপাত করতে আছে—আমার কথাডা বেবাক ভুইলা গেলা—কষ্ট তুমার একার—আমার কষ্ট নাই—উদগত অশ্রু কোনমতে ঠেকিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে পাশের ঘরে চলে আসেন। খাদ্যরসিক মানুষ ছিলেন মহীতোষ। গরম গরম রান্না খেতে পছন্দ করতেন। দুবেলা রান্নার পাট ছিল। মনের মত রাঁধতে হত। এখন রান্না বোঝা, বিড়ম্বনা। কোন খাবারেই রুচি নেই। তবু পেট ভরাতে হয়—দুজনকে নিয়েই যে দুজনে বেঁচে আছেন। মরন তো লেখা নেই।

দু মুঠো আটা জলে ফুটিয়ে রেখে রুটি গড়তে বসেছেন মনোরমা। সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজে সচেতন হলেন—

কিডা, ফকিরা আইছস—উঠতে গিয়ে দুহাতে কোমর ধরে বসে পড়েন।

—কোমরডা আমার পইড়া গেলরে ফকিরা—উঠতে বইতে বড় কষ্ট—

—কেরসিন আনছি জ্যাঠাইমা—লাগব—

—পোড়া কপাল—এতক্ষণ কেরাসিন কেরাসিন করতে আছিলাম—

কাইল কিন্তু আইতে পারুম না—কি আনুম কও—

মনোরমা মূহূর্তে কেমন হয়ে গেলেন।

দেহি ডাবাডা ভইরা থুই—

ফকির ঘরে যেতে যেতে বলে—জ্যাঠার ঘরে আলো জ্বালাও নাই—অঃ বালব গেছে—কইবা তো, দেহি বালব এট্রা লইয়াই—রিক্সাখান থুইয়া গেলাম—

মনোরমা বসেই আছেন—হাতের বেলান হাতে—মুখ ফ্যাকাসে—ছাই বর্ণ

—ধ্যান ধইরা বসলা দেহি—ফকির বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়—ওষুধ পত্তর আছে—

মনোরমা জলে ভাসা মুখ তুলে তাকান—ওষুধ তো খাইতেই চায় না রে—চক্ষে ঘুম নাই—একায় আমি কি করুম ক—আইজ বিকাল থেকে শরীল বুঝি ঠিক নাই—

—ডাক্তার লইয়াই—অমলদা জিগাইতেছিল—

ভিতরের ঝিম ধরা অন্ধকার চাবুক খেয়ে নড়ে উঠল—রূঢ় গলায় ধমকে উঠলেন মহীতোষ—তরে সাউগারি করতে হইব না—তর কাম তুই করগা যা—

ফকির নাছোড়—ইডাও মোর কাম— আমারে বেইমান হইতে কন নাকি—

মনোরমা হাত ইশারায় বলেন—তুই থাম—

ফকির বালব লাগিয়ে ঘরে আলো জ্বালতে অমল ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢোকে। ওদের দেখেই মহীতোষ চাদর চাপা দেন মুখের ওপর। অমল পাশে বসে ডাকে—জ্যাঠামশাই—আমাদেরও দ্যাখেন—বিপুলের সাথে আমারে তো আপনারা আলাদা চোখে দ্যাখেন নাই—সে যে আমার ভাই-এর বাড়া—জেঠামশাই—গলা ধরে আসে অমলের।

—ওই সব কথা ছাড়ান দ্যাও—ভাঙ্গা টাটি আর জোড় খায় না—তোমাগো মুখ দ্যাখতে চাই না—যাও—।

ফকির এগিয়ে আসে—ডাক্তারবাবু খাড়াইয়া থাইকা লাভ নাই—আহেন—আমি চাগাইয়া ধরি—আপনে শুধু বুকটা দেইখা দ্যান—বড্ড কষ্ট পাইতাছেন—শরীলে বল নাই—শোকে তাপে পোলাপানের নাহান হইছেন—ওনার কথা লইয়েন না—বলতে বলতে তার শুকনো গলা খর খরিয়ে ওঠে।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন।

গায়ে হাত পড়তে মহীতোষ লাফ দিয়ে উঠে বসেন—ঘেঁটি ছিঁড়া ফালামু তর—বলতে বলতে কাশিতে কান্নায় রুদ্ধশ্বাস মহীতোষ দুহাত সামনে তুলে যেন বাতাস আঁকড়ে ধরতে চান।

মনোরমা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আগলে ধরনে—থাউকগা, জোরাজুরি কইরা কাম নাই—কপালে যা আছে কে খন্ডাইব—

রাত যত বাড়তে থাকে কষ্ট বাড়তে থাকে মহীতোষের। জ্বর বেড়ে যায়। মনোরমা প্রমাদ গোনেন। কাশির দমকে এক একবার মহীতোষের শ্বাসবন্ধ হয়ে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস জমাট বাঁধে, চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চায়। হোমিওপ্যাথিক যে পুরিয়াটা অন্য

সময় দিয়ে থাকেন তাতে তেমন ফল হয় না। রাত জেগে বসে বুকে মালিশ লাগিয়ে হারিকেনের উপর পুটলি গরম করে নুন সেঁক দিতে দিতে ঝিমোন—ভাবেন- ফকিরাকে রাতে থাকতে বললেই হত। জোর করে তিনি যদি ডাক্তার দেখানোর কথাটা বলেতে পারতেন। তিনি তো বুঝেছিলেন মহীতোষের শরীর গতিক ভাল নয়। এ শুধু মনের কষ্ট নয়—আজ তিনি সত্যিই অসুস্থ। এক একবার কাশির দমকের পর যে রকম নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন—হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে নিজেকে তিনি কি বুঝ দেবেন।

মহীতোষ থেকে থেকে কফ জড়ানো গলায় কঁকিয়ে উঠছেন—জ্বলে পুড়ে ছাই হইয়া যায় না ক্যান—প্রাণডা—কত দিগদারি লিখ্যা দিচ্ছিলা বিধি—

মনোরমা ঝিমুতে ঝিমুতে সেঁকের কাপড় পাল্টান—রা করেন না। কথা বলতে ইচ্ছে করে না তাঁর। স্বার্থপব—মানুষটা কত বড স্বার্থপর—নিজেকে নিয়েই আছে নিজের দুঃখটাকেই বড় করে তুলছে। তিনি যে মা সে কথার যেন কোন অর্থই নেই তাঁর কাছে। অথচ তাঁরই জীবন প্রদীপের তেলটুকু নিজেকে নিঃশেষ করেই মনোরমা জুগিয়ে চলেছেন। একচক্ষু হরিণের মত নিজের বুকের অন্ধকারেই বাস করছেন মহীতোষ। সেখানে একা তাঁকে ঘিরে দিনরাত্রি মাস বছর স্তব্ধ হয়ে আছে। আর মনোরমা কাটা ছাগলের মত ছটফটিয়ে বেড়ান বুকের আগুনে জ্বলে পুড়ে জীবনের দিকে পেছন ফেরা মানুষটাকে নেড়ে চেড়ে প্রাণটুকু টিকিয়ে রেখেছেন তিনি। নিজে বেঁচে থাকতে একাজ তো তিনি না করে পারেন না।

শেষ রাতের দিকে ধুঁকতে ধুকতে ক্লান্ত নির্জীব মহীতোষ পাষানের মত পড়ে থাকেন। মনোরমা ধরে খাওয়া কোমর টান করতেই যেন বিছানায়ে এসে গড়িয়ে পড়েন।

অস্পষ্ট গানের সুরে ভোরের ঘুমটুকু ভেঙ্গে যায় মনোরমার। দল বেঁধে গান গেয়ে যাচ্ছে—মিহি সুরটা বড় চেনা মনে হয়—মনে হয় বাইরের ঘরে দুই ভাই গলা মিলিয়ে গাইছে—শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড—

ধড়মড় করে উঠে বসেন মনোরমা। টলতে টলতে গিয়ে জানালাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠেন মহীতোষ—বন্ধ কর—বন্ধ কর, রাস্তায় বারাইয়া গিয়া দ্যাহ—বলিহারি মাইয়া লোকের—

অবোধের মত তাকিয়ে থাকেন মনোরমা কয়েক পলক। সামনে চলেছে সারি বেঁধে সকালের আলোয় ধোয়া শিশুরা-কিশোর কিশোরীরা-আস্তে আস্তে কপাটদুটো টেনে বন্ধ করে দেন।

তারপর ধীর পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে জলের কেটলি চাপিয়ে দেন। গরম হরলিকস দিতে হবে এখন মহীতোষকে। তাতেই হয়ত একটু আরাম পাবেন।

কাজে অকাজে নড়তে চড়তে সকাল গড়িয়ে যায়। মাইকের আওয়াজ আসতে থাকে—ওয়ান, টু, থ্রি ফোর—

বুকের ভিতরে গুরু গুরু করে মনোরমার। দরজা টেনে দিয়ে দুজনে ঘরে বসে থাকেন। নিজের নিজের মধ্যে আবদ্ধ—দুটি পৃথক দ্বীপ। স্লোগান উঠছে থেকে থেকে। ঘোষণা শোনা যাচ্ছে—যে যেখানে আছেন চলে আসুন—এখনই পতাকা উত্তোলন হবে। মালা যারা এনেছেন নাম লিখিয়ে যান—রুদ্ধ দরজা ভেদ করে প্রতিটি শব্দ শলাকার মত বিধেঁ দিচ্ছে কঠিন স্তব্ধতাকে।

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। তীব্র তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল— মাসিমা—

ছুটে এসে দুহাতে গলা জড়িয়ে কোলের উপর মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ল একটি মেয়ে।

—টুলি—ওরে টুলিরে—ক্যান আইছস তুই দগ্ধাইতে—অশ্রুমুখী টুলি—ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে—আজই তো আইলাম—মাসিমা—হাত দিয়ে টুলির মুখ তুলে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মনোরমা—কী সর্বনাশ হইত রে টুলি তর—সেই শত্তুরে কইল—দুইটা দিন যাউক মা—দিনকাল ভাল হউক— এক্কেরে ভাল হইল—টুলিরে—আমাগো লাইগা কান্দনের কেউ নাই—

দম ধরে বসে থাকেন মনোরমা। ফের ডুকরে ওঠেন—জন্তু গুলান ঘরে ঢুইকাই চিল্লায়—বিপুলেরে বার কইরা দে—ভাল হইব না—বিমলরে পড়ার টেবিল থনে উঠাইয়া লইয়া গেল—দুহাত মুচড়াইতে মুচড়াইতে কয়— ক'তোর দাদা কই— আমার কচি পোলাডা—কান্দে—লাগে লাগে ছাইড়া দাও—দাদা কই গেছে জানিনা—কই—যাইব শালায়—নজর রাখছি না—বাড়ি আছিল—সত্য কইরা ক'—ছাইড়া দিমু—

আমারে কয়—এই যে কইয়া ফ্যালেন—পোলায় কই—দ্যাখছেন—এইডা—চাক্কু বার কইরা দেহায়—

হিষ্টিরিয়া রুগীর মত বুক চাপড়াতে থাকেন মনোরমা—জ্বইলা যায় রে বুক জ্বইলা যায়—বিমল রা কাড়ে নাই—ওরা থেঁতলাইয়া ফেলল—কচি শরীলডা—মা মা কইরা কান্দে—আমি আছাড়ি পিছাড়ি খাই—পা জড়াইয়া জড়াইয়া ধরি-ওরে ছাইড়া দেও—ছোট মানুষ—ওরে মাইর না—লাথি খাইছি পইড়া পইড়া তবু ছড়ি নাই। মনোরমা হাঁসফাঁস করেন—এক পাহাড় প্রমাণ দুঃখ এতদিনে তিনি শতধারে মুক্ত করতে চাইছেন পারছেন না—

—ওরা কয় বড় পোলা কই আছে কও—ছাইড়া দিমু—বিমলের তখন কান্দনেরও ক্ষমতা নাই—ধুঁকতাছে-কষে রক্ত গড়াইতে আছে—দুব্বল গলায় কইল—মিছা কথা মা— বিশ্বাস লইওনা—বলতে না বলতে বিমলের গলার নলিডা কচ্ কইরা ফাঁইড়া দিল-আমার নাকে মুখে রক্ত ছুইটা লাগল—দুই হাতে মুখ ঢাকেন মনোরমা।—

—ওরে কেউ আহে নাইরে—সেদিন—

মহীতোষ পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। চোখ দুটো জোর করে বোঁজানো।

—তখনও যদি মান্‌সে আউগাইত—রে টুলি—

দুহাতে মাথা চেপে বসে থাকে টুলি—সেদিনের কথা তো তারও ভোলার নয়।

তারও বুকের ভিতর একই আগুনের স্রোত। মনে মনে বলে—সবাই এসেছিল মাসিমা— ঘরের দরজার পাশে পাশে বুক দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল—তুমি তার ছায়া মাত্র দেখনি—

মনোরমা চীৎকার করে ডুকরে ওঠেন—ওরা চইলা যায়—বিমলের বুকের পরে আমি পইড়া আছি—নিব্বংশের পোলারা ফের ঘুইরা আইল—কেমনে জানল কিকইরা কই—ঘরে ঢুইকা চালের চ্যাটাই ফাঁসাইয়া তারে টাইনা নামাইল—ছ্যাঁদা দেখছসনি—ওই—ওর বাপে লম্ফ দিয়া গিয়া জাপ্টাইয়া ধরল—ওরা কথা কয় নাই—মাথা পেঁচইয়া ধইরা—আর কইতে পারিনা রে—হুঁ হুঁ করে কাঁদেন—বুক চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়েন ভগবান—ভগবান—

বাপে ছেলেয় গড়াগড়ি পইড়া রইল—সন্ধ্যা হইল, রাইত হইল—আবার সকাল হইল—কখন পুলিশে আইসা লাশ লইয়া গেল—কি হইল—কিছুই জানি না—দিন কেমনে যায়, রাত কেমনে আসে—শোধ নাই বোধ নাই— এক ওই ছ্যামড়া রিক্সাওয়ালা ফকিরা সেই আইয়া বইয়া থাকে—

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গায়ে মাথায় হাত বুলায় টুলি—তরে রক্ষা দিয়া গেছে রে মা—তোর মায় ভাল ঘরে বিয়া দিছে—তার হাউস মিটছে—

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে টুলির গায়ে মাথায় হাত বুলান মনোরমা। তার সিঁদুর চর্চিত মুখখানার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—

ওরে বুক জ্বইলা যায়, খাক্ হইয়া যায়—মনোরমা সহসা চিকুর দিয়ে ওঠেন। অহনে মান্যে ধাইয়া আসে—মান্যে আমাগো কাম কি—মান্ষেরও কাম নাই আমাগো লগে—দেখন হাসি ঘর ভরইনা মান্যেরে আমি দি'ই দূর কইরা—ধম্ম দ্যাখতে আছে নাহি সব—চোখ জ্বলে মনোরমার।

দুহাতের বাঁধন আরও শক্ত করে কোলের ভিতর মুখ গুঁজে গুমরে ওঠে টুলি—কেউ য্যান কইতে পারে নাই মাসিমা—সেদিন কি দিন—পাড়া ঘিরা বাড়ি বাড়ি হানা দিত্যাছে তারা—পুলিশ খাড়াইয়া আছে মোড়ে মোড়ে—পলাইবে কই—বুড়োবুড়ি কচিকাঁচা কেউ পার পায় নাই, ঘরে ঘরে কান্নার রোল ভইরা গ্যাছে—কিডা দ্যাহে কারে—একা কি তোমার পোলা—আরও পোলায় খুন হইছে সেদিন—

কিছুক্ষণের জন্য গুম হয়ে থাকে সে—তুমি কি জান জানি না—আমি জানি সবাই কইছিল—পাড়া থিকা ভাইগা যা—সে কয়—মরি মরুম—পাড়ার মান্ষের লগেই থাকুম—তারে যে বাঁচাইতে পারি নাই— দুঃখ আমাগো নাই— সেই জ্বালাই। টুলির মা চোখের জলে ভাসেন—টুলির তো সর্বনাশ হইল—বিপুল যদি বা নিত তুমি নিতা না ওরে—সাইধা পোলাডায় বিয়া করতে চাইল তাই—এরে তুমি হাউসের বিয়া কও দিদি—

মাইকে তখন গান ভেসে আসছে—'সে আমার রক্তে ধোওয়া দিন'—টুলি ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়—আমি যাই মাসিমা—পা বাড়িয়েও থেমে যায়—আপনিও আসেন মাসিমা-হাত ধরে টানে টুলি—কাইন্দা ভিজাইলে কার কি—শোধ নিব শোধ।

দুই সীমানা

কি করে যে দিন কাটছে কাউকে বলার নয়। ভুক্তোভোগী ছাড়া কে আর বুঝবে। বিয়ের সময় কারো কারো চোখ টাটিয়ে ছিল — চাকরে বৌ তায় বরুণা সুশ্রী। মন্দ দেয়- থোযনি তাকে। শেষে মায়ের আঁচল ছেড়ে একটি নীড়ে দুজন মুখোমুখি হতে সুখ দুঃখের আঁচড় কামড়ের সাথে মলয় পবনের কুহুকুজন ঋতু বদলের মত পালা করে এলো গেল। স্থায়ী হয়ে এলো একটাই সে খরা। চাকরে বৌ-এব সুখ টের পেতে দেরি হল না।

ভোর রাতে অ্যালার্মের চড় চড়ে আওয়াজে রোজ মনে হয় দব দূর, এ বাড়িতে মানুষ থাকে। কানে বালিশ চাপা দিই। সেই সাড়ে পাঁচটাযই এক কাপ ধূমায়িত চা এসে ঠক করে জানান দেয় সময় নেই, সময় নেই। রান্না ঘরের সুর বেসুর লহরী কানের কাছে ঝাঁঝর বাজায়। তারপর পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে প্রবেশ ঘটে বরুণার।

- চা জুড়িয়ে গেল — এই যে শুনছ —

শুয়ে শুয়ে চা হাতে শুনে যেতে হবে — বাকি দিনের কাজের ফরমাস। পাউডার কৌটো চাপা বাজারের ফর্দ, রান্না ঘরে চাল মাপা, ডাল প্রেসারে —

ক্ষণপরেই বাইরের দরজায় শব্দ। ব্যস —

দুটি খুদে মানুষের বিছানা জুড়ে দাপাদাপিতে দুচোখ মুছে উঠি। কোনমতে বিছানা বালিশ সামলে সুমলে নামিয়ে আনি। দাড়ি কামাতে বসে — ছোট মেয়ের চিল চিৎকার — বাবা ভাত উগলে গেল — শিগ্‌গির —

মায়ের মতই তরাসী হয়েছেন — সবে নার্সারিতে আঁক বোলাচ্ছেন। চমকে গিয়ে গাল কেটে রক্ত — মুছবারও সময় নেই — এবার বাজার।

শেষে তিনজনে নাকে মুখে গুঁজে গুঁজিয়ে, টাই বুট বেঁধে বাঁধিযে ছুট ছুট। দুজনের দুই স্কুল। মেয়েটাকে বরুণা নিতে পারত, তবে সে যে অনামা।

এমন প্রাণপাতের পর রাতে বাড়ি ফিরেও কি ছাই স্বস্তি মেলে —

— এক কাঁড়ি বাসন করেছ — নিজেকে তো নড়তে চড়তে হয় না — রান্নাঘর থেকেই হাঁকপাক শুরু। আবার সেই ঠক্ করে চায়ের কাপ। দোকানের ভাজাভুজি —

— বাবাঃ একহাতে মানুষ কত পারে —

— ঠিকেয় তো তোমার পোষাবে না — বিরক্তি চাপতে পারি না।

— ঠিকে কি করবে — শেষ রাতে আসবে —

— বিকেলে এসে তো —

— ব'লো না — দুই মুর্তিমানকে আনতে আনতেই বিকেল কাবার —

— স্কুল বাসও তো রাখবে না —

— সেই সন্ধ্যে করে পৌঁছবে। এসেই ঢুলতে ঢুলতে বিছানা, লেখাপড়া আর করবে কখন ?

যা বলব সবেরই চটজলদি প্রতি উত্তর। সারাক্ষণের কাজের লোকের চেষ্টায় আছি প্রায় বছর ঘুরতে গেল। হুট বলতে কি আর লোক মেলে আজকাল। দু একটা যাও এসেছিল — দু-দশদিনের বেশী চলেনি।

— এবার হেড বেয়ারা মদনকে বলেছি —

— হ্যাঃ, তুমি আর পেরেছ — সেবারে কে যেন —

— সে তো তোমার জবার মা এনেছিল —

— জবার মা হবে কেন ? তোমার সেই বন্ধুর স্ত্রী

— আর তুমি যাকে এনেছিলে ?

— সে তো আমায় ইন্দিরাদি বললেন — নিয়ে দেখতে পার —যাই বল, শোভা কিন্তু যেমন ফিটফাট তেমনি কাজের ছিল — বারমাস নাক টানে — তোমার ঘেন্না, তাও ছাড়াতাম না — কি করব — বিয়ে বললে তো আটকানো যায় না —

— আর সে মুখে মুখে কথা বলত —

— কি যুগ পড়েছে, বলবে না —

কি আর বলব — আমরা সবাই তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, তবে মার্জিত রুচির দোহাই দিয়ে অনেক স্পষ্ট কথা আমরা মনে মনে গিলে যাই — কিনা —

এমনি করে দুজনে দুমুখো চলতে চলতেও আমাদের সন্ধি হয় — স্থায়ী হয় না। কোন এক পক্ষ তা ভাঙ্গবেই। ছেলেমেয়ে দুটিতেও কম ইন্ধন জোগায় না। আঙ্গুল উচিয়ে পনিটেল দুলিয়ে শাসিয়ে যায় মেয়ে — মাকে বকেছ — হজম করতে হয়।

বড়দার চিঠি এল। আসবার কথাই ছিল। লিখেছেন, মা যাচ্ছেন — ছানিটা ভাল জায়গা থেকে কাটিয়ে দিও। চিঠিখানা জেটের বেগে কাঁধে ঠোক্কর খেয়ে কোলে এসে পড়ল।

— আমি ছুটি ফুটি নিতে পারব না — স্কুল ফাইন্যালের সিট পড়বে স্কুলে আমি ইনচার্জ — রাগে ক্ষোভে জল এসেছে বরুণার চোখে। আমারই নিন্দে করবে সবাই শাশুড়িকে দেখল না —

যথারীতি থালা বাসনে, কড়ায়ে খুন্তিতে দক্ষযজ্ঞের আওয়াজ। তারই নিচে চাপা ক্রুদ্ধ রুদ্ধ গায়ের ঝাল ঝাড়া।

মার জন্যে যদি কিছু করতে হয় তবে সকলের আগে জরুরী ঘর শান্ত করা।

মরিয়া হয়ে দুরচারজন চেনা জানাকেও ছুঁয়ে দেখলাম। বেশী আর বলতেও ভরসা হল নাক। কেমন করে বুঝি চাউর হয়ে গেছে। দেখা হলেই প্রথম আলাপ— আর

ভাই যা দিনকাল—অতিষ্ঠ করে মারলে কাজের লোক, আর কাজের লোক—

চোখ বড় বড় করে ঢোক গিলতে হয়।

—বললে বিশ্বাস যাবে না।—গাঁয়ের লোক নাকি আজকাল আর শহরে আসছে না পরের বাড়ির কাজে তাদের মান থাকছে না।

কার্যকারণ ধরতে চাইনে—এড়িতে যাবার ইচ্ছেয় বরুণার জবাবটাই লাগিয়ে দিই—তবে যে ট্রেন ভর্তি করে শয়ে শয়ে মেয়েছেলে রোজ সহরে এসে নামছে—

—তা বটে —তবে তুমি জেনে রেখ ওদের দিয়ে আমাদের মত ঘরে চলে না—

এ শহরে কোথাও দুজনে দাড়িয়ে পড়লে আরও দু-একজন দাঁড়িয়ে যাবেই। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কথার খেই খুলতে খুলতে কোথায় শেষ হবে কেউ জানে না। এক সময় টুক করে সরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

মন্ত্রপুতঃ সাপের মত মাথা নুইয়ে ফনা চুপসে নিত্যকর্মে জুড়ে দিনাতিপাত চলছে। কোথাও আশার রেশ নেই। একই জ্ঞানবৃক্ষের ফল বরুণাও আস্বাদ করে থাকবে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের সাথে—আক্ষেপের ঢল—মরেও শান্তি নেই—তিনি এলেন চা দাও, জল দাও, আমি যে এলাম আর সংসারে জুতে গেলাম—হাত মুখ ধোবারও ফুরসুৎ পাইনে—ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে একদিন চলে যাব—নিজে করে দেখুক—

মাকে আনতে যাচ্ছি স্টেশনে—রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে মদনের সামনে দাঁড়াই— সে বেচারাও থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়—

মনে আছে তো, বাবু—তবে যাকে তাকে তো ঘরে তুলে দিতে পারিনে—চোর না ছ্যাঁচড়—

একটু যেন ঘাড় টান করে বলে—এখন বুঝলেন না—গাঁয়ে অভাবী মানুষ নেই যে তা নয়—তবে আগে সোম বচ্ছরে তিনচার মাস কাজ পেত—আজকাল ছ'মাস আটমাস কাজ তো জোটেই—ঘর ছেড়ে এখানে—মানে জেলখানা—তাদের কাছে—থেমে গিয়ে ঢোক গিলে বলে—আমি খোঁজে—ভাববেন না—

কানে তখন বেজে চলেছে—আঁশ,নিরামিষ—দু'দন্ড কি দাঁড়াতে বসতে পাব—নাতিনাতনির কষ্ট সয় না—ছুটে যাবেন আগলাতে, ছেলের এটা সেটা খাওয়ার শখ কানা চোখেই বসে যাবেন—কুটনো কুটতে—রাঁধতে—তখন সবেতেই লোকে বউ-এরই দোষ দেখবে—

মা এসেছেন বেশ কিছুদিন, ডাক্তার দেখাতেও ভরসা পাচ্ছি না। হতাশ হয়ে পড়েছি। ছুটির দিনে বেলায় চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কাগজ খানা উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। ছেলে মেয়েরা বই পত্র নিয়ে বসেছে। দরজায় কড়া নড়ে উঠল। উঠব উঠব ভাবতে ভাবতে—ছুটে এসে বরুণা খিঁচিয়ে উঠল—কি কর—দরজাটা খুলে দুধটা ধরতে পার না—নিচে রেখে চলে যাবে কেউ তুলে নিলেই হল—বুড়ো মানুষকে সারাটা দিন—

সামনে কাকে দেখে থেমে গেল।

উৎসুক হয়ে মুখ তুলে দেখি, মদন—

কাগজ ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠি এস, এস—আরে এই সকালে—

—কথা যখন দিয়ে ফেলেছি—পিছনে ফিরে বলে—আয় আয়—

একটি তরুণের পিছনের এক মাঝবয়সী গ্রাম্য মহিলা ভিতরে এসে দাঁড়ায়।

—এই নিরাপদর মা—আপনার এখেনে নিয়ে এলাম—একটু বেকায়দায় পড়েছে —নইলে—

মহিলা এগিয়ে এসে দুহাত তুলে নমস্কার করল অবশ্যই ঘাড় বেশ ঝুঁকিয়ে।

—আজ্ঞে এট্টু না বাবা। বড্ড বেকায়দায়—নয়ত আমাদের মা ব্যাটায় কোন ঝামেলিই ছিলনি—তা ঠাকুর মশায় বললেন— চল, ভাল চিনাশুনা জায়গা—আমরা ওনাদের পেরজা ছিলাম কিনা—

মদন হেঁকে বলে —গল্পের ঝুলি আর খুলোনি— এই নিয়ে পয়সাকড়ির কথা কি বলবি বলে কয়ে ঠিক করে নে—নিরাপদ মুখ নিচু করে দাড়িয়েছিল —একবার চোখ তুলে তাকাল—

—হ্যাঁ বাবা, এই বয়সে মাকে কাজে পাঠালে—মাতা ঠাকুরানী আমার কখন এসে দাঁড়িয়েছেন—

—কি করি মা—সেই নজ্জায় মুখ তুলে চাইছে না— ব্যাটার আমার কুনো ঘাট নেই—এ হ'লো গে আমার কম্মের ভোগ—

আসুন মা—দেখি এদের একটু জলখাবার পাঠিয়ে দিই—বরুণা মাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

—তুমিও যাও না— মদন হাত নেড়ে নিরের মাকে ইশারা করে।

এই যাই—তবে বাবা বিপদে পড়েছি বলেই না—পোয়াতি মেয়ে থুয়ে গেল জামাই —কোলে কাঁখে আরও দুটি—এখন বলছে মেয়ে নেবে না—

—থামো না মা—এই প্রথম নিরাপদ কথা বলল।

—কথাডা শেষ করেনি—একলা ব্যাটা আমার কত করবে—তার তো খাটতে খাটতে মুখে অক্ত উঠে যায়—তবে জামাইরে 'আমি ছাড়বনি—নেবে না বললে হবে—নগদে ছশো টাকা, ঘড়ি, সাইকেল, থালবাসন কম দিইছি—

চা জলখাবার নিয়ে বরুণা দরজায় এসে দাঁড়াতে নিরের মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরল—আই গো—আমি দিচে দি—দাও—

—তুমি ভিতরে যাও, মা তোমার জলখাবার নিয়ে বসে আছেন।

—দূর দূর মোর আবার জলখাবার—

—যাওনা ভিতরে—মদন তাড়া দেয়—

যাই গো যাই—তবে বাবা বিবেচনা রাখবেন—মোদের বড় বিপদ।

বাড়ি আগে এক রকমের সরগরম ছিল এখন হল আর এক রকম। কাজের সাথে, সামনেই খই ফোটে নিরের মার মুখে। ছেলেমেয়ে দুটো আর মায়ের সাথেই জমেছে বেশী। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায় বরুণা—বাবা তোমার বকবকানি শুনতে শুনতে হয় ডাল ধরে যাবে নয় তরকারি নুনে পুড়বে—এতও পার তুমি—

—হ্যাঁ গো মা—পোড়া মন বড্ড ভুলে যাই—তা সোনা বাবুর খাবারে আজ আর পাউরুটি দিওনি তো—কাল নাপিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন, খুকুদিদির ফোরগে কোথা ছিঁড়ে গেছে জুড়ে দিয়েছ তো ;—নযত সে ইস্কুলে যাবেনি—

—শাশুড়ির শাশুড়ি কি এক চিজ জোগাড় করেছ না—মুখ ভেংচে হাসি আড়াল দেওয়া বরুণার। বুঝেও না বোঝার মত বোকা মুখ করে অনুনয়ের সুরে বলি—এখন তো চালিয়ে নাও—কি আর করবে—

—তা মানুষটা বেআক্কেলে নয়—ঘরে নাতি নাতনি রেখে এসেছে—মনটা নরম—যেভাবে ওদের সমলায়—এবার বরুণা সত্যিই হাসে।

রাত্রে মার ঘর থেকে কথাবার্তার টুকরো টাকরা ঠিকরে আসে—জামাই এমন পাষন্ড ছেলনি মা—প্যাখনা গজিয়েছে

—ঝ্যাটা মেরে ভুত ঝাড়িয়ে দেব একবারে—দেখবে—

—মোর ব্যাটার কথা কি বলব—দুঃখের কপাল—ব্যাটা আমার পড়ত ভাল —বড় ইস্কুলে পডা করছিল—বাপ জমি জমি করে বেঘোরে পেরানডা দিল— ছেলের পড়া ঘুচিয়ে এনে জমি খানে বসালাম—নয় জমি থাকে না তা—সে জমিও রইলনি, পড়াও হ'লনি—ব্যাটার আমার পরাণে সেই এক দুঃখ। তবে কিনা পাঁচজনে তারে বড় ভালবাসে—

—ঝাই বলো মা গাঁয়ে যদি তুমি এখন এসনি—সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে, ফুটো চালা, কাঁথাকানি নে নেবড়ে জেবড়ে খেক্কুরে দুঃখী মানুষ খুঁজতে হবে—জমি পেছে কাজ পেছে—ঘর সারাই দিচ্ছে—ব্যাবুস্থা এখুন ঢের ভাল—

—ঝামেলা এট্র আধটু আছে—সে আর হবে নি—তেনারা মনিব ছেলেন না—বুকে হাঁটু দে পেটের ভাতও উগলে নেছেন—আমার ব্যাটার বাপ তো উঁয়াদের হাতেই ম'লো—

—তেনারা সমঝাবেন—এই তুমি বুঝলে মা— তক্কে তক্কে আছেন—

মার বড় ছেলে এস ডি ও, গ্রামগঞ্জের আধুনিক খবরাখবর তাঁরও গোচরে আছে—এসব আলাপে তাঁর অংশটুকু ঘর পেরুতে পায়না স্বভাব শান্ত গলার স্বরে অপর জনের কণ্ঠ ঘর বারান্দায় ধাক্কা খেয়ে ফেরে। শহুরে মানুষের পোষাকী গলা তো নয়।

মার চোখ দেখানো, অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে। ভোটের হৈ হল্লা পাড়ায় পাড়ায় মহরমের দুল দুলের মত হেঁকে হেঁকে ছুটছে—ভারী উৎসাহ নিরের মার। বাচ্চাদের সাথে সাথে সেও ছুটে ছুটে আসে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দূরের রাস্তায় তাকিয়ে থাকে। কখনও কখনও বেশ মনমরা হয়ে যায়—

—এই পাড়াটা ঝানি কেমুন—শুদু হাতের ছাপ—আর কুনো দল বলতি নেই—

—কোন দল গো সোনাদিদি—পদ্মফুল—খুকু বলে। "আম আসছেন আজা হয়ে পদ্মফুল চড়ে, সীতা আনী লুকিয়ে থাকা, খোকা নেবেন কেড়ে"—সুর করে ছড়া কাটে নিরের মা—

—হুই--চলে যাচ্ছে লাল ঝান্ডা— ইদিকে পানে তো ঘোবে না—

—ভোট এসে গেল না গো মা—কবে ভোট—উদগ্রীব হয়ে ওঠে নিবেব মা—গাঁযের দিকে এখন মিটিন মিছিল—কত্ত হই চই—

কযেকদিন যেতে না যেতেই নিবাপদ খবব পাঠায মাকে নিযে যাবে। আমাদেব মাথায বাজ।

— যাব ভোট দিতে—ফেব এসব—

বললাম মাব অপাবেশন—তুমি যাবে—

ভোটটা তো দিতে হবে, না বাবা—

—ভোট দিযে তো ভাবী হয—এতকাল ধরে যে ভোট দিচ্ছ কি হল—আমি যা ছিলাম তাই আছি—তুমিও যা ছিলে তাই আছ—নয—একটু বিবতি দিযে বলি গবিবেব নেতাবা গবিবেব কথা ভাবে? এক ফিকিব কি কবে পকেট ভাবী হয— যাবা কামাবাব তাবা কিন্তু দুহাতে কামিযে যাচ্ছে গবিবেব টাকায বাড়ি গাড়ি হাঁকাচ্ছে—শোননি যে যায লঙ্কায সে হয বাবণ।

--তা বলে ভোট দুবনি—অবাক হয়ে যায নিবেব মা—

- ভোট দেবে দাও, তবে বুঝে শুনে—এই তো দেখছ—জিনিসপত্রেব দাম কোথায চড়েছে—কেবসিনের লাইনে দিন কাবাব হযে যাচ্ছে, কি লোডশেডিং—ছেলেপুলেব লেখাপড়া ডকে উঠেছে—বিপদে আপদে একটা টেলিফোন--তা লাইন পাবাব জো আছে -আবাব দুটো টাকা বেশী ফেল দেখ সব আছে—কিছুব অভাব নেই—আইন কানুনেব বালাই আছে নাকি কোথাও—

হাতেব কাজ ফেলে হাঁ কবে তাকিযে থাকে নিবের মা ভাবি এবাব বুড়িকে কাত করা যাবে—

—গাঁযেব অবস্থা তো শুনি আবও খাবাপ—এখানে পযসা ফেললে যাওকিছু মেলে সেখানে সবই অমিল।

নিরের মা ভাবে— কথা সব মিছে না— বাতি জ্বলে না। কেরোসিন মেলে না। সরষেব তেলেব দুনো দাম--তাতো কষ্ট ঠিকই—কিন্তু গাঁযে লোকের আব কি— তারা কি ঘরে ঘরে রাতভোর বাতি জ্বালায। কেরসিনের কুপি উনুন ধরায় সন্ধ্যে দেয ব্যাস। হালে সেই যে হুজুগ নেগেছে বুড়ো বুড়িদেব পডাব নেগে তারা কখন দাগা বুলোবে—এট্টা হারিকেন এক উঠোনে দশজনে বসে যায—। রাঁধা বাড়াও ভাবি, একপলা তেলের পরে এককড়া সেদ্ধ মেদ্ধ নামিযে নেওযা—মাছ আর কেবা পায কালেভদ্রে খাল বিল ছেঁচা—নিরেব মা কি বলবে ভেবে পায না।

—আমি ভোট টোট দিই না— কাকে দেব? তেমন মানুষ কোথায়? জনগণ জনগণ করে চেঁচিয়ে ম'রিস—আরে জনগণের জন্য কিছু করে দেখা—যত ঠগ জোচ্চোব ধাপ্পাবাজে ছেয়ে গেছে—বুকের পাটাওয়ালা লোক একজনই ছিল—করে দেখিয়ে গেছে—বুঝলে কিছু হবে না এদেশের—বকুনি ঝেড়ে, মানছি না মানব না ক'রে চিল্লিয়ে কি দেশ চালানো যায—

নিরের মা বিস্ময় সামলে কাজে হাত লাগায় বরুণার ঝংকার তাকে সচকিত করেছে। ভাবি মনে কি ধরেনি কথাগুলো।

নিরাপদ এসে মাকে নিয়ে গেল। বলে গেছে ভোটের পরদিন হয়ত পারব না— তার পরদিন নিজে না পারলেও মদনের সাথে পৌঁছে যাবে তার মা। ভোটের পরেই মার অপারেশনের দিন স্থির হয়ে আছে।

ভোট হয়ে গেল শান্তিতেই। রাজীব গান্ধী খুন হলেন। সেই মর্মান্তিক শোকের ঝঞ্ঝাটও মিটে গেল। নিরের মা এল না। অপারেশন বন্ধ থাকতে পারে না। তখন আর কার দোষ কে দেখে। নাজেহালের এক শেষ। টাকার শ্রাদ্ধ। নার্সিংহোমে রেখে রেখে শেষে ঘরে নিয়ে এলাম মাকে। একজন আয়াও আনতে হল। নিরের মার খোঁজ আর কি নেব—শুনলাম মদনও আসছে না অফিসে চিঠি এসেছে তার ঘর পুড়ে গেছে—সে আর তার বৌ হাসপাতালে। মদনের জন্য নিরের মার না আসার কোন কারণ নেই।

এ বিষয়ে আমরা দুজনেই এখন একমত—নিরের মার মত ধড়েল নেমকহারাম লোক আর দুটি নেই। নিজের দুঃখের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে সে আমাদের কাবু করে না ফেললে ওই বয়সের নিড়বিড়ে এক বুড়িকে তারা হয়ত রাখতই না। শেষে কিনা এভাবে দায়ে মজিয়ে সে বেপাত্তা হয়ে গেল। নিকৃষ্টতম গালাগালিও অপ্রতুল মনে হল। আবার মদনকেও একহাত নিতে ছাড়লাম না—চেনা জানা হেনতেন বলে লোকটা এমন কান্ডজ্ঞানহীন একটা লোককে গছিয়ে গেল। বেকুফ কোথাকার—

বরুণার নাস্তানাবুদ অবস্থা—ছেলেদের আনার ভারও এখন আমার। সব ফেলে তাই সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি। এদিকে মদনের জন্যে অফিসে আমার কি যে খোয়ার চলেছে—একটা রেকর্ড যদি কেউ খুঁজে দিতে পারে। রোজই হেঁচে কেশে, ধূলোর ভূত হয়েও যদি কিছু হত। ক্ষিপ্ত মেজাজ নিয়ে বসে আছি। ভিতরে উল্লাসিত হুড়োহুড়ির আওয়াজ পাচ্ছি, উঠে গিয়ে আপদ দুটোকে কিছু বলি সে উৎসাহ নেই।

চা নিয়ে এল নিরের মা—তার গলায় মালার মত ময়লা দড়ি ঝুলছে একটা হাত মোটা কাপড়ে জড়ানো।

—এসে তো খুব উপকার করলে—তিক্ততা লুকোবার চেষ্টা করি না—মার জন্য তোমায় আনা—তা সে হাঙ্গামা সবই আমরা পোয়ালাম, বাচ্চা দুটো সময়ে দুটো খেতে পর্যন্ত পেল না। তবু আয়াকে ছেড়ে দেওয়া যাবে ভেবে তখনকার মত স্বস্তি পেলাম।

—কথাডা তো ঠিক বলিছেন—কিন্তু আসতে পারলামনি— ঘরে আগুন লাগল, ব্যাটারে ধরে নিয়ে গেল—

ঘরে আগুন শুনেই মাথায় আগুন জ্বলে গেল।

—আগুন—হুঁ দেশশুদ্ধ সবার ঘরেই আগুন লেগেছে, তোমার, মদনের—যাও দেখি এখন যাও—

আপনমনেই গজ গজ করি—ধরে নিয়ে গেছে, যাবেই তো, গাঁয়ের মানুষ কি আর সিদে সরল আছে—এই সবই তো চলছে সবখানে—কেবল দলবাজি, আর ঘোঁট

পাকান—শান্তিতে লোকে থাকবে কি—দাদাদের ট্যাঁক না ভরালে—গাঁ ছাড়া করে ছাড়বে—

কখন এলে—বরুণার গলায় খুশির রেশ্, ছেলেমেয়ে দুটো দৌড়ে এসে নিরের মার হাত ধরে ঝুলে পড়েছে—

ব্যথা, ব্যথা অমন ক'রোনি বাবারা— কাতরে ওঠে নিরের মা—

খানায় টানায় পড়েছিলে নাকি—না, গো মা—

বুড়ি আর কি বলবে। এই আমায় বলল আগুন লেগেছে, এখন বরুণার কাছে খানায় পড়বে, মার কাছে হয়ত আর এক অছিলা জুড়বে—কম ধড়িবাজ বুড়ি—

বললাম—থাক থাক—ওসব সাতকাহন আর শুনতে হবে না। নিরের মা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বরুণা মুখ ঘুরিয়ে বলল—আহা, কথার কি ছিরি— নিশ্চয়ই বেচারার কিছু হয়েছে— মুখ দেখলেই বোঝা যায়—চোখ কোথায় আছে তোমার?

কেবল তোমারই দিকে—গায়ে জ্বালা। রাগ ক'রেই বললাম— হেনতেন মিথ্যের ঝুড়ি শুনে মাথায় রক্ত চ'ড়ে যায় বুঝলে। মদন ব্যাটা আজও আসেনি—আমাকে যে কি সামলাতে হচ্ছে—

বরুণা কথাটা শেষ করার অপেক্ষা করল না। আগেই একদিন এইনিয়ে খুব খনিকটা বিষোদগার করেছি তাই দ্বিতীয় সুযোগ দিল না।

রাতে মায়ের ঘরের মেঝেয় গোটানো বিছানাটা ছড়িয়ে পাততে বসলে মা জিজ্ঞাসা করল— তোমার কি হয়েছিল নিরের মা—

বুড়ি নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

আমি তো ভেবে মরি— মানুষটা সে এমনতর নয়'ক—

বুড়ির অভিমান উথলে ওঠে—কেমুন মানুষ গো মা তুমরা—আমাদের গেরামের খপরের কাগজে সব খপর দিল,ছবি ছাপা হ'ল আর তুমরা কিছু জানলেনি।এখেনের খপরের কাগজে আমাদের কুনো কথা লিখলোনি—

মার এখনও চশমা বদলানো হয়নি—অপারেশনের চোখে ঘষা কাচের চশমা—কি বলছ— কি হল—

কি আবার মোদের গরিব মানুষের অদেষ্ট। আমি কি মিছে কথা কইছি—মোর মাথায় সেলাই। দেখো এখনও ঘা দেখা যায়—হাতখানা ভেঙ্গে গেছে—হাতপাতালের ছবি কাগজ সব আছে—মিছে কব কেন—দাদাবাবু কিছুটি শুনতে চায়নি—পা ছড়িয়ে বসেছে নিরের মা—বলল হাবা গোবা গেঁয়ো লোকেদের কুমন্তর দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে—যত আদুড়ে বাদুড়ে ধরে ধরে এই সরকার তুলে দিচ্ছে গদিতে আর তারা আসকারা পেয়ে হাতে মাথা কাটছে।

বলি আগে আমরা ভাল ছিলাম—লোকে আমাদের মাথা কাটত এখুন পারছে না—তাই বড্ড দুঃখু হচ্ছে না।—

কি যে ব'ল না তুমি—

—বলি আমার কপাল—ভোটের পরের দিন কাটলনি মা, শেষ রাত্তিরে আমার

ঘরে আগুন দিল—ব্যাটা আগুন আগুন করে বেইরেছে— তারে জাপটে ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি আমার মেয়ে চিৎকার করতে করতে সেদিক পানে ছুটে গেছি—কাঁচা পোয়াতি মেয়েডার মাজায় নাথি মেরে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল—সে পড়ে গেল—কুনোদিকে নজর নাই আমার—ব্যাটারে নিয়ে যায় আমি পিছে ছাড়িনি—আমার দুই হাত মুচড়ে ঘাড় গুঁজড়ে নাথির পর নাথি মারতে লাগল-পড়ে গেলাম—শেষে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম— মাথায় মারলে লাঠির ঘা—

—আর জানিনি কিছু—হাসপাতালে জ্ঞান হল ছেলের জন্যি পাগল হয়ে গেছি—শুনলাম — মেয়েডারে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ঘরদোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে— কিছু বাঁচেনি—ঘরের কথা তো মনে ছেলনি। কচি কাচাগুলো পাড়ার লোকে টেনেটুনে বের করেছে—

মদন ঠাকুরের ঘরে তো শিকলি তুলে আগুন দিছিল—

—নিরাপদ কেমন আছে—

—মাগো আগুন দেখে আশপাশ সব গাঁ থেকে ছুটে ছুটে লোকে আসছিল মাঠের মধ্যেই তারা আমার ব্যাটার খুনেদের ধরে ফেলছে—

—খুন করে ফেলছে—মা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। —না মা— বাঁচলে বাঁচতে পারে—কিন্তু চোখে দেখতে পাবে কিনা—নিজের চোখে তো তারে দেখিনি— ছবিতে তো একটা একটা ব্যান্ডেজ মোড়া পাশ বালিশ—

—কোথায় চিকিৎসা করাচ্ছে—

—আমি কোথায় কি করব মা—আমার কি খ্যামতা—ব্যাটারে সিবারের পঞ্চায়েত পরধান করিছিল-তারাই সব করছে—

—গ্রাম প্রধান—তাই নাকি—চোখে কি হয়েছে বোমা ফেটেছে—

—না গো মা—আঙ্গুল ঢুকিয়ে চোখ উগলে নিচ্ছিল—

—কি বললে— বিছানার উপর ধাঁ করে উঠে বসলেন মা— ঢিলা চশমা কান থেকে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে—

নিরের মা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল— অমন নাপিয়ে উঠনা গো—শোও শোও— ডাক্তারের মানা আছে না—তুমার চোখ দেখলি ব্যাটার জন্যে আমার মনডা বড্ড পোড়ায় গো মা—

—খোকা—খোকা—মার উত্তেজিত ডাক শুনে ছুটে যাই। নিশ্চয়ই বুড়ি কিছু করে বসেছে।

ঘরে ঢুকেই মাকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় দেখে—আমি লাফ দিয়ে এসে বুড়িকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিই—কোথায় সে ঠিকরে পড়ল—নজর দেবার মত মনের অবস্থা নেই।

—কি হয়েছে মা—শোও, শুয়ে পড়, শুয়ে পড় ধীরে ধীরে শুইয়ে দিই বিছানায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—অস্থির হ'য়ো না এটাকে রাত পোহালেই দূর করে দেব—

বুড়ি একটা পুটুলির মত পড়ে আছে। বললাম—এখুনি বিছানা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাও—যাও—

মার ঠান্ডা কম্পিত হাতখানা আমার হাতের উপর—

নির্জীব গলায় বললেন—না থাক—

মার মুখে শুনতে শুনতে নিরের মাকে আশ্বস্ত করতেই বললাম— এতো কোন ব্যাপারই না— তুমি কিছু ভেব না— শয়তানগুলোকে আমি হাতে দড়ি পরিয়েই ছাড়ব—

বুড়ি মিন মিন করে বলল—হাতে নাতে ধরা পরেছে তারা

—তবে তো কথাই নেই—কেস নম্বর টম্বর দিও—দেখব একটা বড় উকিল দাঁড়ায় কিনা—তা ভোট দিয়েছিল কিসে—হাতে বুঝি—

বুড়ির নিষ্প্রভ চোখ দুটো খরখরে হযে উঠল—শেঠের পোর হাতে ভোট দুব—বিড় বিড় করে বলে।

কি বললে—

—কেস্তেয়—মোরা বাবু কেস্তে হেথোড়ির লোক—মোর সোয়ামী কেস্তে হেথোড়ি করেই শেঠেদের হাতে পরাণডা দেলে—গলায় তেজ এনে বললে সে।

মা আর আমি বিব্রত মুখে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আসান

পিউ ঘুমিয়ে পড়েছে। তারই পাশে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। সন্ধ্যার আবছা আঁধার বাইরে। অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে। পথের আলো জ্বলেনি। গোটা পাড়া নিথর নিস্পন্দ। মাঝে মাঝে এক আধটা কুকুরের নিচু গলার হুঁ হুঁ ডাক উঠেই নেমে গিয়ে থেমে যাচ্ছে একেবারে। বেলা থাকতে বোমার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে— কখনও এক নাগাড়ে কখনও থেমে থেমে। বিরতির সময়টা দীর্ঘ হলে ভয়ের ভারী হিম ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে দূর দূরান্তর। খাঁ খাঁ পাড়াটা একেবারে জনমানবহীন।

সকাল থেকেই আজ আশেপাশের বাড়িগুলোতে বড় ব্যস্ততা লেগেছিল। সংবাদের চোরা স্রোত বইছিল। কানে কানে বলা সে সব কথার ধার ভার ছিল অকাট্য। কেউ সঠিক জেনে এসেছে— অপর পক্ষেরা কতটা তৈরি—শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজ রাতেই টার্গেট—পুলিস যদি আজকে পাড়াটা সার্চ করতো তবে সব হাতে নাতে শ্রীঘর বাস—সরকারের ওপক্ষ তোষণের কথা কি কারও জানতে বাকি আছে—আরে সব জায়গায় হিন্দু পাড়াতেই বা পুলিস দিয়ে রেখেছে কেন তবে—

বলি কোন ভরসায় লোকে বসে থাকবে। সকাল থেকে বাক্স প্যাঁটরা পুঁটলি পোঁটলা যার যেমন দু'চারটে করে ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে।

দল ধরে যাচ্ছে কোথায় ওরা—অণিমার মাকে কলের পাড়ে ধরি--

ওমা কেন, তুমি যাচ্ছ না—কোলে কচি ছা, অল্প বয়েস—না বাবা এমনটা ভাল নয় কিন্তু—

হেসে বললাম আপনিও যাবেন নাকি—

আমি আবার যাব—কোন চুলো আছে নাকি যাবার —সোমত্ত মেয়ে বউ ঘরে তাই।

যাচ্ছেন কোথায় ?

ওই কল্পনার ভাগ্নে এসেছে—হিন্দু পাড়ায় নাকি সব ব্যবস্থা হচ্ছে বলেছে—

মিহিরকে অফিসের ভাত দিয়ে বললাম—যাই মা'র কাছে—

না রেবা— এত বড় বস্তির ক'ঘর আর যাবে। ভয় কি শুধু আমাদের—ওরাও যাচ্ছে—তুমি ওদের ভয় পাচ্ছ—ওরা তোমাদের। কেউ না থাকলেও আমরা আছি—

সে তো অফিস চলে গেল! তখন দিনের আলো ছিল। তার ফিরে আসার আশা ছিল। এমন করে চারদিক থেকে বোমাবৃষ্টি ছিল না। ও তো আসছে—আমার তেমন

করে বুক শুকিয়ে ওঠেনি।—ভয়ের এমন শ্বাসরোধ করা অনুভূতি আমার একেবারে অগোচর ছিল।

আগের দিনে রেডিওতে স্কুল কলেজ খুলছে শুনে তৈরি হয়েছি—রসিদা এসে দাঁড়াল—

"আজ বেইরো না গো—কী হ্যাঙ্গাম ছারখার করে দেছে—ঘর বাড়ি আগুনে জ্বলতেছে—পুইড়তেছে'—এডিও শোন—শুনে যেও—

গল্প করতে ভালবাসে ও। আমি হেসে ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। পথে গম্ভীর ভাষাহীন চেনা মুখগুলোতে চোখ পড়েছিল— নজর করিনি—দু'চার জন নিচুগলায় কি যেন গভীর কথায় মগ্ন। সকাল সাতটা তখন—মহিলারা মিলে হিন্দুস্থানীর মুদিখানা খোলানোর জন্যে জোর করছে—দু'দিন ধর্মঘট—ঘরে কিছু নেই—

বাবা! তুমি বেইরেছ—কে একজন মন্তব্য করল—

বৌদি যাতা কাঁহা—ট্রেন আভি রুখে দিয়া—

এগোনো গেল না—সবাই যেন ভূত দেখার মত আমাকে দেখছে—

বাহার মাৎ যাইয়ে মাজী—বিষণ্ণ মুখে বললেন বৃদ্ধ মনসুর দর্জি। ফিরে এলাম। জামা কাপড় ছেড়ে বসেছি— কাগজ আসেনি। রেডিওর খবর শুনব বলে 'নব' ঘোরাচ্ছি— আবু এল— মিহিরদা—

ঘরে ছিল না সে— দুধ আনতে বেরিয়ে এখনও ফেরেনি। খবর পেলাম তার মুখে। আগুন জ্বলে উঠেছে—ঘর পুড়েছে, তছনছ হচ্ছে—খুনোখুনি— সে শুধু অনুমান—নানান জনে নানা কথা বলছে—রেডিও নীরব—

অভিশপ্ত রবিবারের ছয় তারিখ। সেদিন থেকে আমাদের কানাগলি মজা ডোবার ধার ঘেঁষে পাড়ার উপছে পড়া বালখিল্যদের উত্তাল হুজ্জোতি আর নেই। রোজ এই বল পেড়ে দাও, এই লাট্টু তুলে দাও—জানালার গ্রিল আঁকড়ে হনুমান নৃত্য, উচ্চরব উত্তেজনার দাপাদাপি নেই। কেউ নেই আজ। কোন বাড়িতেই শিশুর সাড়া নেই। বাপ-মাকে উত্যক্ত করার মাসুল দু'চারটে চড়থাপ্পড়ের কান্নাও ভয়ের পাথরে চাপা পড়েছে।

দুপুরে রসিদা আবার এল। তিনটে বাচ্চা তার পায়ে পায়ে। কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়েছে।

কি হল, রাজু মিঞা আবার মেরেছে তোকে—ফুঁসে উঠি আমি—

না গো বৌদি না—গুমধরা গলা বিস্ফারিত চোখ চুপি চুপি বলল—মোছনমানের বাচ্চারে নাকি পদ্মপুকুরে আছাড় মেড়ে পটকে দিয়েছে—ওরা মিছিলের মুখে পড়ে গেছেল—

কি বাজে বকছিস—আমি একটু আগেই ওই মিছিলের খবর শুনছি। আমার ভাসুরপো এসেছিল—খোঁজ নিতে হবে আমাদের—যাব বললে হয়ত নিয়ে যেত—ওরা ভাল পাড়ায় থাকে, বললাম—একটা শান্তি মিছিল আর কালো পতাকার প্রতিবাদ মিছিল মুখোমুখি হলে বোমা ফেটেছিল—ইট-পাটকেল পড়েছিল—থামাতে গিয়ে তোর

দাদাবাবুর এক বন্ধু খুব চোট পেয়েছে শুনেছি—বাচ্চাকে কেউ আছড়ে মারে—পাগল নাকি তুই—

মুখ গোঁজ করে রসিদা বলল—ওরা নিজের চোখে দেখে এল—তুমি তো পরের শুনে বলতেছ—

কে বলেছে বল তো—

কেন সেখান থেকে মাতব্বর এয়েছে—তা রিক্‌শাওয়ালা—সেই আমি কাঁদতে কাঁদতে ছেলে আগলাই—দোরে আগল দে বসে আছি—মেহেরের বাপ মোরে তেড়ে তেড়ে আসতেছে—

রসিদা হঠাৎ আমার পায়ে পড়ে যায়—তুমি বলে দাও গো বৌদি—আমি দেশে চলে যাই আমার বালবাচ্চা নে—

আরে, কি করিস—আমি কি বলব—দেশে যাবি যা চলে—

কেঁদে ওঠে রসিদা—যেতে দিচ্ছে না—

গাড়ি তো এখন চলছে—একখানা দু'খানা—

তাই কি—যেতে দিচ্ছে না—আটকে দিচ্ছে এপাড়ার ইরসাদ, কালাম—সবএক রা—আর মেহেরের বাপ লাঠি নে বসে আছে—খুব কাছে এসে কানে মুখ এনে বলে—মালুম হচ্ছে—ছাড়লে পর ওরা দখল লিবে—লিক্—আর কুথাও গে উঠব-যিদিকে হাঙ্গামা নেই—ঝুপড়ির পিত্যেশ করিনে আমি—শুন বৌদি—রসিদা পায়ের কাছে বসে পড়ে— আমার হাঁটুর পরে হাত রেখে কাতর গলায বলে—আমার বাসন কখান তুমার ঘরে রেখে যাব গো বৌদি—শেষে ওদের হাত ধরে ইস্টিশনে বসি গে—ট্রেন এলেই উঠে বসব—

তা রেখে যা—আমার থাকলে তোরও থাকবে—তবে আমিতো যাচ্ছি না কোথাও তুইও থাকতে পারিস তেমন কিছু হলে না হয় আমার ঘরে চলে আসিস—

মুখ নিচু করে বলে রসিদা—আজ রেতে ভারী গন্ডগোল বাধবে—সকলে বলাবলি করতেছে—

রাজু মিঞা কি বলছে—

সে খালি তরপাচ্ছে—আচ্ছা বল বোমা বন্দুকেরে কি লাঠি সোটা দে রোখা যায়—বলে ওর নানা লেঠেল ছেল, বাপ লেঠেল ছেল—দেখিস নে মোর কব্জির জোর—আমি বাবা কব্জির জোর দেখতে চাই নে—

ঘ্যান ঘ্যান করে আমার মাথা খেয়ে তবে রসিদা গেল। বারে বারে বলে গেল—দাদা এলি পত্রপাঠ চলে যাবা—তুমি থেকোনি—উসব বড় বড় কথা শুনোনি তো—

কাজ কর্মের মাঝে মাঝে যতবার জানলায় দাড়িয়েছি কি কলপাড়ে গেছি—দেখছি লোক যাচ্ছে—

তুমি তবে যাচ্ছ পিসি— নগেনের মাকে বললাম। সামনা সামনি ঘর তো।

না, বাপু মরি বাঁচি নিজের ঘরে-দোরে—গেল বারে যে অনাসৃষ্টি—সেকি ঠিসির

ঠিসির আমার জায়ের—

পাঁচজন পাশে থাকলে ভরসা—

না বৌমা ছুঁড়ি দুটোকে গছিয়েই ফিরে আসব— মিহির আছে—তারা কি আর একটা ব্যবস্থা করবে না—জানালা ঠেযে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় নিষিদ্ধ কথা বলার মত—ইশারায় দেখিয়ে বললেন— এনে ফেলেছে অনেক কিছু—বোমা, বন্দুক, ছুরি, বল্লম, লাঠি,-সোঁটা—তা বস্তা বস্তা—মান ইজ্জতের ভয় মা—আর কিছু না—ম্লেচ্ছদের পরে বিশ্বাস কি—

কেন, সবাই মিলে দাঙ্গা আটকাবার কথা হয়েছে যে—

ওসব তুমি ওদের মনের কথা ভাব নাকি—তুইয়ে তাইয়ে সব লুটে পুটে—

এ পাড়ায় বলে কখনও দাঙ্গা হয় না— আপনি তো অনেককাল আছেন— ছটফট করে সরে পড়লেন—নগেনের পিসী।

দলে দলে চলে যাওয়ার বিরাম নেই—রেললাইন ধরেও পুঁটলি পোটলা কাঁধে—কে যে কোথায় যাচ্ছে তাই কি কেউ জানে। যত দেখি তত মন ভার হয়ে আসে। দাঙ্গার গল্প অল্প স্বল্প শুনেছি, সজ্ঞানে দাঙ্গা দেখা যদি কপালে থাকে তবে এই—কত বীভৎস—কত মর্মন্তিক হবে কে জানে—। সবাই বলেছে ছিচল্লিশের দাঙ্গা আর কি —এবারের দাঙ্গা দেখতে পাবে—মুসলমানরা ভযানক গোঁড়া—তাদের মসজিদ—

তবে হিন্দুরা কেন রটাচ্ছে—এখানে ওমুক মন্দির আক্রান্ত, ভাঙচুর—তাতে দাঙ্গাবাজদেরই তো সুযোগ বাড়ছে—তা হিন্দুরা বা কম কি—

একা হয়ে যাচ্ছি—একা। ভয় এসে আমার মনেও জাঁকিয়ে বসছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। দেহে বল নেই। কম্পিত হাতে মেয়েকে চান করাই, খাইয়ে দিই, ঘুম পাড়াই, মায়ের মুখে সে কি দেখে কে জানে—এতটুকু চুলবলুনি নেই—একেবারে কলের পুতুল—

শুধু খেতে খেতে একবার বলল—টুসিরা চলে গেল মা? কোথায় মামাবাড়ি—

আমি ঘাড় নাড়ি হ্যাঁ

আমরা যাব না মামাবাড়ি—

মনে মনে ভেবে নিই—কি ওকে বলা ঠিক হবে—বাবা আসুক আগে—

বেলা পড়ার সাথে সাথে গুজবের পাখনায় জোর ঝাপটা টের পাওয়া যায়। কারা নাকি পাড়া ঘুরতে এসেছিল—কি বলে গেছে—আর আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই নিয়ে দু'চার জনের গুজগুজ ফুসফুস কথা। জল্পনা কল্পনা। চড়কতলার মন্দির ভাঙছে। কালিঘাটে মলোটভ ককটেল— পরেশনাথ নিশ্চিহ্ন —মেয়েদের উপর অত্যাচার —গোলাগুলি—খুন—নানান বয়সী নারী-পুরুষে ছুটোছুটি করে খবর পৌছে দিচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসতে গুজবের ডানায় বিদ্যুৎ খেলতে থাকে।

দুরু দুরু বুকে মেয়েকে পোশাক পাল্টে চুলটুল বেঁধে দিই। নিজে জামা কাপড় পাল্টে নিই। দুটো হাত ব্যাগে অল্প স্বল্প শীতের পোশাক আসাক ভরে তৈরি হয়ে নিই—যদি তেমন কিছু ঘটে—

সেই সাংঘাতিক খবরটা এলো—ফুলবাগান, মেহদীবাগান, জাননগর,পার্কসার্কাস চারদিক থেকে সশস্ত্র বিশাল বাহিনী ছুটে আসছে সুন্দরীমোহন এ্যাভেনু পেরিয়ে রেল লাইনের এপারে আর রক্ষে নেই—এপাড়ার এরাও তৈরি—

চারদিকে ঝপাঝপ দরজা জানালা বন্ধের আওয়াজ, মানুষের পায়ের দুড়দাড় শব্দ, উত্তেজিত কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা—তুমুল—

মেয়েকে কোলে নিয়ে ব্যাগ দুটো সামনে রেখে বসে আছি। ভয়ে উদ্বেগে কাঁটা হয়ে। মিহির—মিহির এখনও আসছে না কেন—আজকে তার আগেই বেরিয়ে আসা উচিত ছিল নাকি— মেয়েটাকে নিয়ে আমি এখন কি করি—একা একা—দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

আমাকে কাঁদতে দেখে পিউও ফোঁপাতে শুরু করেছে নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম চল, আর বসে থেকে কি করব—

পিউ-এর হাত ধরে ঘর থেকে বেরোলাম। এ পাড়ার পুবপাড়ে অবনীদার বাড়িতে ফোন আছে। নির্জন গলি পথে জ্যোৎস্নার আলো ছায়া ছড়ানো। কোথাও বিজলী বাতির রেশ। সার সার বাড়ি সব দরজা জানলা শক্ত করে আঁটা। গা ছমছম করা ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। নিজের পায়ের শব্দ নিজের কানে বাজছে। এমনভাবে পাড়া খালি হয়ে গেছে— বুকের ভিতর কেমন করতে লাগল —ভীষণ দমে গেছে মন। শ্মশানপুরীতে আমি একা—ঠাকুর, ঠাকুর —কি বুদ্ধি মিহিরের। ওর আর দোষ কি—সবাই মিলে ওকে বোকা বানিয়েছে—সত্যি কি মাথামোটা মানুষ— এদের ওপর ভরসা করে সে তার বউ ছেলেমেয়েকে রেখে গেল, ছিঃ ছিঃ— আরে একি তোমার গা দুলিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ—এ হ'লো বোমা বন্দুক ছুরি বল্লম—অণিমার মার কথাগুলোই মনে পড়লো—

তখনই আজানের সুর আচমকা বজ্রপাতের মত মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে দিয়ে গেল। এই সর্বগ্রাসী স্তব্ধতার মধ্যে সে সুর সহস্রগুণ মর্মভেদী। নিমেষে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াই। অন্ধকারে মিশিয়ে যেতে চাইলাম—পরক্ষণে নিজেই লজ্জা পেলাম—বাঃ এ সুর তো রোজকার—এতে এত বিহ্বল হয়ে পড়ার কি হ'ল—অন্যদিন তো খেয়ালই হয় না— কখন বেজে যায় আজান—

ছটা বাজল তবে—এই আসার সময় হল মিহিরের—শুধু শুধু দিশেহারা হয়ে পড়েছি। ভাবলাম থাক, ফিরে যাই-কিন্তু না—

অবনীদার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় এক কোণে স্টোভের উপর রাতের রান্না বসানো। —কুণ্ঠিত গলায় ডাকলাম—বৌদি—

দরজায় এসে দাঁড়ালেন অবনীদা নিজে—কি রেবু—একা ভাল লাগছে না—এস—

আমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম—সমস্ত জোরটুকু এই সামান্য স্নেহের আহ্বানে ফুরিয়ে গেল—ও যে এখনও এল না— আমি কি করব—

অবনীদা পিউকে কোলে তুলে নিলেন—তুমি কেন কাঁদছ মা মণি—মা না একেবারে বোকা—কাঁদার কি হয়েছে বাবা আসবে—

এস ভেতরে এসে বস—

বৌদি কোথায়—

তাকে কি রাখা যায়—কি রকম নার্ভাস প্রকৃতির লোক তো জান—ছেলে পড়ে রইল —স্বামী— পড়ে রইল—নিজের প্রাণ নিয়ে তিনি বোনের বাড়ি গেলেন—সে একরকম ভাল—বোমার শব্দে এমন কাঁপতে কাঁপতে শয্যা নিতেন—তাকে সামলাবো, ছেলেদের সামলাবো না দাঙ্গা রুখব—বল—

আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—ঘাম দিচ্ছে—বিল বিল করে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডাস্রোত। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে—শরীর শিথিল, মুখে কথা ফুটল না—শেষ শুনলাম মেয়েটা মা বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল—

নিজেকে স্বাভাবিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বোধ হয় সামলে নিলাম—মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিলেন অবনীদা—

ক্ষীণ গলায় বললাম—ওকে টেলিফোন করে দিন—অবনীদা— আমি আর টেনশন সহ্য করতে পারছি না—

ওঃ কি বুদ্ধিমতী মেয়ে—সে কি এখনও অফিসে বসে আছে তুমি ভাবলে—থাকতেও যদি টেলিফোন করা ঠিক হতনা—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে—খামকা বিপদ ডেকে আনবে—শহরের কোথায় কি অবস্থা আমরা তো তার কিছু জানি না—

আমি আর আমাতে নেই। মনের সাথে সাথে শরীরও আর আমার আয়ত্তে নেই। ও যদি না আসে এই আতঙ্ক স্পন্দিত দুশ্চর রাত একা কি করে কাটাব। ভিতরে ভিতরে ভযাবহ অগ্ন্যুৎপাত আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। চোখের উপর ভেসে উঠছে রেডিওর অল্প স্বল্প সংবাদের জীবন্তটুকরো, কানাঘুষা শোনা কথার সজীব প্রতিচ্ছবি—অতীতের স্মৃতি—

রেবু ওঠ দেখি আস্তে আস্তে—অবনীদা হাত ধরে আমায় তুললেন—এই নাও চা—দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে। পিউ যে বড় কাঁদছে দিদি— ওর জন্যে তোমায় শক্ত হতে হবে তো—

আমি আর বাড়ি যাব না—কান্না আমি সামলাতে পারছি না—ও কি করে আমাকে আর পিউকে একলা ফেলে গেল—

সে এসে যদি তোমাদের না পায়—ভয়ানক ভাবনায় পড়ে যাবে না—

যাক্ ভাবনা না ছাই—পাড়ায় একটা লোক নেই—

কোন ভরসায় সে—আমাদের পরে তার কোন দায়িত্ব নেই—উঃ—

অবুঝের মত কথা বল না রেবু—ওর ওপর কতবড় দায়িত্ব রয়েছে—আচ্ছা চল আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি—

অবনীদার পরে আমার রাগ হয়ে গেল। আমাদের সরাতে পারলে যেন বাঁচেন। নিজের বৌকে তো ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিপদ এড়াবার চেষ্টা। বললাম থাক —থাক—

পা বাড়াতে যাব তখনই বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। মনে হল কাছেই—হয়ত কয়েক হাত দূরে—

আমি চমকে উঠে অবনীদার হাত আঁকড়ে ধরলাম—

এ পাড়ায় নয়—চল—একটু শক্ত হও রেবু। আজ তোমাকে শক্ত হতেই হবে—

বেরিয়ে দেখি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করেছে ছেলেরা। অবনীদা পিউকে কোলে তুলে নিলেন—ভয়ে বোধ হয় সেও কাঁপছিল—মাথা কাঁধে চেপে ধরে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অবনীদা বললেন—দূর পাগলী—আমরা রয়েছি না—ভয় কি—

তারপর এক একটা মুহূর্ত চলে যাচ্ছে আর মিহিরের ফিরে আসার আশা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভয় আমাকে গ্রাস করছে, একটু একটু করে। গভীর অবসাদে ডুবে যাচ্ছি। শুধু নিজের তো নয় যে মানুষটা ফিরে এল না তার জন্যেও ক্ষণে ক্ষণে কত হৃদয় বিকল করা সম্ভাবনা ছবি হয়ে আসছে—

মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের রক্ত জল করা শব্দেও যেন আর তত উদ্বেগ নেই। শুধু ভাবছি যার ভরসায় ভয়কে আড়াল করেছি— এমন অসহায়ভাবে ফেলে রেখে সে যে সরে থাকবে—এ আমি কেমন করে জানব। ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুটি আমার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তার এই অক্ষম মায়ের ভরসায়। ওর ওই ছোট্ট জীবনটুকুর দায় আজ আমার একার। মনের পরে এ চাপ সহ্য করতে আমার ভিতর কি যে হয়ে যাচ্ছে মিহির। মিহির! এ তোমার কেমন বিবেচনা—তুমি বললে—কেন মানুষ মানুষকে ভয় পাবে— আমরা তো কারো শত্রু নই—ধর্ম নিয়েও আমাদের বাড়াবাড়ি নেই রেবা- -। আমি দিদিমণি—আমার দরজাই তো ওদের ছেলেমেয়েদের খেলাঘর—আজ সারাদিনে তারা এদিকে কেউ আসেনি—তবে কি চলে গেছে ওরা—ভয় ওরাও পেয়েছে তো—পাবে না—ওরা যে আমার মত মা—

বোমা ফাটছে এ বোমা হিন্দু, এ বোমা মুসলমান সব মায়ের বুকের মাঝেই ফাটছে— হায় ইট পাথরের লড়াই—কেউ মায়েদের কথা কি ভাবল না—যারা ভাঙ্গাভাঙ্গি করল, তাদেরও কি মা ছিল না, জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল যাদের কি বলে সান্ত্বনা পেল তাদের মা—ধর্ম কি মায়ের বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারে!

আমার কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে পিউ। তার ঘুমন্ত মুখের পরে এক বিন্দু চাঁদের আলো কোন পথে এসে পড়েছে। সেই দিকে চেয়ে আমার চোখে জল জমা হচ্ছে—আজ কি তবে আমি একে মৃত্যুর হাতে তুলে দেব—মিহির, এ শত্রুতা তুমি কেন করলে আমার সাথে—আমি এখন কি করি—

মৃত্যুর মুখোমুখি, সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক চরম নিষ্ক্রিয়তা বোধ হয় গ্রাস করে মানুষকে। অপেক্ষা করে আছি কখন আমার দরজায় আঘাত এসে পড়ে। চাবিগুলো সব বার করে রেখেছি—কিই বা থাকে আমাদের মত মানুষের ছোটখাটো সংসারে, নিয়ে যাক—শুধু আমার পিউ যেন—রক্ষা পায়। কত কি শুনেছি ঘরে আগুন দিয়ে তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে শিশুদের, আগুন দিলেদেবে—পিউকে যেন—ভাবতে ভাবতে মাথা তেতে উঠেছে—ঘাম দিচ্ছে শরীরে—আমি আর ভাবব

না—যা হয় হোক তাড়াতাড়ি হোক এখুনি হোক না হলে আমি হয়ত পিউ-এর পাশেই কখন ঘুমিয়ে পড়ব—শরীর এলিয়ে আসছে ঘুমই আসবে বুঝি—

খেই হারিয়ে ফেলছি ভাবতে চাইনে তবু কত শত ভাবনা এলোমেলো, একে অপরে জড়িয়ে উঠে আসছে কি থেকে কিসে ঘুর পাক খেয়ে মরছি—। সময় আমাকে ভাবনার সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। নিশ্চল সময়ের সাথে আমি স্থবির হয়ে যাচ্ছি।

আর ভাববো না বুকের মধ্যে স্মৃতি জাগিযে আর বেদনা বাড়াব না। বুঝি মৃত্যুদন্ডের আসামীরা আমার মতই স্মৃতিগুলি মন থেকে মুছে দিতে চায়। স্মৃতি পশ্চাৎমুখী, সম্মুখের মৃত্যুকে সে আড়াল করে—আর স্মৃতির জ্বলন্ত হাতছানি নয় আর মনের সাথে সংঘাত নয়—প্রতিক্ষণের অনিশ্চয়তার পীড়ন থেকে মুক্তি—যা হয় হোক —ধ্বংসই নেমে আসুক। হয়ত দাউ দাউ জ্বলবে ঘর—

পরম প্রিয় আশা আকাঙ্ক্ষা উড়ে পুড়ে যাক— ওরা ভাঙ্গুক-চুরুক, লুটেপুটে নিয়ে যাক সব—তাই হোক—

ইস-যদি পিউকে অন্তত সরিয়ে দিতাম মিহির, তবে হয়ত শয়তানদের আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে এ ঘরে ঢুকতে হত। শুধু তো মা নই আমি, নারীত্বের লাঞ্ছনার ভয় কি নেই—

বিকট বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি। ঘিরে আসছে—সব দিক থেকে ঘিরে আসছে ওরা—যদি বেঁচে থাক—যদি ফিরে এসে না পাও আমাদের—

তুমি পারবে অনেক শক্ত মন তোমার—সেই ভাল আমাদের দিযেই যেন সব সর্বনাশের শেষ হয়। আমি অপেক্ষা করে আছি—আর ভাবছি না—

ভয়ানক একটা গোলমাল উঠল—বোমার পর বোমা ফাটল কয়েকটা—খুব কাছে কেঁপে উঠল ঘরখানা—টালিতে টালিতে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ তরঙ্গ উঠল—ঝর ঝর ঝরে পড়ল সিলিং-এর জঞ্জাল। মড় মড় করে টালির চাল ভেঙ্গে পড়ল বুঝি—মেয়েরা ককিয়ে উঠেছে ওই তো অশ্বত্থ গাছের ওপাশে-গুমরানো কান্না —ওরা এসে গেছে—ওঃ তবে ওরা এল—

বিশেষ করে কিছু ভাবার আগেই —লাফ দিয়ে নেমে ঘুমন্ত পিউকে নিয়ে খাটের নিচে ঢুকে গেলাম। যত্ন করে শুইয়ে দিলাম মাটিতে। ডুবন্ত মানুষ কিছু না ভেবেই যেমন খড়টুকুও আঁকড়ে ধরে—আগুন—আগুন চিৎকার শোনা গেল। ওই আগুন লাগিয়েছে এবার কি পুড়েই মরব আমরা—

বৌদি,বৌদি, দরজা খুলুন আমি শান্ত হয়ে বসে আছি খাটের ওপরে পা ঝুলিয়ে। শিগ্‌গির বালতিগুলো বার করে দিন—

কালাম।—না খুলব না দরজা—নিশ্চয়ই ছল। ভুলিয়ে ভালিয়ে—হুঁ। চারদিকে দুড়দাড় ছুটোছুটি পড়ে গেছে ঝন ঝন করে পড়ল ছিটকে নিশ্চয় লুঠপাট চালাচ্ছে এইবার জল—জল—আরও জল আন—গোলমাল হাঁকহাকি চলেছে। বৌদি—অধীর আগ্রহে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে—বালতি দিন— আরও জল—

বৌদি—আকুল মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে কিশোর কালামের গলা—

ওরা কি দরজা ভেঙ্গে ফেলবে নাকি। আমাকে মিহিরের মত মাথামোটা পেয়েছে—ওদের সব ছলাকলা—বুঝতে বাকি আছে নাকি—বেইমান সব বেইমান—না হলে এই খুদকুঁড়োর সংসারটুকু আমার জীবনের এই আশ্রয় টুকু ওরা ছার খাব করে দিতে চায়—আমি না ওদের কত আবদার রেখেছি—কতদিন কতকি জলখাবার করে দিয়েছি এই সামান্য সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে। বৌদি বলতে ওদের গলায় তখন কি দরদ, কি সমাদর ঝরে পড়েছে—আমি নির্বোধ—তাতেই গলে গিয়ে গর্বে ফুলে উঠছে বুক—

কতবড় গলা করে বলে গেল—বৌদি আমরা আছি কিছু ভাববেন না আমাদের না মেরে কেউ আপনাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। কই একবার তারা একটা কথা বলে খোঁজ করল আমার—

অনিমার মা যে বলত—কথাটা খুব খাঁটি—ওরা হল তো জেতে মোছনমান—কথায় বলে—মোছনমানের মুরগি পোষা—পুষবে,পালাবে—আবার জবাইও দেবে—ওদের সাথে অত গলাগলি কিসির—তেলিয়ে তেলিয়ে এই যে ওদের মাথায় তুলে দিচ্ছে সব—এত বচ্ছর এখেনে আছি মাথা উঁচু করে কোনদিন কথা বলেছে কেউ। এখন দেখ গুঁড়োটাও তেরিয়া—কথা পড়তে পায় না—

উঃ দরজা যেন দুরমুশ করছে হারামীরা—কি করি আমি এখন—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—পিউ—পিউ কোথায় বিছানায় হাতড়াচ্ছি—ওকে যে বাঁচাতেই হবে—ঘরে আগুন দিল যে—ওকে কি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলব—যদি দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে—পাগলের মত খুঁজে আনি বটি, কাটারি, কয়লাভাঙ্গা হাতুড়িখানা, দরজার ভাঙ্গা খিলখানা—আমি, আমি ছাড়ব না— আমার ছোট্ট সুখটুকু কেড়ে নেবে ওরা—

আমার জীবনের অল্প আশা স্বল্প সম্পদ ওরা ছারখার করে দেবে, এ আমি সহ্য করব না—কারুর কথা আমি মানি না—দুম দুম করে দরজায় জোরে ধাক্কাচ্ছে, লাথি মারছে হয়তো। আমার আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—চুলের গোছা খুলে গিয়েছে—আমি তখনও হাতড়ে ফিরছি আর কি আছে—আর কি দিয়ে আমি ওদের কঠিন আঘাত করতে পারি—দরজা ওরা ভাঙ্গবেই—বেশ—আমিও দেখছি—

বৌদি, রেবু, পিউ কি হল—ওদিকে লোকের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে—আর—তুমি—অনেকগুলো গলা একসঙ্গে গর্জাচ্ছে—

দাখানা হাতে ধরে বাঁ হাতে দরজার খিলটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতে সামনেই ওয়াজেদ—

একি—কি করছ তুমি—তোমারও কি—

দাখানা হাত থেকে খসে পড়ে গেল—মিহির-মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা—তখনও কাঁচা রক্ত ফুটে রয়েছে—ওয়াজেদ আর কাশী ধরে ধরে নিয়ে আসছিল—আকস্মিক উত্তেজনায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ওয়াজেদ শিশুর মতো দুহাতে আগলে তাকে বিছানায় শোয়াতে গিয়ে চেচিঁয়ে

উঠল একি, বৌদি ভিজে কেন বিছানা—

মনে পড়ল—আগুন নেভাবো বলে—

উহু এটা তো আমার ভাল মনে হচ্ছে না—অবনীদা ধীরে ধীরে বললেন—কামরু ডাক্তারকে পাবি—

কেন—অজিতদাকে নিয়ে আসি—জোরের সাথে ওযাজেদ বলল—

না, তাহলে তুই যাস্ না—দেখি আমি নর্টনকে পাঠাই—আমি আছি তোরা যা—বালতিগুলো ভরে নিয়ে যা হাউস থেকে—আর তখনই রসিদা এসে হামলে পড়ল ঘরের মধ্যে—তার পাঁচটা বাচ্চাকে কোলে কাঁখে করে নিয়ে আসছে ওর স্বামী রাজু মিঞা। বৌদি গো—কোথা গেলে গো—আমার সব ছিনে নিয়ে গেল বৌদি—বাসনগুলান আমার—আগ্ লাগা দিয়া—আল্লা ওদের আসান দেবেন না—

নিচু গলায় রাজু মিঞা বলছে কুছ নেহি হুয়া—বিবিজী, বহোৎ ঘাবড়ায়া—দিমক বিগড় গিয়া—

—শালা বাঙ্গালী—শালা কাফের—রসিদা তখনও চেঁচাচ্ছে—

রাজু মিঞা ধমকে উঠতে অবনীদা হাসতে হাসতে বলছেন শুনলাম—ওর বৌদি তো এখুনি ওয়াজেদকে দিচ্ছিল ঘায়েল করে—ওর কথা আর কি বলিস—

আমি তখন সকলের সামনে পিউকে খাটের তলা থেকে কি করে বের করে আনব তাই ভাবছি।

বার্লিন প্রাচীর

গ্রীষ্মের প্রকৃতি পান্না সবুজ উজ্জ্বলতা হারিয়ে ক্রমেই পাঁশুটে হয়ে আসছে। শীত এখন মায়া জড়ানো মায়ের আঁচলের মত। পাইন বার্চ অ্যাসপেন সদ্য ঝরা পাতায় সুগন্ধ গালিচা বিছিয়ে দিচ্ছে পায়ের কাছে। গাছে গাছে হৈমন্তী রঙের মায়াবী মেলা। কখনও কখনও এক একটা দলছুট পাতা উড়ে এসে খুশিতে গড়িয়ে পড়েছে কালো রাস্তার উপর; বিকেলটা বর্ণে গন্ধে সদ্য প্রসাধন সারা সুন্দরীর মত ঝলমলে।

পূর্ব বার্লিনের শ্রমিক এলাকা। ছোট ছোট দুকামরার বাড়িতে সদর দরজা পেরোলেই বসার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘরের সমন্বয়। সামনের সামান্য পরিসরে মরসুমী ফুলের কেয়ারিতে সবে দুচোখ মেলা চারা গাছের সার। কয়েকটা বাহারী গাছের ঘেরা। লতানে বন গোলাপের ঝাড় দরজার গায়ে।

বসাব ঘরের বাঁদিকের কোণে একটা ডবল সোফার পিঠে মাথা রেখে চোখ বুঁজে আছেন উলব্রিখ্‌ট। ট্রাক্টর কারখানার শ্রমিক। বিশাল কাঠামোর দেহটা দুমড়ে রয়েছে যেন। অলস হাত দুখানা কোলের উপর রাখা। কাজের পোশাক এখনও ছাড়া হয়নি।

প্রচন্ড উত্তেজনায় চোখ মুখ লাল করে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল এলেনা। ঘামে ভিজে প্রসাধন গলে গিয়েছে, ধুলি ধূসর, পোশাকের ক্রিজ ভেঙ্গে গিয়েছে, পিঠ ছোঁয়া বাদামী চুল, টুপি বালিতে কাঁকরে আচ্ছন্ন।

বাবা, বাবা তোমার জন্যে অসাধারণ একটা স্যুভেনিয়র এনেছি—বলতে বলতে ব্যাগের ভিতর থেকে হাতড়ে কাগজ মোড়া একটা কঠিন বস্তু বার করে আনল এলেনা। তখনও সে হাঁপাচ্ছে।

উলব্রিখ্‌ট চোখ খুললেন, অনিচ্ছায় হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন। ততক্ষণে মোড়ক থেকে এক টুকরো পাথর হাতে নিয়েছে এলেনা। উলব্রিখ্‌টের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল —একি এলেনা—এলেনা—

ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছেন তিনি। বুকের শেষ হাওয়াটুকু ফুরিয়ে যাওয়া ফ্যাসফ্যাসে বাদ্যযন্ত্রের মতই খসখসে তাঁর গলা।

এটা-গর্বের হাসি হাসছে এলেনা-বার্লিন প্রাচীন টুকরো - কতো কষ্ট করে জোগাড় করেছি - দেখ, এই দেখ - স্কার্ট তুলে দেখায় - দুটো হাঁটুই তার বিশ্রীরকম ঘষটে গিয়েছে। কলকলিয়ে কথা বলে এলেনা-পায়ের তলায় পিষেই যেতাম-জানো না তো গোটা পৃথিবী ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন- বলতে বলতে ঘরের কোণের সেন্টার টেবিলের

উপর ব্যাগ আর পাথরখানা রেখে দিল উলব্রিখ্টের মুখের উপর মর্মান্তিক যন্ত্রনার পাঁশুটে ছায়াটা তার নজরেই পড়ল না। আপন পুলকে সে এমনই উচ্ছল।

—তুমি কাজে যাওনি-বাবার গম্ভীর সংযত গলাতেও সে উচ্ছ্বাসে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ল না, উত্তেজনায় তখনও ফেটে পড়ছে।

—গিয়েছিলাম- দুপুর নাগাদ খবর রটে গেল বার্লিন প্রাচীরের এপারে ওপারে হাজার হাজার অ্যাংরি ইউথ দারুণ হুল্লোড় লাগিয়েছে- হই-চই করে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম-

কাজ ফেলে-অসন্তুষ্ট উলব্রিখ্টের গলা

—তাছাড়া কি-এমন কান্ড না দেখে ছাড়ে-হাতের কাছেই তো বার্লিন প্রাচীর-- নিজের চোখে দেখার আলাদা থ্রিল-উদ্দীপ্ত স্নায়ু তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না এক মুহুর্ত। এই বইখানা সরাচ্ছে, ছবিটা মুছছে, ফুলগুলো নামিয়ে ফেলে ফের সাজিয়ে তুলছে ফুলদানীতে। পর্দাগুলো নতুন করে ভাঁজে ভাঁজে গুটিয়ে রাখল। আর অর্নগল কথার স্রোত বয়েই চলেছে।

উলব্রিখ্ট নিঃশব্দে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিস্তব্ধ, নিরুৎসুক।

—তুমি ভাবতেই পারবে না বাবা-যত মানুষ, তত সাংবাদিক, তত ফটোগ্রাফার- যাকে পাচ্ছে তারই ছবি নিচ্ছে- তাকেই দুকথা বলার জন্যে মাইক্রোফোন এগিয়ে দিচ্ছে আর রেকর্ড হযে যাচ্ছে—

বলতে বলতে ঘুরে এল রান্না ঘর থেকে—চা আনব বাবা, নাকি কফি খাবে— হাত মুখ ধোওনি তো, যাও চেঞ্জ করে এস—

উলব্রিখ্টমাথা নাড়েন। শুনতে রাজি নয় এলেনা-তুমি তো খাওনি, এস দুজনে খেয়ে নেব-সাগ্রহে বলে সে। —আমিও সব ছেড়ে ছুড়ে ফেলি-যা বালি—এঘরে সেঘরে ঘোরা ফেরার মাঝে মাঝে গলা তুলে সে তার দেখা ছবিগুলো পরপর সাজিয়ে তুলছে স্মৃতির সূত্র ছিন্ন করে একটিও বিচ্যুত না হয়।

—আমরা সব এপারে। ওপারে কি হচ্ছে কি জানি—শুধু দুর্দান্ত সব পাগল করা বাজনার আওয়াজ আসছে—পা আপনি নেচে ওঠে রক্তে ঝড় বয়ে যায়—

ট্রে হাতে এলেনা সেন্টার টেবিল টেনে নিয়ে বসে। এই অভিনব অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে তার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই—ভেবে দেখ গায়ে গায়ে লেপটে আছে মানুষ — সবাই নাচছে— এ ওকে জাপটে ধরে লাফাচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, ঘুরপাক দিচ্ছে— সে এক দৃশ্য-গারদ ভেঙ্গে একদল পাগল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে যেন-তখন- চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে এলেনার— ওপার থেকে পাঁচিলের ওপর উঠে এল একদল ছেলে মেয়ে, পরীর দেশ থেকে এল যেন, এদিকে তখন সে কি হুটোপাটি, কে আগে পাঁচিলে উঠতে পারে—

—টি ভি খোল, নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে— টি ভি সেন্টারটা ওরা দখল নিয়েছে আজকের জন্য -টি ভির নব ঘোরানোর জন্য এলেনা হাত বাড়াতে উলব্রিখ্ট তাকে নিরস্ত করলেন।

পলকের জন্য থিতিয়ে গেল এলেনা। অজান্তেই নিজের মনের অবচেতনে ধন্ধটা প্রকাশ করে দিল—

—আশ্চর্য, বাবা, কেউ কিছু বুঝবার আগেই, কোন সর্তকতা ছাড়াই, বাবা, কি যেন বলতে দিয়ে থেমে গেল এলেনা। মনে মনে কোন কিছু নাড়াচাড়া করছে সে।

বাবা—মুখ তোলে এলেন —সংশয়াচ্ছন্ন চোখ দুটো বাবার মুখে মেলে ধরে বলে বার্লিন প্রাচীর—

উলব্রিখ্‌ট থমথমে গলায় বলেন- না মা স্তালিন প্রাচীর টাচীর দেননি—

—কতটা শক্ত বল তো—নিজের কথার খেই ধরে এলেনা বলে—

ভালই শক্ত- মানে সহজে

কয়েকটা শাবল গাঁইতি, অন্ততঃ ভেঙ্গে দিতে পারে না—

তা কি করে হবে আগাগোড়া কংক্রিট—তাছাড়া—

আমার চোখের সামনেই ভেঙ্গে পড়ল — উলব্রিখ্‌ট বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকেন— কথা খুঁজে পান না।

তাহলে প্রাচীরের ওপার থেকে কি —সামান্য সংশয়টুকু তার কুটোর মত উড়ে গেল অনর্গল কথার স্রোতে—

—নিমেষের আলোর ঝলকানি—কতক্ষণ চোখে অন্ধকার — পাথরে বালিতে ধোঁয়ায়-ঢেকে বুঁদ হয়ে আছি আমরা —আস্তে আস্তে চুপ করে গেল এলেনা -যেন খানিকটা ধাতস্থ হয়ে নিতে চায়। উলব্রিখ্‌ট নড়ে চড়ে বসলেন। মুখ তাঁর রক্তশূন্য, অস্বাভাবিক পান্ডুর।

—ওঃ তারপর-সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাঙ্গা টুকরো কুড়োতে-কাড়াকাড়ি মারামারি-সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার —উন্মাদনা অনেকটা থিতিয়ে গিয়েছে এলেনার—

—চা খাও, বাবা, ও কেক আছে। একদম ভুলে গেছি, নিয়ে আসছি, দাঁড়াও- প্লেটে করে কেক নিয়ে আসে এলেনা খেতে খেতে আগের যে ভাবনা এলেনাকে পীড়িত করছিল তাই যেন ভাষা পেল-কিন্তু কেউ জখম হ'ল কিনা বোঝা গেল না- আর সেদিকে নজরই বা দেবে কে? স্বপ্নিল হাসি হাসে-মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল, একটা জলজ্যান্ত বাজার ব'সে গেছে-সওদায় সওদায় জমজমাট-মুক্ত বাজার - লাইন নেই, কিছু পয়সা ফেল, কিনে নাও -যার যা খুশি-আর কি নেই সেখানে — মানে আলাদিনের প্রদীপই পারে এমন একটা আস্ত বাজার এক পলকে বসিয়ে দিতে -এই মুহূর্তে পৃথিবীটা অভিভূত এলেনার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে-সেরা সব বিদেশী সেন্ট, মাথা ঘোরানো পোশাক পরিচ্ছদ পথের ওপর ঢেলে রাখা, হাঁকছে সব হাফদাম বার্লিন প্রাচীরের সম্মানে- সব হাফ দাম—

আত্মহারা এলেনা উঠে এসে বাবার কোল ঘেঁসে বসল—তুমি এমন চুপ করে আছ কেন বাবা—দুহাতে উলব্রিখ্‌টকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে আদুরে গলায় বলল—আমি একটা গাউন কিনেছি, বাবা—ভীষণ সুন্দর — মুখ তুলে

বলে দেখবে—উত্তরের অপেক্ষা না করেই ব্যাগটা সেন্টার টেবিল থেকে টেনে এনে জামাটা বার করে খুলে ধরে উলব্রিখ্‌টের হাঁটুর ওপর

হুঁ—উলব্রিখ্‌ট বললেন— ওটা উঠিয়ে নাও—

এলেনা জামাটা তুলে নিজের কাঁধের দুপাশে মেলে ধরল। ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন উলব্রিখ্‌ট— আগেরদিনে শোষকরাই এরকম পোশাক পরত, তিনটে জামার কাপড়ে একটা জামা—তা তোমার এ মাসের মাইনের সবটাই খরচ হয়ে গেল—

লজ্জায় মুখ লাল করে বসে পড়ে এলেনা, নতমুখে বলে— আছে অল্প কিছু—বাবার একখানা হাত নিজের কাঁধের ওপরে তুলে নেয়— সামনের মাস থেকে তো আমি এখানে থাকছি না —তাই

—মানে—চমকিত হলেন উলব্রিখ্‌ট

—কার্লের সাথে থাকব—

—কই কার্ল তো আমাকে কিছু বলেনি —চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে উলব্রিখ্‌টের—

—বাঃ কি আবার বলবে-আমি তো সাবালিকা বাবা— এলেনা বেশ ক্ষুন্ন হয়।

—বিয়েটা একটা মিলনানুষ্ঠান। শুধু দুজনেরই নয় সামাজিকও —কোলের উপর নতুন গাউনের অসংখ্য ফ্রিল আর ভাঁজের ভিতর দিয়ে গভীর আবেগে কাঁপা আঙ্গুল চালাতে চালাতে এলেনা বলে আমরা মোটেই প্রাচীনপন্থী নই বাবা, ওসব ছেঁদো ব্যাপারে আমরা নেই -- বাবার থমথমে মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরভাবে বলে—

—কার্ল বলেছে—আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, এর চেয়ে বেশি দাম বুঝি ওই ফালতু কাগজপত্রের!

উলব্রিখ্‌ট বলিষ্ঠ দুহাতে মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—

—তুমি কার্লকে খুব ভালবাস না—

—হ্যাঁ বাবা —গ'লে গিয়ে বলে এলেনা।

—তাই, ওর মতটাকে নিজের করে নিয়েছো—

—তা কেন এই স্পুটনিকের, পরমাণুর, যুগে বিয়েটা এখনও একটা রদ্দি মান্ধাতার আমলের ব্যপার হয়ে থাকবে নাকি—

—কার্ল ছোঁড়াটার দেখছি মাথা খুব সাফ,— শ্লেষের সাথে বলেন উলব্রিখ্‌ট আত্মামর্যদা বোধটাই শুধু কম —। দুজনেই কিছু সময় চুপ করে থাকেন। এলেনা আহত আর ক্ষুব্ধ। আর উলব্রিখ্‌ট ক্ষিপ্ত অথচ বিপন্ন। প্রথমেই কথা বললেন উলব্রিখ্‌ট — এলেন, মার্ক তোমাকে প্রোপোজ করেছিল না— তেতোমুখে এলেনা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। লালফৌজের বার্লিন দখলের মলিন ছবিটা অর্থহীন হয়ে ঝুলছে তার চোখের সামনে। উলব্রিখ্‌ট বলেন —সে তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছে এলেনা।

আত্মমর্যদাসম্পন্ন মানুষ একজন সম্মানিতা মহিলাকে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয়-- সে তাকে যোগ্য সম্মানই দেয়—

ধ্যাৎ, ঠোঁট ওল্টায় এলেনা।

উলব্রিখ্‌ট থামেন না— আগের সমাজে শোষকেরা— বিনা পরিচয়ে রক্ষিতা রাখত—সমাজ সে মেয়ের মর্যদা দিত না যদিও অনেক ক্ষেত্রেই ওই জীবনে তাদের বাধ্য করা হত।— তোমার কি আত্মসম্মান বোধটুকুও নেই —মার্ক হচ্ছে বেষ্ট অব দ্য লট— সাচ্চা ছেলে—

রাখ, উত্যক্ত হয়ে বলে এলেনা— গোবদা, গোবদা হাত পা, ধ্যাবড়া একখানা প্যানকেকের মত মুখ — আর ওই বেঢপ তালঢ্যাঙ্গা চেহারা —ব'লো না তো — ওর সঙ্গে বেরুলে লোকে আমায় টিপ্পুনি কাটে —চোখ মুখ করুণ হয়ে ওঠে তার।

নিজের বিশাল হাতখানা এলেনার সামনে মেলে ধরে সস্নেহে বলেন উলব্রিখ্‌ট—আমার হাতখানা দ্যাখ—এ হাতখানা তুমি ভালবাস না- এ হ'ল শ্রমিকের হাত, কর্মঠ লোকের হাত—কার্লের পেলব মার্কা নিষ্কর্মা হাত দেখে তুমি মজেছ—

—কি যে বল ও দেখতেও সুন্দর—

—তা বটে—দ্যাখোগে ও ব্যাটাচ্ছেলের বংশতালিকায় কমবেশি বনেদী রক্তের খোঁজ পাওয়া যাবে—ভালো পোশাক, ভাল খানা, কাজে কর্মে অষ্টরম্ভা—এসব তাদেরই কালচার—

—বেশ তোমার সঙ্গে এনিয়ে আর আমি কথা বলতে চাইনা যাও—রাগ করে উঠে পড়ে এলেনা, কোল থেকে তার দামী গাউন মাটিতে পড়ে যায়। উলব্রিখ্‌ট সাদরে টেনে নেন মেয়েকে নিজের পাশে, গাউনটা তুলে দেন হাতে—রাগ করে কোন সমাধান হয়? আলোচনার মধ্যে দিয়েই বরং একটা সঠিক মীমাংসায় পৌঁছানো যায়—বোস এখানে—

মেয়ের মাথা ঢাকা বাদামী চুলের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—আমি কি তোর ভাল ছাড়া খারাপ চাইতে পারি—বল—তোর এখন শিক্ষানবীশী চলছে। পুরো মাইনে কড়ি পেতে এখনও ঢের দেরি—ওই গুড ফর নাথিং ছেলেটার সাথে দুদিনেই ভালবাসা-বাসি-ফিকে হয়ে যাবে——

না বসে থাকব কেন, ইঃ—বিয়ের ফ্যাকড়ায় না গিয়ে সঙ্গে থাকার সুবিধেই তো এই। ডিভোর্স করতে বারে বারে কোর্ট যেতে হবে না—

—তুমি চলে আসত পার—সে পারে না—কি বুদ্ধি—তোমার আগেই ওর খারাপ লাগা যদি শুরু হয়, যদি—তাছাড়া তুমি মা হতে পার—

—আইনে তো বাধা নেই—এলেনা মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে।

—তা নেই, তবে কি জান বুকের বড় কাছাকাছি একান্ত বিশ্বস্ত একান্ত নির্ভর করার একজন মানুষ সারাজীবন দরকার, ক্লারা আর আমার মত, পাশাপাশি আছি আমৃত্যু, এই অনুভূতিটুকু যে কত বড় সম্বল তুই আজ তা বুঝবি না এলেন—ঠেকে যে শেখে তার চেয়ে দেখে যে শেখে সে বুদ্ধিমান।—

বিক্ষুব্ধ বিমূঢ় এলেনা উঠে দাঁড়ায়। বাবার দিকে পিছন ফিরে পাথরের টুকরোটা নাড়ানাচা করতে করতে বলে—কোথায় রাখা যায় এটা—

বলতে বলতে বই-এর র‍্যাকে লেনিনের আবক্ষ মূর্তির পাশে রাখতে যেতেই উলব্রিখ্‌ট হঠাৎ এক ঝটকায় মেয়ের হাত থেকে পাথরের টুকরোটা ছিনিয়ে নিলেন। তিক্ত ঝাঁঝালো গলায় বললেন—বার্লিন দেওয়ালের মানে জানো—এলেনা—অসউইচ, বুখেনওয়াল্ড জানো—চোখে মুখে উন্মত্ত ক্রোধ থম থম করছে—চীৎকারে ফেটে পড়েন তিনি—নাজী জানো—এলেনা—নাজী—

—কেন জানব না—চোখের কোণে দুষ্টু হাসি—গলা চড়িয়ে 'হের হিটলার' বলে পা ঠুকে কেতা মাফিক অভিবাদন জানায় এলেনা।

উলব্রিখ্‌ট সৈনিকের মাপা পায়ে দুকদম এগিয়ে আসেন—তুমি, তুমি নিও নাজী—বজ্র হেকে উঠে তাঁর গলায়।

—না বাবা, নাটকের মহলায় শিখেছি—হেসে গড়িয়ে পড়ে এলেন-তোমাকে কিরকম ভড়কে দিয়েছি—দুহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে-একি তুমি কাঁপছ বাবা, বসো, বসো তো, জোর করে সোফায় বসিয়ে দেয় উলব্রিখটকে।

—এলেন-আমি হিটলারকে দেখেছি, নাজী দেখেছি—মুখের যন্ত্রণায় রেখাগুলো ভেঙ্গে চুরে যেতে থাকে। বড় বিষণ্ণ নিভে যাওয়া তাঁর গলা।

—তা তো দেখবেই—বার্লিন তো তখন সারা জার্মানের রাজধানী ছিল—

—না, বার্লিনে নয়—মাথা নাড়েন উলব্রিখট—একটি নিষ্পাপ গ্রামে—আমাদের জুনিয়র স্কুলে—ফুলের মত শিশুকে স্কুলের বড় ছেলেরা ইঁদুরের মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছিল—কেননা সে ইহুদী—আমাদের সবাইকে দেখতে হয়েছিল—আমার মতই অনেকের জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাই আমরা—অনেকেই অনেক অনেক দিন পর্যন্ত বিকল স্নায়ু নিয়ে আমাদের চিকিৎসা চালাতে হয়। যারা সেদিন সে দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি—তাদের ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। বড় হতে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গার্ড করে পাঠানো হয়েছিল।

সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ গলায় বলল এলেনা—তোমার কিন্তু বড্ড নরম মন বাবা—ভি ডি ও ক্যাসেটে যা আমরা আকছার দেখছি, সেও কিছু কম যায় না—

—মানুষের পরে মানুষের দরদ থাকা দুর্বলতা—কি বলছিস তুই—মনে হচ্ছে তুই পারবি মরা মানুষের চুলের কর্সেট পরে, মানুষের চামড়ার ব্যাগ হাতে করে বেড়াতে বেরুতে—

—থাক বাবা তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ—এলেনা বিষয় পাল্টাতে উঠে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতদুর চোখ যায় ফিরে আসে।—মা তো এখনও ফিরল না—কি করব—

—আর একটু দেখি—মেয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উলব্রিখট বললেন—তোর মার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা জানিস—শুনিসনি কখনও নিশ্চয়ই—ট্রেঞ্চে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের দিয়ে ট্রেঞ্চ কাটা চলছিল—শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ক্লারার দেহ মৃতের মত পড়েছিল—তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করা

হয়েছিল— ক্লারা অফিসারদের ক্যাম্প কিচেন গার্ল ছিল —দেখেছিস তো তেমন আহামরিও নয়—আমি আজও জানি না সে ইহুদী কিনা, সে কোন দেশী। বন্দীদেরই একজন অল্প স্বল্প প্রাথমিক চিকিৎসা করে। একটু হাঁটাচলার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই ট্রেঞ্চেই লুকিয়ে থাকে ক্লারা। প্রশ্ন দেখা দিল—এর পর সে কোথায় যাবে—চলতে পারলেই তাকে সরে পড়তে হবে—অথচ সে কিছুই চেনে না—অনেক ভেবে আমি আমার মার কাছে পথ ঘাট বুঝিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। আমার বাড়িই ছিল নিকটে, আর গ্রাম্য পথ-ঘাট সহজেই চেনা যায়। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে গার্ডদেরও বেঁচে ফেরার আশা ছিল না—বললাম সে যদি আমার মাকে খুঁজে পায়—তবে যতদিন তিনি বাঁচবেন যেন তাঁকে দেখে—একুটু আমি তার কাছে আশা করি—

—বাবা—ওসব কথা থাক—এলেনা ঘন হয়ে সরে এল বাবার কাছে। দুহাতে মেয়ের গাল দুটো চেপে ধরে বলেন উলব্রিখট—আমাদের সন্তান হবার কথা নয়—তোমার মার সে সামর্থ্য ছিল না—তবু এই শেষ বয়েসে আমরা তোমাকে পেলাম—মা—

দুজনেই চুপ করে রইলেন—স্তব্ধতার পায়ে পায়ে অন্ধকার একটু একটু করে গাঢ় আঁচল বিছিয়ে দিচ্ছে শহরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘিরে।

—কি হল ক্লারার—এবার সত্যিই ব্যস্ত হলেন উলব্রিখট—ছুটি তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—ঘড়ি উলটিয়ে দেখলেন।

—আজ যা তুঘলকি কান্ড চলেছে—কি জানি মা আটকা পড়েছে বোধহয়—এতক্ষণ —একটু ভেবে যেন আশ্বস্ত করতেই বলে—দেখগে সপ্তাহের রেশনে লাইন দিয়েছে—কি অন্য কোথাও—আর কোন কিছু—

—ভর সন্ধ্যা বেলা কি যে বলিস—

—মা তো ওইরকমই — যখন তখন এটা সেটার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে যায়—ব্যাগের মধ্যে একটা ঝোলা পোরাই আছে—মুখ বেঁকিয়ে বলে এলেনা।

—সংসারটা শুধুই পেখম মেলে ওড়া নয় গো মা, রোদে জলে, ঝড়ে ঝাপটায় জেরবার হবার ধৈর্য, আর একটা দরদী মন থাকা চাই—মেয়ের পিঠ চাপড়ে বলেন উলব্রিখ্‌ট।

ঠোঁট উলটোয় এলেনা—অমনি জ্ঞান দিচ্ছ—

—বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—মেয়ের পিঠে হাত রেখে হাসেন উলব্রিখ্‌ট—আমি একটু ঘুরে আসি কি বলিস—

—ও বাব্বাঃ, আমার যে রিক্রিয়েশন কেন্দ্রে আজ নাচের আসর—ব্যস্ত হয়ে বলে এলেনা—ভুলেই গেছিলাম, তাড়াতাড়ি এস কিন্তু—

—আচ্ছা বাপু, তুমি তৈরি হওগে যাও—দেখি হিলডার ওখানেই পেয়ে যেতে পারি—

বেরিয়ে যেতে যেতে হাত নাড়েন—খানিকটা গিয়ে ফের ঘুরে আসেন—দুহাতে

দরজার পাট ধরে ঘরের ভিতরে ঝুঁকে পড়ে বলেন—যদি দেরি হয় দেখিস—দরজা টেনে দিয়ে চলে যাস—বুঝলি।

গুন গুন করে গান গাইছে আর হাল্কা পায়ে নাচের তাল পরখ করছিল এলেনা। নতুন গাউনটাকে ডাইনে বাঁয়ে কোন লয়ে কেমন করে ঘুরিয়ে সোয়ন লেকের মত ঢেউ তুলবে তাই রপ্ত করছিল। হেমন্তের শুকনো পাতার বুনো গন্ধ শিউরে দিচ্ছিল তাকে, বুকের মাঝে নিটোল সুখের মৌচাকে মধুর ক্ষরণ হচ্ছে ধীরে অতি ধীরে। একসময় আপন গরিমায় আপনি আপ্লুত সে সদ্য ডানা মেলা প্রজাপতির মত নিবিষ্ট হয়ে বসে রইল। আর মুহূর্তগুলি তাকে ঘিরে মোহময় জালবুনে চলল পরতে পরতে।

কর্কশ কোন শব্দে ঘোর লাগা নৈঃশব্দ থেকে জেগে উঠল এলেনা। প্রথমটায় ধরতে পারছিল না। সত্যিই সে কিছু শুনল—না কোন বিভ্রম। তাকে তো কারো নিতে আসার কথা ছিল না— তবে ওই হাঁদারাম মার্ক নয়ত! কিম্বা সত্যিই কার্ল—ত্রস্তে সে দরজা খুলে দাঁড়াল। সুরেলা গলায় মধুর করে বলল—কে—

ভারী নিঃশ্বাস ফেলে ক্লারা তার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন— ধর তো মা—একটু—হালকা দুটি হাতে মার ভারী শরীরটা চৌকাঠ পার করতে হাঁফিয়ে গেল এলেনা।

ঘরের আলোয় মার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় চেচিয়ে উঠল—মা, একি—ক্লালার একদিকে চোখ বুজে গিয়েছে। নীল হয়ে ফুলে উঠেছে কপালের একটা পাশ—ছেঁচড়ে যাওয়ার মত কয়েকটা চেরা টান চোয়ালে, বাহুতে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে—শরীরের ভার সোফায় ছেড়ে দিয়ে ক্লারা বললেন—তোর বাবা—

কান্না ঠেলে আসছে এলেনার। ছুটে রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল— বাবা তো তোমায় খুঁজতে গেল। বসো জল গরম করে আনি—হাড়টাড় ভাঙ্গেনি

তো—গাড়িটা থেমেছিল— না পালিয়ে গেল—

সোফায় হাত চেপে জোর করে উঠে দাঁড়ালেন ক্লারা—সর্বনাশ —এলেনা, আমি যাই। রান্নাঘর থেকে এলেনা ছুটে এল—

মাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে বলল—কখ্খনো না তুমি এখন কোথাও যাবে না মা— হাঁটতেই তো পারছ না। এক্সরে না করে—

না, না— ব্যাকুল হয়ে উঠল ক্লারা— কি ভয়ানক সব ব্যাপার স্যাপার — কি হতে কি হবে কে জানে — বড় উদ্বিগ্ন তিনি। পা টেনে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে —এলেনা, শক্ত করে দরজা এঁটে বসে থাকবি মা, আমি না আসা পর্যন্ত কাউকে খুলবি না— কথা শুনিস সোনা আমার—

লেনিন স্কোয়ারে তখন লেনিনের সুবিশাল ব্রোঞ্জ মুর্তির পাদদেশে কিছু শ্রমিক জমায়েত হয়েছেন। বিচিত্র বেশ ভূষায় সজ্জিত কিছু উদ্ধত যুবক চোখমুখ পাকিয়ে হম্বিতম্বি করছে, গালাগালি করছে অকথ্য ভাষায়—চুলোয় যা, রুশের দালাল, মেয়ে মানুষগুলোকে হটালাম তো এই বেওকুফগুলো এসে থানা গেড়েছে—আরে গবেট এ হ'ল স্রেফ ধাতু, মুল্যবান— এতো সামাজিক সম্পদের অপচয়—

স্কোয়ারের চতুর্দিকে শ্রমিকরা জড়ো হচ্ছে। প্রবল আওয়াজ উঠেছে— সর্বহারার

মহান নেতা কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার মার্কসবাদ লেনিনবাদ, -মূর্তিভাঙ্গা চলবে না—

—নিকুচি করেছে সর্বহারার—মাগনা খাচ্ছে দাচ্ছে, ফুর্তি করছে আবার মাথায় চড়ে পার্টিবাজী চালাচ্ছে—সব ঘুচিয়ে দেব — লেনিন চাই না, লিবার্টি চাই—

—গ্রেপ্তার কর বদমাশদের —গর্জে উঠল স্কোয়ারের আশে পাশে জোট বাঁধা জমায়েত।

কয়েক প্লাটুন পুলিশ ছিল, এতক্ষণে ট্যাঙ্ক নিয়ে সেনাবাহিনী এসে ঘিরে ফেলল গোটা চত্বর।

ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন উচ্চতায় দাঁড়িয়ে গেছে ক্যামেরাম্যানরা। ক্লারা কষ্টে পুরো শরীরটাকে রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়ে দিয়ে লেনিন মূর্তির পাশে জড়ো হওয়া শ্রমিকদের খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। পুলিসের একজন অফিসার ধাক্কা দিয়ে তাকে রেলিং-এর কাছ থেকে হঠিয়ে দিল। ক্লারা তার দিকে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে বলল —কুত্তার বাচ্চা, বেইমান—

কয়েকজন শ্রমিক ছুটে এলেন —একি ক্লারা—

অবরুদ্ধ কান্নায় গুমরে উঠল ক্লারা —আমরাই খবর পেয়ে প্রথম এলাম— ওঃ ওরা আমাদের গায়ে হাত তুলল —ব্যাট ছুঁড়ে এমন মেরেছে দ্যাখ এই পাটা নাড়তেই পারছি না—

স্কোয়রের ভিতর নজর করেই ক্লারা আবার রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকে পড়ল।

—উইলি, ওই, উইলি—কি বলছে ও। —কি করি এখন —বেদীর উপর দ্যাখ, উইলি না—

পুলিশ ছুটে আসছে দেখে শ্রমিকরা ক্লারাকে তাদের বেষ্টনীর মধ্যে টেনে নিতে চাইল—

না— চীৎকার করে উঠল ক্লারা—

একটি আগুনের ফুলকি উড়ে গেল— সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ। লেনিনের ভারীব্রোঞ্জের মূর্তি দারুণভাবে কেঁপে উঠল— প্রাণ পেয়ে তিনি যেন হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, মূর্খ, মূর্খ-

আবার বিস্ফোরণ। মূর্তিটা বেদী থেকে মাটিতে পড়ল বিপুল শব্দে—হাজারটা ক্যামেরা ঝলসে উঠল, টেলি ক্যামেরায় প্রতি মুহূর্তে সজীব হয়ে বাঁধা পড়ল।

একেবারে মৃতের শান্তি নেমে এল। থই থই রক্ত, খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিছিয়ে গেল চত্বরে। একটু পরেই আহত মুমূর্ষুর আর্তনাদে থেকে থেকে শিউরে উঠতে থাকল বাতাস, রক্তের কটু গন্ধ নাকে গলায় ভারী হয়ে আটকে রইল।

ক্লারা চোখ মেলল— কে যেন জল ছিটিয়ে দিচ্ছে চোখে মুখে।

গর্জন করে উঠল শ্রমিকরা —সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিন — জিন্দাবাদ, তারই নিচে কোথায় হারিয়ে গেল সেই আওয়াজ— লেনিন চাই না— লিবার্টি চাই—

রাস্তায় রাস্তায় নাচ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, বিকট প্রকট অঙ্গসজ্জা, বিমোহিত কবিতা পাঠ, গান, প্রায়োন্মুক্ত তরুণ তরুণীদের উদ্দাম উল্লাসে জর্জ্জরিত রাত এলেনা পার হয়ে এল— একা। গভীর উৎকণ্ঠায় কাঁটা হয়ে। সাথীদের উন্মাদনা আজ তাকে এতটুকু আলোড়িত করতে পারল না। বিস্ফোরণের বুক কাঁপানো শব্দে এই শূন্যপুরীতে একা থাকার দুঃস্বপ্নে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে রইল সে।

লেনিন স্কোয়ারে এখন মৃতদেহ সরানোর কাজ অচল। —আমাদের মৃতদেহ আমরা কবর দেব। আমাদের হাতে দাও— শ্রমিকরা পথ ছাড়ছে না।— দুষ্কৃতকারীদের এখুনি গ্রেপ্তার কর—

ক্রমে মানুষ জড়ো হচ্ছে, কাছে দূরে, গুচ্ছে গুচ্ছে পুঞ্জিত হয়ে হয়ে উঠছে। পুলিশ বেষ্টনীর ভেতরে সেই সব উগ্র যুবকরা এখন সুবোধ বালকের মত হাত পা গুটিয়ে বীয়ারের সাথে হামবার্গার চিবোচ্ছে। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে যে সব পাখিরা উড়ে গিয়েছিল তারা কেউ কেউ ফিরে আসছে—সতর্কতা উচ্চারণ করতে করতে।

কোন একসময় ক্লারা পার্কে ঢুকে পড়েছে। নজর এড়িয়ে লেনিন মূর্তির পাশে এসে দাঁড়াল সে। তার চোখ আটকে গিয়েছে একখানা বিস্তারিত হাত আর একটি দোমড়ানো পায়ের দিকে। একখানি চেনা কোটের পাট থ্যাতলানো মাংসে রক্তে জমাট। শরীরের সব শক্তি হারিয়ে সে বসে পড়ল সেখানেই।

একজন ফটোগ্রাফার ছুটে এল—এই কি হচ্ছে—কি করছ এখানে—

আঙ্গুল তুলল ক্লারা—মুখে কথা নেই।

—আরে কি কাণ্ড, এতো দেখি ডেডবডি—যাঃ শালা ফুল লেংথে ছবি নেব কি করে— তিড়ি বিড় করে লাফাতে লাগল সে—

একজন তদারকি পুলিশ এসে ক্লারাকে বের করে দেবার জন্য টানা হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। ক্লারার দৃষ্টি সেই ভারী হাতের পাতায় নিবদ্ধ—তার ঠোঁট নড়ছে—নিঃশব্দে—ভাষাহীন কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছে, সেই জানে—

আরো দুজন পুলিশ এগিয়ে এল—আরে ছেড়ে দাও—মিথ্যে ঝামেলা পাকিয়ে তুলো না হে—বাইরের উন্মুখ জনতার দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল।— যা হয়েছে—যথেষ্ট—সরকারী হুকুম— শান্তি রক্ষা করব—ব্যাস—

রেলিং এর গায়ে গায়ে পুলিশ বেটন উঁচিয়ে ছুটছে—হটো, তোমরা দেখছি চিল্লিয়ে মাথা খারাপ করে দেবে—আরে যাও, যাও দেখি সব—বজ্জাতগুলোকে আমরা টিট করে ছাড়ব—কাউকে ছাড়া হবে না—

ফটোগ্রাফার ক্লারাকে তড়পাচ্ছে—কি হ'ল শুনতে পাচ্ছ না, পুলিশ কি বলছে—গেড়ে রইলে যে আমাদের কাজ করতে দেবে না—না—কি—

পাশেই তালেবর গোছের ছোকরাকে ইশারায় বলে—দুচার মার্ক হাতাবার তালে আছে—আর কি—

ঘাড় উঁচু করে ক্লারা সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলল—আমার স্বামী—

ছেলেটা আঙ্গুলের উপর উঁচু হয়ে চেচিঁয়ে উঠল—আরে সেই ঠ্যাটা বুড়োটা না—বেদীর উপর চড়ে বক্তিমে ঝাড়তে গিয়েছিল—আমরা শ্রমিক, লেনিন আমাদের হাতিয়ার—হাতিয়ার ধরে রাখুন।

কাছেই দাঁড়ানো সাংবাদিক শব্দ গ্রাহক যন্তরটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ছুটে এল—থামহে ছোকরা—কি আবোল তাবোল বকছো—

সাংবাদিককে পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ছেলেটি বলল—ওই বুড়োটার কথাই বলছি—বাকিগুলো খসে পড়েছে—ও-ই—মোক্ষম সেঁটে আছে।

ফটোগ্রাফার তখনও গজ গজ করে চলছে—ফুল লেংথে ছবি ছাড়া এ ঝক্কি পোষাবে না বাবা—

ছেলেটি বলছে—মেটেই ছেলেখেলা না মশাই—পুলিশ ছোকরাগুলোকে সরিয়ে না দিলে ওদেরও কয়েকটা পোকার মত ঘায়েল হয়ে যেত—সাংবাদিকের ক্রমেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠছে—কানের কাছে মুখ নামিয়ে ছোকরাটি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল— ঠিক ডিটোনেটর ফিট করা ছিল—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় কাজ—হি—হি—

সাংবাদিক সজোরে থাপ্পড় কষিয়ে দেয় ছেলেটার মুখে—গালগল্প চালাতে এসেছ—ঘাড় ধরে পুলিশ পিকেটের কাছে নিয়ে যায়—ধরে রাখুন এটাকে—ডেঞ্জারাস গুজব ছড়াচ্ছে—

তারপর ধীরে সুস্থে ফটোগ্রাফারের কাছে এসে বলল—কি হে পারবে না—ফুল লেংথ চাই—কিন্তু—

অন্ধকার ফিকে করে পূবের আকাশে গেরুয়া আভা ফুটছে। নিদারুণ উদ্বেগে বিকল এলেনা পায়ে পায়ে লেনিন স্কোয়ারে এসে দাঁড়াতে জনতার পুঞ্জ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মার্ক—এস এলেনা—কাল সারারাত ধরে তোমায় রাস্তায় রাস্তায় নাচের আসরগুলোতে কত খুঁজেছি—কারখানার জ্যাবরা পোশাকে উস্কোখুস্কো অবসন্ন মার্ক গভীর সান্ত্বনাভরা দুহাতের বিশাল থাবার মধ্যে এলেনার ছোট্ট কম্পিত হাতখানা তুলে নিল।

ক্লারা তখনও হাঁটুতে মাথা রেখে সেখানেই বসে আছে—পাথরের প্রতিমূর্তি।

ক্রমে দিগন্ত জুড়ে লাল হয়ে সূর্য উঠল। শায়িত লেনিনের মূর্তি—রক্তে ধুয়ে হাজার শ্রমিকের হৃদয়াবেগে শাণিত হয়ে সোনার মত জ্বল জ্বল করতে লাগল।

উত্তর পর্ব

এ আবার কেমন মেলা — কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি। বুঝলে তো বোঝাবে! কেউ দেখেছে নাকি! শুধু বাবা বলেছিল — অনেক আলাদা। ব্যস্ত মানুষ যে, বেশি কথা বলবে কখন! এ নাকি সাক্ষরতার মেলা! তা রাভী পুরুল্যের মানবাজারের মূল্যায়ন ক্যাম্পে গেল — কই মেলা বসেনি তো সেখানে! তবে সে এক বেলার ব্যাপার মেলা বসিয়ে লাভ?

এই গোটা মাসটা ধরে সেন্টারে সেন্টারে চরকির মতো ঘুরছে সে দিদিদের সাথে — আবার নিজেরা নিজেরাও। সবখানে একটা না একটা জিনিস হচ্ছে -- দিদিরা বলছে প্রদর্শনী হবে, লোকে বলছে মেলা—। বলছে প্রদর্শনী শুধু নয়, খেলাধুলো হবে, নাচ গান হবে। ঝুমুরের লড়াই হবে। ছৌও হবে সবেতে পেরাইজ — পট লিখবার জন্যেও পেরাইজ আছে। ধুম লাগিয়েছে — বলছে মস্ত মেলা বসবে, এ মেলা শুধু সাঁওতালদের।

দিদি তাদের গানও শিখিয়েছে, তাদের কবির লেখা — এত কিছুর পরেও মেলার কোন ধারণাই সে করতে পারেনি। — অধীর হয়েছে দেখার জন্যে। ক্যাম্পে পৌঁছে আর সবুর সয়নি ছুটে এসেছে একেবারে মেলার মাঠে।

মাঠখানা বড় বটে। আকাশের গায়ে গায়ে মেঘের মত লেপটে আছে পাহাড়ের মাথা। গাছপালা কম, দূরে দূরে - কোণের দিকে পুরনো এক কৃষ্ণচুড়া গাছে শুধু ফুল আর ফুল-আলো করা বাহারী রঙ। চোখ টেনে রাখে।

হেই রাভী, বুলেটের মত ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সুন্দরী।

তুই — কি মজা একা একা ভালো লাগে নাকি — দু'জনে দু'জনকে ছড়িয়ে ধরে হাসে — অকারণ হাসি আর থামে না।

দেখেছিস —

না, চল — চল

টিন বেঁধে চ্যাটাই দিয়ে ঘর করেছে সার সার — অনেক খুলেছে অনেক খোলেনি। এখনও বাঁধা হচ্ছে — ছড়িয়ে রয়েছে হাজার জিনিস সাজানো চলছে —

কাঁচা বাঁশের গন্ধ, মাটির গন্ধ, খড়ের গন্ধে কেমন ঝিম ধরে যায়। গন্ধ যেন ভাপিয়ে উঠছে সব কিছু থেকে। ঘিরে ধরেছে সর্বাঙ্গ। দূরে কোথাও মাদল

বাজছে — মিহি সুরে। বাঁশি বাজছে — রাভী অভিভূত — সুন্দরীর কনুই চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে — কেমন রে ইতো পরবের মেলা।

সুন্দরী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কি কথা — জাহের থান নেই-নায়কে বাবা নেই, খাসি বলি, মোরগ বলি নেই, কাড়াং কাড়াং ধামসার বোল নেই — বড় জমকালো হয়ে ওঠে পরবের মেলা সুন্দরীর চোখে — বুকের ভেতরটা কর কর করে —

ইটাই ভালো — জেদ ধরে বলে রাভী - হাঁড়িয়া গিলে হাঙ্গামাটো নেই, উইটে আমার সয় না, পরব হলো কি লাচ আর লষ্টামি —

রাভীর কথা পড়তে পায় না সুন্দরী ঝেঁঝে ওঠে — দিকুদের বোল শিখে আপনার ধরম হেলা করিস — থুঃ ই কি, মেলা — ই তো বাজার — শালা দিকুরা বাজার বসাইছে —

দিদিরা লিখা শিখায় তারা দিকু না — মনে কালি আছে তোর — রাভী তর তর করে ভিড় ঠেলে টেনে নিয়ে যায় সুন্দরীকে, আয় আয — জীয়ন্ত মেমপুতুল দেখবি — মেমপুতুল ঝিকমিক জামা জুতো — কি সোন্দর —

দোকানী তুলে ধরতে টুলটুল চায় নীল বেড়ালপানা চোখ, রাভী হাতে নিতে তাজ্জব চোখ বুজিয়ে ফেলেছে —

লাজ হয়েছে, লাজ গো, — দোকানী হাসে, আরে বিটি সজা ধর সজা —

আবার কাঁদে — নাড়ে চাড়ে আর খিল খিল করে হাসে রাভী

ফ্যাল, ফেলে দে - সুন্দরী ফ্যাকাসে মুখে রাভীর হাত ধরে ঝাঁকায় — দানো ওটায় দানো আছে — তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, টান টান শক্ত হয়ে উঠেছে শরীর — শ্বাস আটকে গিয়েছে।

বকা মেয়া—কিচ্ছু না — দোকানী হাসতেই থাকে, একটা কাঠিতে কাদার ঢেলা পোরা আছে — মার্বেলের মত চোখ দুটো তার ভরে উঠে পড়ে —

না — না — ভয়ানক উত্তেজিত সুন্দরী রাভীকে টানতে টানতে নিয়ে আসে — কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে — শালা দিকুটা আমাদের তুক করবে — গাধা কোথাকার —

দু'জনে খানিকদূর অবধি নিঃশব্দে হেটে আসে। একসময় আপনমনে রাভী বলে - পয়সা থাকলে মেমের মাথাটা ভেঙে দেখতাম —

তুই মন্দ আত্মা মানিস না —

ও তো পুতুল —

জাহের থানে মাটির পুতুল দেয় না —

রাভী কান দেয় না —

এই — ওখেনে কি রে — দু'জনে সেই ভিড়ের দিকটায় এগিয়ে যায় — ভিড় কাটিয়ে ঢুকে পড়ে

অমা — এতো কাছকে বেলুন ফাটাচ্ছে — আমি হুই দূর থে তীরে ফোটাতে পারি — সুন্দরী বলে

বন্দুকে ফোটাতে কাছকেই শক্ত — চল দেখি —

ফাটিয়েছে — রাভী উৎসাহে চিৎকার করে ওঠে — ফাটিয়ে দিয়েছে — উত্তেজিত

দুজনে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ে। ছেলেটা চোখ তুলে একবার তাকায় তারপর গামছার পৌটলাটা তুলে নিয়ে চলে যেতে থাকে। দোকানী ডাকছে, আর পেরাইজ লিবে দাঁড়াও। রাভী তখন বলতে শুরু করেছে — আমাকে দাও তো আমি ফাটাবো — ছেলেটা পিছন ফিরে একবার তাকালো না পর্যন্ত।

কেমন চুপসে গেল রাভী তার মুখে যেন কালি লেপে দিয়েছে। — উঃ কি বা ছেল্যা বেলুন ফাটাইছে তো ভাবছে — মাছের চোখ বিঁধাইছে — গরম দেখ —

'লোধার ছা — উর কথা রাখ — ঠোঁট বাঁকায় সুন্দরী — পরক্ষণে চঞ্চল হয়ে ওঠে — উ দোকানে চুড়ি দ্যাখ — ঝলসাচেছ — কাচ ফুটানো, পুথি বসানো ওঃ কি সোন্দর — বল — রাভীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে সে। কত দাম — এগিয়ে যেতে রাভী আটকায়

থাক — অনেক দাম হবে — ক্যাম্পের পর টাকা দেবে — তখন — লিবি

অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাভী — দিদি বলছে টাকা নয় তাকে ভালো বই এনে দেবে। কি আর বলবে সে —

বাঁ হাতি দ্যাখ সুন্দরী — ওটা চরকি না —

উঃ বাপ ওখেনে ওই উঁচু — লাগর দোলার চরকি উলটো পাকে ঘুরছে কেমন — চল যাই — সুন্দরীর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে লোকজন কাটিয়ে সামনে এসে পড়ে রাভী — হাঁফ ধরে গেছে —

ই খেপে আমরা চড়বো — উৎসাহে চনমন করছে — তামাসা দেখ, ড্যাকরা গুলো চড়ে বসেছে — আহাঃ - হা হা হিহি হাসি দেখ না —

না বাবা! কোথা দুই উঠেছে মাথায় চক্কর দেবে—আমি না—

খুব পারবি — দুজনে জড়িয়ে বসব — সুন্দরীকে আশ্বস্ত করে রাভী। চরকিতে চোখ রেখে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে দুজনে — এক দঙ্গল মেয়ে ওদের ঘিরে ধরলো —

পালিয়ে এসে মেলা ঘোরা হচ্ছে — চল চল দিদিরা ঢুঁড়ছে — ঘেরার মধ্যে খেলা বসেছে শিগ্‌গির চল —

মাইকে নাম হাঁকছে। নিকষ কালো ছেলেটি কালো চিতার মত হালকা পায়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো তারপর দুলকি চালে খানিকটা ছুটে গিয়ে যেন পাখা মেলে বিদ্যুতের ঝলকের মত ওই উঁচুতে বাঁধা দড়িটা এক পলকে পেরিয়ে গেল — সেই ছেলেটা নিশ্চয় —

রাভীর বুকের ভিতরে - চিচ চিন করে উঠলো — যেন শিরায় টান পড়েছে। শ্বাস বইছে দ্রুত। মাইকে যতবার নাম ডাকছে তার চোখের সামনে একটি কালো চিতা উঁচু দড়িটাকে বার বার টপ্‌কে টপ্‌কে যাচ্ছে — একটু একটু ঘাম জমছে তালুতে — সেই ছেলেটা —

আবার আবার — চকখড়ির দাগটানা পথে এক ঝাঁকে দৌড়ে যাচ্ছে — ঝকমকে কালো পাথুরে শরীরগুলো একটা বিশাল অজগরের মত — অখণ্ড। একবার ঘুরে আসতে আসতে একজন ছিটকে গেল — চিৎকার উঠেছে ঝলকু ঝলকু —

ছিটকে আসছে আরও একজন, আরও একজন অজগরের মাথাটা যেন আলাদা হয়ে গেছে — পেছনের দিকে এঁকে বেঁকে আছড়ে পড়ার মতই কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে বাঁকি শরীর।

পাক ঘুরতে ঘুরতে ঘোর লেগে গেছে রাভীর। ঘুরে পড়বে না তো।

ওই তো ঘাসের পরে পা ছড়িয়ে বসেছে বোতলপোরা রঙিন জল হাতে হাসছে হুটোপুটি করছে — চোখ ফেরাতে পারছে না। ঠিক চেনা যাচ্ছ না — তবু যেন জানে — খাড়া বসে আছে সে — সবার মাঝে একলা একলা — সেই —

ছেলেদের খেলার তারিফ হচ্ছে খুব। এত হাততালি এতো হৈ হৈ ঝালা পালা লাগছে রাভীর। সুন্দরীক টেনে নিয়ে ঘেরা টপকে ঢুকে পড়লো মাঠে। দিদিরা দৌড়ে এলেন, মাস্টারমশাইরা, ভলান্টিয়াররা চেঁচিয়ে ওঠেন, মাঠে ঢুকবে না — বাইরে বাইরে —

রাভী অসঙ্কোচে বলে, দিদিমনি আমরাও খেলব

কি জ্বালা আগে নাম দিসনি কেন —

রাভী হাসে — দি নাই — তখন লাজ লেগেছে —

আমরা ছুটব — খরগোশের পারা ছুটতে মেয়েরাও পারে — হাড়ি কলসী, ছুঁচ সুতো, ওসব না — জান দিয়ে ছুটবি, সুন্দরী - বসা, পিলচু ওরা চোখ গোল গোল করে দেখবে — সুন্দরীকে তাতায় রাভী। কারুদিকে তাকাবিনা — শুধু চোখের সামনে — জিতা চাই — এক লম্বর লয় দুলম্বর — আমরা পেরাইজ লিব —

চোখে অন্ধকার দেখছে রাভী — আর কত ছুটতে হবে ঘুবতে ঘুরতে ক'পাক হলো — খেয়াল রাখতে পারছে না — সামনে কি কেউ আছে — বুকটা নিরেট লাগছে — দম ছুট হয়ে যাচ্ছে — কেউ চেঁচাচ্ছে না কেন -- মেয়েদের ছুটে বুঝি জেল্লা নেই —

তারপর আর কিছু মনে নেই। ভিজে গামছা মুখের ওপর, কারা যেন হাত পা ধরে টানাটানি করছে — ধীরে ধীরে উঠে বসলো রাভী। তাকে ঘিরে দিদিমনি আর খেলুড়েদের জটলা। খানিকদূরে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে ঝলকু নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে — ওর ভঙ্গিটাই যেন বলছে — হাঃ মেয়েছেলের কাণ্ড — লাফ দিয়ে উঠে পড়লো রাভী। এক ছুটে মিশে গেল মেয়েদের দলটার মধ্যে — তারা তাকে ঘিরে বেজায় হল্লা বাধিয়েছে। এতক্ষণে বুক তার হালকা হয়ে গেছে — ওই দেমাকী ছেলের জবাব সে দিতে পেরেছে তবে —

প্রদর্শনীতে এসে দিদিমনি আগেভাগে ঝলকুর লেখা পত্রখানা ওদের দেখিয়ে দিল। রাভীর হিংসা হচ্ছে পত্র সেও লিখতে পারে — তবে তার পত্র কেন দিল না দিদিমনি। অ্যাঃ কি বা ছেল্যা — সে অনেক পড়বে — তাকে আর ধরতে হয় না — ওই লোধা ছোঁড়াটার। রাভী তো স্বাস্থ্যদিদিমনি হবে — সব ঠিক। মেয়েদের বেলা পট লেখ, ঝুড়ি টুকরি, ফুল সাজি বানাও, গামছা কাঁথা বানাও মেয়েদের লেখাপড়ার দাম নেই — সে ও তো লেখাপড়ায় পেরথম — ওই ওরই মতন। দিদিমনিরা এক চোখা কেন ?

সুন্দরী বল — আমরা পারতাম না — ছেলেগুলান সব পেরাইজ লিবে — সব — বড় দমে যায় রাভী। ছেলেটাকে একদম সহ্য হয় না তার।

সুন্দরী মুখ ভেংচিয়ে বলে পেরাইজ ও পাক না কত পাবে — ওরে কে পুঁছে — ওর ঠাকমা ডাইন ছেল — ওই শয়তান ওর বাপকে জেল খাটাচ্ছে — নাযকে বাবা, জানগুরুরও জেল হতো পালিয়ে গেছে — কুনো সানতাল ঘরে ওর পা রাখা নেই —

রাভী আঁতকে ওঠে — কি বলে কি ঠাকমা ডাইন — বাপ জেল খাটছে — ঠাকুমাকে খুন করেছে নাকি ওর বাপ —

খুন — খুন বলে নাকি, ডাইনকে নিকেশ করলে পুন্যি হয় —

বাপ জেল খাটছে বললি — ঠাকুমা

ডাইনটা ওর পরে ভর করলো — ও ফড়ফড় করে সব বলে দিল দারোগাকে —

বেশ করেছে —

কি বললি তুই —

বললাম, বেশ করেছে, রাভী জোর দিয়ে বলে।

সুন্দরী নির্বাক। জবাব দেবে কি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এতো সাহস। কত বড় পাপ — রাভী জানে না? সুন্দরীর হাত খসে পড়ে রাভীর কাঁধ থেকে।

নিজের ভিতরে ডুবে গিয়েছে রাভী। প্রদর্শনীতে তার লিখা পট টাঙানো ছিল। যে ঘরখানায় রোগ ব্যামোর বিষয়, কি করতে হবে, কি করতে হবে না — সব কথা লেখা পটের পর পট করা আছে, তার মধ্যে তার লেখা পটই অনেক। স্বাস্থ্যদিদি শিখিয়ে দিয়েছে —

পটের সামনে এসেছিল ঝলকু। দূর থেকেই রাভীর নজরে পড়েছে। তবে সে এক পলক মাত্র। বারে বারে ওই পটগুলোর সামনে সে ঘুরে ফিরে এসেছে — রাভী জানে। তার খুব মনে হচ্ছে ঠাকুমার মরণটার দাগা ও ছেলেটা ভুলতে পারে না — কাজটা সঠিক না বেঠিক। বাপের শাস্তির দায় সত্যিই তার — কি না —

ডাইনটার ভর আছে ছেলেটার পর — ছেলেটা একটু কেমন একা ঘোরে অস্থানে কুস্থানে বেড়ায়, জাহির থানের গাছেও চড়ে — ফুল ছিড়ে নিয়ে আসে — আর মেয়ে মানুষ দেখলে — ছিটকে যায় — হি - হি - হি — যেন আংরায় পা পড়েছে — সুন্দরী হেসে হেসে বলেছিল। হবে না — ছোট বেলা থেকে ঘরে বাইরে লাঞ্ছনার মুখে ওকে কেবলই সরতে হয়েছে গুটিয়ে নিয়েছে অন্তরের স্বাভাবিক প্রকাশ। ও যে অচ্ছুৎ।

রাভীর মনও কি সাদা — ডাইন সে মানে কি মানে না — ঠিক করে জানে কি! ভূত সে মানে না, মন্দ আত্মার ক্ষতি করার ক্ষমতা সে মানে না — জোর করেই একথা সে বলবে — তবু এক সময় শিরশিরে এক অনুভূতি তাকে বশ করে না কি? যতই জানুক বইপত্তর লিখছে ভূত নেই — দেখা বিকল মনের কারসাজি — না রাভী ভয় পায়। একটা গাছকে ওঝা যদি বলে দেয় ভূতের থান সে কি যেতে পারবে

নির্ভয়ে একা এক — সেই গাছটার কাছে দিনের আলোতেও তার কি একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি হবে না! অথচ গাছ কি কারো ক্ষতি কবতে পারে কখনও।

বাবা বলেন, ভূত প্রমাণ করতেই মানুষই নানান ফাঁদ পাতে — অপকর্ম করে — রাভী মানে — আবার কেন যে জোর পায় না —

বাবা শুনলে বলবেন — ভয় আবার কি — শিশুর মন সরল সাদা — দিদিমনিরা তো তাইই বলে — । সমাজ তাকে পাঁকে ফেলে দেয় — অন্যায় শোনে, অন্যায় বোঝে, আর অন্যায় করে —

আর ডাইন রোগ ব্যামো করে দেয়, বুকের রক্ত শুষে নেয় — স্বাস্থ্য দিদির কথা শুনে শুনে তার যেন খটকা লাগে। ডাক্তারও বলেছে, — পট লিখার সময়, মশা যে রকম রক্ত চোষে — মানুষে সেই শুড পাবে কোথায়? মনের মধ্যে যুক্তির জোর যেন তল পায় না। বাবা বলে রঙ চঙ মেখে নানান আদিম গোষ্ঠীর মানুষ দেশে দেশে এমন বিকট দর্শন নায়কে বাবা, জানগুরু তৈরি করেছে। সমাজে একদিন যারা প্রয়োজনীয় ছিল — তারাই এভাবে গোষ্ঠীকে হাত করে ফেলে। বাবার পবে খুব রাগ রাভীর — নিজে কতো কি জানছে পড়ছে — তার বেলা কিছু শেখালো না। ভাগ্যে দিদিরা এলো তবে সে পড়তে জানলো। বাবা মিশনে ছিল — মা মরলে আর একটা মা এলো — ঠাকুরদা বাবাকে ঘরে রাখলো না।

বাবা পাস দিতে পারেনি। লোকে বলতে লাগালো জোযান হচ্ছে এবার ও ছেল্যা কেরেস্তান হবে — ঠাকুরদা নিয়ে এলো — । গাঁয়ের মধ্যে একা বাবা লেখাপড়া জানে। তার কাছে কেউ ঘেঁষে না।

সেই যেবার সরকার থেকে ইস্কুল করবে তোড়জোড় হচ্ছে — কে জানে মিশন থেকেই বুঝি বাবার নামটা যায়। এই বুড়ো বয়সে মনের মত কাজটা পেল বাবা। এখন সবাই আসে বাবার কাছে — নানান কথার ফয়সালা করতে। কিন্তু তার কথা বাবার নজরেই পড়লো না। কথাটথা ওঠেনি তাতো নয় — মা ঠাকুমা সব থামিয়ে দিয়েছে। এবার বাবাতে ওতে একটা চুক্তি হয়েছে — সে যাবে মিশনে ট্রেনিং নিতে — আর একটু পড়া শেখা হোক —

মেয়েদের শেষ বাসটাতেই জায়গা হলো রাভীর। নিজেদের সেন্টারের জিনসগুলো গুছিয়ে তুলে দিয়ে ক্যাম্পখালি করে সব মেয়েদের যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেলে তবেই সে ছাড়া পেল।

বাস ছুটছে, জানালায় বাতাসের মুখোমুখি সে। তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। শক্ত করে বাঁধা চুলের থেকে দু'চারটি খসে এসে চোখে মুখে পড়ছে। মন জুড়ে ছবির পর ছবি, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে — হাজার স্মৃতির অনুকণা। কালো ফিতের মত পীচরাস্তা দুফালি করে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। দু'দিকে সরে যাচ্ছে — সবুজের নিশ্ছিদ্র দেওয়াল। বাসের গায়ে ছুটে আসছে ঝরা পাতার ঝাঁক, সদ্য ঝরা ফুলের মিঠে গন্ধ। ক'দিনের অবিরাম সদা ব্যস্ত সময় পেরিয়ে ঘুম ঘুম আলস্যে শিথিল হয়ে আসছে দেহমন।

এখানে সেখানে লাল শুখা মাটির টাড়। পাহাড় খসা পাথরের ডাঁই। তারই পাশ ঘেঁষে ফুলভরা পলাশ, বনসৃজনের নতুন বোনা আকাশমণির ডালে ডালে হলুদ ফুলের শীষ। দূরে মঞ্জুরিত শাল জঙ্গলের মাথায় দুধেল ছায়া পথ। তাকে জড়িয়ে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশের জগৎ।

বাসের ভিতরে অবিরল কথা হাসি গান। একঝাঁক মেয়ে বৌ, তারা গাইছে নতুন শেখা গান। নাচছে নতুন কথার তালে। চারপাশের আঁটো ঘেরাটোপ খসে পড়েছে। রোজকার জীবন ঘরের চৌকাঠে ফেলে রেখে এক নতুন যাত্রায় পা মিলিয়েছে — গায়ে যেন ফুলের সুবাস লাগে, আকাশ যেন কত কাছের মনে হয় — কে মা, কে বৌ, কে কার পরিচয় নেয় — তারা পড়ুয়া। চোখ জুড়ে স্মৃতির উজ্জ্বল পটগুলো যেন ম্যাজিক লণ্ঠনের পিছনের সেই লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে — আর একবার। রাভী তাকিয়ে আছে — প্রকৃতি কখনও মনের আয়না জুড়ে ছবি হয়ে উঠছে আবার মুছে গিয়ে, ফেলে আসা সাক্ষরতা মেলার হাজার টুকরো স্মৃতির আনা গোনায় বিন্দু বিন্দু সুখে জড়িয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ স্বপ্নের মত।

এই গো — ঝিঙা ফুল বিটি লো — রাভীর মুখখানা নিজের দিকে টেনে ধরে ফুলমনি — কারে দিবা খোঁপার ফুল — সুর করে গেয়ে ওঠে —

কারা দিবা — ভেংচি কাটে রাভী। কারেও না —

উদাস নজর কেনে তোর — বল মঙ্গলা —

ওর মিতেরে শুধাও — হ্যাঁ লা সুন্দরী — মেলায় তোদের মন হারায়ে গেল — এখন কি হবে —

বাসসুদ্ধ সব হেসে ওঠে — চল খুঁজে আনি —

অমা, খুঁজতে হবে কেন — পেরজাপতি আপনি ঘুর ঘুরায়ে আসবে ফুলমনি রায় দেয়।

মেয়েদের বাসটা ছেলেদের লরি টপকে গেল হৈ হৈ করতে করতে — কে একজন পাখি ডেকে উঠলো। অল্প বয়সী মেয়ে বৌরা ঠেলাঠেলি করে মুখ বাড়িয়ে হাসছে — হাত নাড়ছে — ফুরফুরে খুশির নেশা ঝরছে। মৃদু সুর ভেসে আসছে 'কুটি কুটি বা বীরি বীরি, নারী বা গোসা গোসা'-বাঁশি বাজছে, সুন্দরী রাভীর কানের কাছে মুখ এনে বললো — বসারে চিনলি — বাঁশি বাজাচ্ছে —

রাভীর চোখে তখন শাল কোঁড়ের মত তরতাজ আলো পিছলানো একটা শরীর — যার মুখ দেখা যায় না — সিধো কানহুর মতো বর্শা উঁচিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে —

. দেখিস ওরা পেরাইজগুলো মাথায় তুলে নাচছে — সুন্দরী রাভীকে ঝাঁকিয়ে দেয় —

পেয়েছে - দেখাবে না -

সব ভালো পেরাইজ তো ঝলকুই ওঠালে — ওদের কি —

কেন রে, সুন্দরী, বুক কর' কর করে — চুনী টিপ্পনি কাটে —

বসাও তো পেরাইজ ওঠালো — ফুলমনি মাঝে পড়ে বলে।

ধুস — সুন্দরী উঠে চলে গেল।

যা কর কর ঝলকুর পরে লজর দিওনি

সুন্দরী পিছন ফিরে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়। ডাইনের লাতিরে লজর বাপ রে — লজর ক্ষয়ে যাবে না —

বাসের পিছনে থেকে একটি চিকন গলা শিউরে ওঠে

— মাগো, ডাইনের লাতি — মরুক ওলাউঠা হোক

রাভীর রাগ ধরে যায় — এসব পরের কচালি ওর একটুও ভালো লাগে না, সুন্দরীকে সে বলেছিল — কষ্টে সৃষ্টে বড় করলো মা, বুড়ো হলে সেই ছেলে খুন করতে এলো মাকে—সেটা কেমন রে — এই কি ধর্ম —

বুড়ো হলেই ডাইন হয় নাকি — জানগুরু তেলখড়ি করে বিধান যার নামে দেয় — সে ডাইন — তাকে শেষ না করলে টলায় মড়ক লাগে — ছারখার হয় —

রাখ — ওঝা, নায়কে বাবা, জানগুরুর কথা, সুন্দরী রাভীর মুখ চেপে ধরে — তুই বাপু কেরেস্তানি ফলাস নে — রাভী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তবু বলেছিল — ডাইন বলে খুন করার আইন নেই —

ওসব দিকুদের আইন — সানতালদের না — ঠাণ্ডা গলায় বলেছে সুন্দরী। রাভী উত্তেজিত হয়ে ওঠে — আমরা মানুষ খুন করবো — কুনো দোষ নেই — ভাল ব্যবস্থা তো — সুন্দরীর হাত ছাড়িয়ে রাগ করে উঠে গিয়েছিল রাভী — হচ্ছে খুন খারাবির কথা — তার আইন থাকবে কি না — সানতলরা সানতাল খুন করছে — তা কি আমরা ভালো বলছি — মাকে খুন করা তারচে খারাপ — সবচে খারাপ। — এই মুহূর্তে রাভীর সাথে চোখচোখি হয় সুন্দরীর।

শুনলি রাভী — তুই নজর করিস নি তো — ফুলমণির কথায় রাভী হেসে ফেলে — সব শক্ত কথা এমন জলো করে দাও না — বৌদি —

শক্ত কথা — ফুলমণি গালে হাত দেয় —

হাসির হুল্লোর পড়ে যায়। রাভী মুখ বাড়িয়ে দেয় জানালায়। যারে নিয়ে কুচ্ছো কুনো মেয়্যার পরে তারে নজর করতে দেখেছে — কে যে কথাগুলো বললো — আওয়াজ শুনেও ধরতে পারলো না রাভী —

বাসটা টামনার মোড় হয়ে আড়ষায় থেমেছে।

একা রাভী তার পুঁটলিটি কাঁধে নিয়ে নেমে এলো। বাবা আসবে সে জানতো, না হয়তো কেউ আসবেই — কেউ নেই। একা একা এই জঙ্গলের গা ঘেঁষা রাস্তায় এগুতে হবে তাকে। তারপর পাহাড় ঘেরা মুড়গুমা ড্যাম, টাড় ডহর পেরিয়ে গাঁয়ে পৌঁছতে সন্ধ্যা নামবে কি না কে জানে। মনটা মুষড়ে গেল রাভীর। এ পথে এখনো দলে দলে কাঠ মাথায় মানুষ জঙ্গল থেকে পথে নেমে আসছে — আবার ঠিকাদারের টহলদারী জিপগুলোও হরবখত গাঁ গাঁ করে ছুটে যায় —

বুকের ভিতর অভিমান গুমরে ওঠে — বাবা নয় না এলো — কেউ আসবে না — জিলা থেকে তার নাম গেছে না ক্যাম্পে! পথের পরে একটা মানুষ নেই।

মেঠো ইঁদুর পায়ের শব্দে এদিকে ওদিকে ছুটে পালাল না। গুঁড়ি বেয়ে তির তির করে নেমে এসে একরত্তি কাঠবেড়ালী মুখ বাড়ালো না। সব খারাপ লাগছে রাভীর। এখনই পাখিদের ফেরার কথা নয় — তবু যেন তারা কি আশঙ্কা বুকে নিয়ে ডানা আছড়ে আছড়ে ছটফটিয়ে ফিরে আসছে ঘরে। ডাকাডাকি করে সাড়া নিচ্ছে নিরাপদ বাসাটুকুর। গাছের গা থেকে ভ্যাপসা তাপ জমা হচ্ছে। পাথুরে মাটি এখনও তেতে আছে। রবারের চটি ব্যাগেই নিয়েছিল - নামিয়ে আবার পরতে হলো। জল তেষ্টাও পাচ্ছে — এদিকে আর জল কোথায় — বাজারে নামলে টিউকলে খেতে পারতো — তাড়াতাড়ি হবে বলে জঙ্গল ধারে নেমেছে — সেই মুড়গুমা ড্যামে পৌঁছে তবে জল খাওয়া। কি জানি — তখন বেলা আর থাকবে কি না —

উদ্বেগ নিয়ে হাঁটছে, গতি বেড়েছে হাঁটায় — মনোযোগও কমে গিয়েছে - পাথুরে চাঙ্গড়ে দু'একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচেছে। পীচ রাস্তায় জীপ ছুটছে। হ দ্যাখ ঝিঙা ফুল — নেশা চড়ানো গলার হুল্লোড় ভেসে আসতে রাভী থেমে পড়েছিল — হাঁড়িয়া গেলা ঠিকাদারের এসব গোলামগুলো নষ্ট — না হলে যে জঙ্গল তাদের প্রাণ — সানতাল হয়ে সেই জঙ্গল লোপাট করে দিচ্ছে! বন সৃজনের নতুন বাগিচাও। বাবার কাছে শুনেছে ছোটনাগপুর রেঞ্জে ছিল গভীর বনাঞ্চল — না হলে সিধো কানহুর কি লড়াই চালাতে পারত ইংরেজের সাথে — সানতালরা ছিল বনের জীব — এখন কি হাল সেই বনানীর। দল দল কাঠ মাথায় মেয়ে পুরুষ যাচ্ছে তো যাচ্ছে। বুকফেটে যায় রাভীর, পেট ভরানোর বড় জ্বালা বৈকি। বন কেটে শহরে যাচ্ছে। — দু'পাঁচ বছর যেতে না যেতে রোগে ভোগে সারা হয়ে গাঁয়ে আসছে মরতে। শহরের কোন্ কাজে তারা লাগবে — মেয়ে পুরুষে যায় তো মাটি কাটতে — পোড়া পেটটার জন্য তাদের উপায় চাই —

জনহীন মুড়গুমা ড্যামে এসে শরীর জুড়িয়ে গেল। সূর্য ঢলে পড়েছে। চারপাশের পাহাড় চূড়োর ছায়ায় জলের ওপর নরম আলোর রঙ বদলের খেলা। পাথুরে পাড়ে ছোট ছোট ঢেউ-এর শব্দ পর্যন্ত প্রতিধ্বনি হয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার অনুভূতি ফিরে এসেছে আবার — ক্লান্ত শরীর একটু বিশ্রামও চাইছে — রেলিং ঘেরা জলাধারের পাশে নিশ্চিন্তে বসে পড়েছে রাভী। একটু বসে নিয়ে জল খাবে — বাড়ির পথে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের পিছনে সূর্য নেমে গেলেই — সন্ধ্যা নেমে যাবে — এবার তাকে আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে — তবু প্রকৃতির স্তব্ধতা ভাঙতে তার প্রাণ সরছে না। জলের কোল ঘেষে অপরাজিতা নীল শাপলা ফুটে আছে, মাত্র একটি রাঙা কিনারা সবুজ থালার মতো পাতা জলে দুলছে। তারই পাশে আটকে আছে ভাসিয়ে দেওয়া ইতুর সাজ। সবে জলের কোলে নেমে দাঁড়িয়েছে রাভী, তাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে একটা বড় পাখি আচমকা কক্কক করে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর চক্কর দিয়ে গেল। বন্য জীবনের অভ্যাস রাভীকে সতর্ক করে তুললো। ওদিকটায় কারা আসছে না তো! — কোনমতে দু'আঁজলা জল তুলে চোখ মুখ ধুয়ে, খেয়ে নিল। তারপর পোঁটলা কাঁধে চড়াই পথে উঠতে থাকলো দ্রুত। দুই পাহাড়ের খাঁজ বরাবর উড়ে

এসে দাঁড়াতেই চোখ পড়লো সর্বাঙ্গে আগুনের ধিকি ধিকি শিখা জড়ানো পলাশ গাছটায়। পাতা বিহীন — শীর্ণ কালচে শাখা প্রশাখায় আগুন রঙা ফুলের সাজ।

বাতাস যেন কানের কাছে বলে উঠলো — ফুল লিবে —। দূর থেকে ভেসে আসা কথার মতো। শিউরে উঠলো রাভী। কি জানি কি অপদেবতার ছল — সে আর দাঁড়াবে না —

কয়েক পা এগিয়ে যেতে না যেতে তার সামনে ছিট্‌কে এসে পড়লো ফুলভারা পলাশের ভাঙা ডাল — ঠিক সেই ফুল — লাফিয়ে ছিটকে এলো রাভী। সারা শরীরের রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে — চোখ ঠিকরে যাচ্ছে — ঘাম নামছে. বিন বিন করে — মন্দ আত্মার কাজ! কোনমতে ডালটার পাশ কাটিয়ে এসে এলোমলো ছুটতে শুরু করে দিল রাভী। আর তখনই পাহাড়ের কিনারা থেকে ধপ করে কে একজন রাভীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পলকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কোমরের ছোট্ট ছুরিখানা টেনে. বার করলো — তাহলে মন্দ আত্মাটাত্মা নয় —

একা কেনে — গাঁয়ের .কেউ নাই —

চোখ বুজে বুক ভরে শ্বাস টেনে নিল রাভী। হাতটা সামলে নিয়েছে। এটা তালে এদ্দুর এসেছে — হাসি পাচ্ছে তার। মেয়ে মান্‌ষে নজর নাই —

ই কি তামাসা — রুখে দাঁড়ালো রাভী

পলাশের ভাঙা ডাল হাতে ঝলকু দাঁড়িয়ে — একা যাচ্ছ কেনে —

রাভীর মুখে এসে গিয়েছিল — তুমার কি। গা ছাড়া ভাবে উত্তর দিল — উরা আগের খেপে এসেছে —

তুমারে একা ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি —

একা আমি খুব যাই — রাভী বিরক্ত হয়েছে। এত' মতব্বরী কিসের।

বেশি সাহস ভালো না —

না, মেয়াদের তো কিছু ভালো না — — রাভী ফেলে দেওয়া পোঁটলাটা ফের কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ঝলকু হাঁটছে অনেক এগিয়ে — রাভীর চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে চাপতে পারছে না কিছুতেই। পিছন ফিরে ঝলকু একবার তাড়া লাগাল — জলদি পা চালাও — রাত নামবে বাড়ি যেতে —

রাভীর প্রশ্ন অন্য — ইদিক পানে এসেছে কেউ থাকে —

তুমাকে পৌঁছাতে —

হুঁ — ভারি —

তাই বটে — জীপ দেখেছিল — কারা ছিল জান,

ওদের বন্দুক থাকে —

"সূর্য নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের ও পিঠে। ছায়া ঘিরে আসছে চারদিকে থেকে। নিঃশ্চুপ দু'জনে। ঝলকু দাঁড়িয়ে পড়ে বললো এবার যাও — আমি — আর যাব না —

রাভী বিহুলের মত তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে — ভেবে পাচ্ছে না — সে কি চাইছিল ঝলকু তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এ পথ তবে এখানেই শেষ — সামনের

উঁচু টিলার নিচেই তাদের গ্রাম। সেখানে জংলা ফনীমনসা, বাবলা, আকাশমনিব নতুন চারার সারি শন ঘাসের বড় বড় ডহর — তাদের পঞ্চায়েত বন গড়ছে। নামতে নামতে সে হারিয়ে যাবে তার পিছনে।

পলাশের ডালখানা বাড়িয়ে দিয়েছে ঝলকু। রাভী দাঁড়িয়ে আছে — মন বলছে — চল না, গেলে দোষ নেই — কিন্তু বলতে পারে কই — ঝলকু চলে যাচ্ছে — পাথরের খাঁজে পা রেখে, উঠে যাচ্ছে সে — পশ্চিমের সেই পাহাড়টায় একটু আগে যার পিছনে সূর্য অস্ত গিয়েছে। নিভু নিভু আলোটুকু এখনও আকাশের প্রান্তে লেগে রয়েছে। রাভীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কোথায় যাবে এখন এই আঁধার মাথায় করে ছেলেটা।

দরজায় তালা বন্ধ দেখে রাভী অবাক হল। অস্পষ্ট গোলমালের আওযাজ ভেসে আসছে — পথে তো কারো সাথে দেখা হালো না কিসের গণ্ডগোল কি করে বুঝবে। ক্লান্ত অবসন্ন দাওয়ার পরে উঠে বসল। কতক্ষণ বসতে হবে ঠিক আছে। সবাই জানে সে আজ ফিরবে — তাও —

হন হন করে এগিয়ে আসছেন তার বাবা, এসেছিস—যা ভাবনা হচ্ছিল—রাভীকে দেখে খুব আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি—

যাও নাই কেনে তুমি — অভিমানে রাভীর চোখে জল এসে যায়। — একা একা -

যাব কি — হঠাৎ খবর হয়ে গেল ঝাড়খণ্ডিরা আসছে — কি করব — সেবার যা হয়ে গেল —

রাভী আঁতকে উঠলো — তাই —

সোমরা খবর করলো — কোন ছেলে তোর পথ আটকেছে

ও তো ঝলকু — আমায় পৌঁছে দিল —

ঝলকু — কোথায় পেলি তাকে —

ও-ও ক্যাম্পে ছিল —

বাবা তাড়াতাড়ি চাবি খুলে দিলেন। মালপত্তর রেখে তুই পরবের থানে চলে আয় — বউ ঝি বাল বাচ্চা ওখেনেই আছে, তোর মাও সেখেনে —

বড্ড খিদে পেয়েছে বাবা — পলাশের ডালটা দরজার ঝাঁপে গুঁজে রাখলো রাভী — আলতো করে হাতটা বুলিয়ে দিল — আগুনে কুঁড়িগুলোর ওপর।

বাবা দাওয়ায় বসলেন। কাঁসিতে পান্তা বেড়ে খেতে বসেছে রাভী — সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল দরজায় — মাস্টার বাবা — ওরা বুঝি আসবে না — ঝলকু ঘুরে যাচ্ছে — উকে আটকাবো —

বাবা — এঁটো হাতেই উঠে এসেছে রাভী — কি হয়েছে — মেয়ের ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মাস্টার। দাওয়া থেকে নামতে বললেন — তুই খেয়ে নে — তোর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি — সবাইরে এবার ঘরে যেতে বলি —

কেন বাবা — মাস্টার ছেলেটিকে রওনা করে মেয়ের মুখোমুখি এসে

দাঁড়ালেন — মহাবীর মুর্মুর পরিবারকে পুড়িয়ে মারার দিন ঝলকুকে দেখা গেছে এদিক পানে ঘোরাঘুরি করতে — তাই —

রাভীর চোখের সামনে আংরা হয়ে যাওয়া ঝুপড়ির মাঝখানে কচিকাঁচাগুলো জড়িয়ে ঝলসে থাকা বউটার চেহারা ভেসে উঠতে — গা ঝিম ঝিম করে উঠল।

মাস্টার আর দাঁড়ালেন না —

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল রাভী। সামনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাথুরে পথে ঝলকু চলে যাচ্ছে — সূর্য নেমে গেছে যেখানে — তরুণ তালের মত লম্বা ছায়া ফেলে সেও নেমে যাচ্ছে —

তবে যে সে বললো — তুমার স্বাস্থ্যর পটলিখা খুব কাজের হয়েছে — সেই তো প্রথম মন খুলে হাসল রাভী — আনন্দে কলকলিয়ে বললো — স্বাস্থ্যদিদিও বুলছে — তুকে টেরনিং দিব — বাবাও বুলছে —

খুব খুশি লাগছে লয় — হেসে ওঠে ঝলকু — তার সমস্ত উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিল সে — টলায় টলায় ঘুরবা — স্বাস্থ্যদিদির মতন — সে তো দিকু — তার জানগুরু, নায়কে বাবা নাই — ওরা তমার চুল ছিঁড়ে লিবে, চোখে মুখে থুক দিবে, তুক করবে — পাগল বানাবে, ডাইনে বানাবে — গলা চড়তে থাকে ঝলকুর —

কঠিন হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় রাভী — লোকে অত বোকা নাই — বদলাচ্ছে —

রাগে ফুলছে সে। তাকে দমিয়ে দেবার এই চালাকিটা মোটেই ভাল লাগছে না। মুখ গোঁজ করে হন হন করে হাঁটছে। পাশে পাশে হেঁটে আসছে ঝলকু, জ্বালা ধরানো হাসি মুখ করে — একা সেয়ানা নেকড়ের মুখে পড়বা — একা দাঁড়াতে হবে — উদের মন্দ বুদ্ধিতে সব মন ঘুরে যাবে — বলতে বলতে উত্তেজনায় গলা ছুরির মত শানিয়ে উঠছে —

একটা জুৎসই জবাব খুঁজছে রাভী — ঠিক মুখের মত জবাব — বেয়াড়া ছেলেটো একেবারে নাক ঘসা খেয়ে যায় — এতো কেবল রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখার মত হালকা কথা নয় — জীবনের গভীরে রয়েছে শিকড়। কথাগুলো যে সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখানেই তার জ্বালা —

আর সেই আংরাপানা মুখের দিকে তাকিয়ে হা - হা করে হাসছে ঝলকু — প্রাণ খোলা হাসির প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসছে — হাসতে হাসতে ফিরে যাচ্ছে ঝলকু —

ঘরে ঢোকার মুখে পলাশের ডালটায় চোখ আটকে গেল — একটি কুঁড়ি ছুঁয়ে দেখল রাভী। তার মধ্যে কি তাপ জমছে — সাড়া জাগছে — আঁটো মুঠি আলগা হয়ে যাচ্ছে। শিথিল হচ্ছে একটি পাপড়ির থেকে আর একটি পাপড়ির হালকা ডানা — ওরা ছোট ছোট প্রদীপ হবে — আলো দেবে — ঝরে যায় যদি — আবার জ্বলে উঠবে —

ঝলকু তোমারও একাজ

অবরোহ

শেষ রাত থেকে দাঙ্গা বেধেছে — শহরের গরিব অঞ্চলে। সকাল থেকেই পুলিস কিছু লাশ, আর কিছু গুরুতর আহতদের নিয়ে আসছে আউটডোরে। হাসপাতাল একেবারে তটস্থ। সব শিফ্‌ট চেঞ্জ বন্ধ।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। ছুটি মিলেছে অহনার কিছুক্ষণের জন্য। খবর পেয়েছিল কেউ তার সাথে দেখা করতে এসেছে। ব্যস্ত হয়ে ফিরছে সে। এই দুর্যোগের দিনে কে আবার এল তার কাছে। রোগী ছাড়া আর কারো দেখা সাক্ষাৎ কমতে কমতে বন্ধই হয়ে এসেছে। তার বদলির চাকরি। যখন তখন দেখা পাওয়া সহজ নয় — তাই নিজে থেকে না গেলে — সেও আর কত হয় —

কোয়ার্টারের কাছাকাছি এসে নিশ্চিত হল অহনা — বাড়িটা রোজকার মতই নিরুত্তাপ। এসময় কাজের মেয়েটি চাবি লাগিয়ে চলে যায়। রাতে আসে ওর কাছে শুতে। অহনা দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো — গায়ের এপ্রন খুলে টাঙ্গিয়ে দিল — স্টেথোটা পেঁচিয়ে ছুঁড়ে ফেলল টেবিলে — বাথরুমে ঢুকল। কাপড় জড়িয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ানক চমকে উঠল। ভয়ে হিম হয়ে তাকিয়ে রইল এক জোড়া নিস্পলক চোখের দিকে। শিকারের ওপর নজর রাখার মতই সে চোখ তার ওপর নিবদ্ধ।

'কে' — আঁতকে উঠে ত্রস্তে ঘুরে স্তব্ধ হয়ে গেল অহনা। বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল শরীর বেয়ে —। তখনও সেই নিথর চোখ জোড়ায় কোন ভাবান্তর নেই। দু'হাতের দশটা আঙুল মুখোমুখি জুড়ে তার ওপর থুতনি রেখে সে নির্বিকার বসে।

তুমি — কোনক্রমে বলতে পারল — একমুখ অপরিচ্ছন্ন দাড়ি, গায়ে দেহাতী নোংরা জোব্বা সত্ত্বেও শুধু বসার এই ভঙ্গিটিই তাকে মানুষটাকে চিনিয়ে দিয়েছে। অশেষ।

অশেষ — সে ছাড়া এমন রোমহর্ষক নাটক আর কার মাথায় আসবে — ততক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে অহনা। যথাসম্ভব নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে, একটু কষ্টকর হাসিও হাসতে পারল। অপ্রসন্নতা সে ঢাকতে চায়নি।

তারপর হঠাৎ — অশেষের সারা অবয়বে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের স্থায়ী ছাপ। পোশাক থেকে ঘুলিয়ে ওঠা বিশ্রী গন্ধ, চোখ দুটো কোন অতলে দপদপ করছে,

ময়লার পুরু আস্তরণ মুখে গলায় হাতে-নখের গহ্বরে পর্যন্ত — যেন ফুটপাত থেকে উঠে এসেছে — মনটা হায় হায় করে উঠল -- অবশেষে এই —

কাছে সরে এল অহনা — অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁধে আলতো হাত রাখল — স্নান করে এস — যা দশা তোমার —

সঙ্গে সঙ্গে হাতটা চেপে ধরল অশেষ -- খুব ঘাবড়ে গেছিস না —

অহনা হাত ছাড়িয়ে নেয় — এখানে এলে, জানলে কি করে — চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অশেষ — আচমকা অহনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে — তার সদ্য ধোয়া মুখের উপর নোংরা মুখখানা ঘষতে ঘষতে বলল — আমি জানি, অনেক দিন থেকে জানি —

তা'হলে আজ হঠাৎ —

অহনাকে তেমনি আচমকা ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ে অশেষ। হাত দিয়ে দাড়িয়ে মুচড়ে ধরে, ঝিম মেরে বসে রইল।

এসেছি — তোকে বলব সব — আমার একটা কৈফিয়ৎ তোর প্রাপ্য। আপন মনেই বলে — হেনা, মানুষ তো মানুষকেই ভালবাসে — মন থেকে যাদের মনুষ্যত্ব মুছে যায় তাকেও কি ভালবাসা যায় — একটু থেমে আবার বলে, মানে আগেও যে ভালবাসার পাত্র ছিল — পরেও সে তা থাকে — অশেষ এখন একেবারে অন্য মানুষ — রুক্ষতা গলে গিয়ে, মালিন্য মুছে সে ক্রমে সজীব হয়ে উঠছে।

যত্ত চিপ সেন্টিমেন্ট — হাসে অহনা -- নাও দাড়িটা ঘুচিয়ে দাও।

সে কি পাসপোর্ট পিকচার। আমার আইডেনটি —

অহনা যত্ন করে আলমারি থেকে সেভিং সেট, পাজামা পাঞ্জাবী বের করে সামনে ধরে —

তোর লিভিং পার্টনারের বুঝি — অশেষ চোখ পিট পিট করে হাসে — অন্যের জিনিস আমার —

অন্যের কেন হবে —

অশেষের কৌতুক মুছে গেছে — দু'জন দু'জনের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল —

কিছুটা কামিয়ে অশেষের হাত থেমে যায় — আয়নার দিকে বিমূঢ় চেয়ে থাকে — নিজেকে চিনতে পারব তো। মাথার উপর পাখাটা বন বন করে ঘুরছে — অহনা তবু ঘামছে, চোখ মুখ গরম শরীরে যেন ভাপ উঠেছে — অশেষের মুখের একপাশ পরিষ্কার হয়েছে। অপর পাশ থেকেও খসে আসছে অপরিচয়ের আবর্জনা — এমন একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে — একি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল। যা গেছে তা চিরকালের মত গেছে। সে তো ফিরেও দেখতে চায়নি আর শেষ মুহূর্তে গালের উপর কাটা দাগ ফেলে ব্লেডটা হাত ফসকে পড়ে গেল অশেষের — সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ফুটে উঠল — অহনা ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরল —

বোরোলিনের টিউবটা বের কর — বাঁদিকের ড্রয়ারে — তুমি সত্যি পালটাওনি —

অশেষ ঘুরে ডান হাতে অহনার কোমর জড়িয়ে ধরে — মনে আছে আমায় প্রথম চুমু খেয়েছিলি — সেদিন — উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে। সব দূরত্ব মুছে গেছে, সহজ হয়ে গিয়েছে সব জটিলতা। অহনা ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠল। আত্মহারা হবার মুহূর্তে অশেষ বলে বসল — আমার কোন খেদ নেই হেনা — এ আমি ভালই আছি — তুই ওসব সেন্টিমেন্টাল রাবিশ মনে রাখিস নে —

অহনা তখনও জীর্ণপত্রের মত কাঁপছে — অশেষের কথার স্রোতে তার ওপরে একের পর এক ঢেউ ভাঙছে — শ্বাস নেবার অবকাশ নেই — মুখ সাদা হৃদস্পন্দন ক্ষীণ — কিছুই কানে যাচ্ছে না। শব্দগুলো ধাতব রোলের মত কানের পর্দায় আঘাত করে যাচ্ছে একঘেয়ে একটানা। অহনা বিশদ করে না জানলেও অনেক কথা জেনেছে, অনুমান করেছে ওর অসংলগ্ন চিঠিপত্র থেকে — আর শোনার প্রয়োজনই বা কি — নতুন করে সেদিনের সেই অনুভূতির কটু স্বাদ আর নিতে চায় না সে।

হেনা — হেনা এই জঘন্য ডিবচটাকে চিনিস — কখনো না — সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে অশেষ — তার চোখ আয়নায়

তুমিই তো।

ন্যাকা — বুকে ঘুষি মেরে বলে — আমি তো আর বেঁচে নেই — নিভন্ত এক গ্রহকক্ষে এক টুকরো কয়লার মত আমি ঘুরছি ঘুরছি — অশেষের চোখ মুখে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে — হাঁ করে কি দেখছিস — ঠিকই ধরেছিস তোর ডায়গোনিসিস্ কি ভুল হবে —

মরবিড — মরবিডিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নিজেই একটা মরবিড হয়ে গেছি — জানিস্ তো স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তাড়াতাড়ি ছাতা গজায় —

তুমি এন্ডোক্রিনোলজিতে স্পেশালাইজ করেছিলে না —

ও দুটোয় যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক — আমার রুমমেটের ছিল নিউরো-সাইকোলজি — প্রথম প্রথম দু'জনে খুব মেতে উঠেছিলাম — শেষে কেন্দ্রচ্যুত শেওলার মতো ভেসেই গেলাম — হ্যাঁরে একটা পাষণ্ড কবে তোকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বিলেত যাবার খরচা জোগাড় করে নিল — আর তুই আশায় আশায় বসে থেকে জীবনটা মাটি করলি — তোদের সেই সীতা-সাবিত্রী ধাঁচটা আর পালটালো না — ধ্যুস। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে যায় — তোকে আমিও ভুলিনি — খুবই কষ্ট পেয়েছি — এ রকম প্রবৃত্তির টানা হ্যাঁচড়ার মধ্যে — অসম্ভব সব মুহূর্তে — তুই এসে দাঁড়িয়েছিস — অপটিক্যাল ইলিউশনের মত — অন্যায় যার উপর করেছি — বিবেকহীন মানুষ তাকে ভুলবে কেমন করে —

অহনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে — উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। প্রায়োজনীয় শব্দই খুঁজে পায় না।

— আমার দিকে অমন তাকাসনে বাবা, তোর চোখে চোখ পড়লে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে — কথা আটকে যাবে — আমার কোন লজ্জা, কি গ্লানিবোধ বলে কিছু আছে তা যেন মনে করিস নে — অন্ধকারের উৎকট আকর্ষণে উদ্দাম ছুটোছুটিতে

কবে আমার মন মরে গেছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছিস — খারাপ লাগছে — না —

আমি কিছু শুনতে চাইনি — থাক অশেষ —

অহনাকে দেখতে থাকে অশেষ। অনেক পরিণত হয়েছে অহনা। আগের সেই প্রাণোচ্ছল লঘুহৃদয় মেয়েটি আর নেই।

তুই একা থাকিস — লিভিং পার্টনার নেই —

একথার কোন জবাব হয় — অহনা হাসে।

অশেষ চমকে যায়। এখনও ওর হাসিটা এত অনাবিল। বিষাদ নেই, বেদনা নেই — রোগীরা নিশ্চয় এ হাসিতে বুকে বল পায়। কিন্তু সেই হাসি যা তাকে মুগ্ধ বিবশ করে দিত — সে হাসি আর ফিরে পাওয়া যাবে না — শিশুর মত সরল, বালিকার মত চঞ্চল অহনা প্রেমিকার মত মোহিনী হারিয়ে গেছে।

তুই তো জানিস, আমি একটু মারকুটে ছিলাম — একটা কেসে ফেঁসে গেলাম — নোংরা ব্যাপার — কি বলব তোকে — সাঙ্গপাঙ্গোও ছিল। তোর শুভার্থীরা হতভাগারা তখনও ভাবত আমাকে টেনে তুলতে পারবে —

আর ব'কো না তো — মাথা ধরিয়ে দেবে নাকি — নাইট করে ফিরেছি — কিন্তু তার জন্যে বিচলিত হতে অশেষের বয়ে গেছে —

তোর টাকায় গেছি, স্কলারশিপ বন্ধ — আর তো থাকা যেতো না — আবার বল ফিরবই না কেন — এমন রগরগে রোমাঞ্চকর জীবনযাপন কেউ ফেলে আসতে পারে — ওখানে ঘষে ঘষে টিকে গেলাম — খুব মুশকিলে ফেলেছি তোকে না — হাঃ হাঃ কিন্তু তখন বললাম না যে আমার একটা কৈফিয়ৎ তোর প্রাপ্য — ছাড়াছাড়ি নেই, তোকে এই প্রলাপ শুনতেই হবে —

তুমি এসেছ — বেশ তো, কি হবে অতীত ঘেঁটে — মিথ্যে বলেনি অহনা — সে এখনও বিভোর হয়ে আছে — বহুদিনের চেনা একটা পুরনো সুর অন্তরের তারে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল একদিন — সেই সুর কবেকার হারানো স্পন্দন বয়ে আনছে — ছবির মতো, ছায়ার মতো — অতি মধুর স্মৃতি মেদুরতা —

একটা স্যুভেনির সেবার তোকে দিইনি —

কিসের — সচকিত হয়ে ওঠে অহনা — কই —

বাঃ সে সময় পৃথিবীর সেরা স্যুভেনির। বার্লিন প্রাচীরের টুকরো — যেন স্মরণ করার চেষ্টায় অধীর হয়ে ওঠে — নাঃ আর দেখা হয়নি তোর সাথে — হ্যাঁ, তাতো হবেই, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমি তো — সে যাক ওটা আনতে গিয়ে যা হলো না — সাংঘাতিক — শোন মার্কিনীদের টেক্কা দিচ্ছে রাশিয়া — আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ল এক কমিউনিস্ট দেশ — গোটা ইউরোপ হুমড়ি খেয়ে পড়ল — চল বার্লিন — পারলে শহরটাকে লুটেপুটে চেঁছে নিয়ে আসে — কিছুই লাগল না — পার্সপোর্ট ভিসা — মাথাই ঘামালো না কেউ — ঢালাও ব্যবস্থা — সাট্‌ল সার্ভিস ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বার্লিন, দালালে ছেয়ে গেছে — নামার সাথে সাথে তারাই বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে — আমাদের দঙ্গলটারও একই গতি —

প্রাচীর তখনও ভাঙার অনেক বাকি। যেমন শুনেছিলাম — নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা নয়। শুধু হুল্লোড় হুল্লোড়। কানপাতা দায়। তিষ্ঠে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। স্বেচ্ছাচারী আর স্বেচ্ছাভোগীর বেলেল্লাপনায় ওস্তাদ সব চক্রকে এখানে জুটিয়ে আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ভিড় করেছে — দেখছে হাঁ করে — নতুন এ ফুর্তির ফোয়ারা তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে —

একজন হাভাতে গোছের লোক, দালালই হয়ত — সামান্য ইংরাজী শব্দ তার সম্বল — আমাদের সাথে ভিড়ে গেল। খানিক ঘোরাঘুরির পরও দেখি লোকটা আমাদের ছাড়েনি। সে তাদের প্রিয় বার্লিন শহরটা দেখাতে চায়। সারাদিন হুল্লোড়ের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত নেশায় টং হোটেলে ফিরছি — চোখে পড়ল দূরে দূরে দুটি মেয়ে আমাদের অনুসরণ করছে — দু' একবার চোখ পড়তে কাঁচুমাচু মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

চিপ স্যার, নো এইডস — গাইডটা কোথা থেকে উদয় হলো — নো পুলিস —

ওরা পুবের — এই মুহূর্তে ওদের হারাবার মত কিছু নেই —

অহনা চিত্রার্পিতের মতো বসে আছে। মনের আবেগে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে অশেষ। অহনার বুঝতে বাকি নেই সে শুধু উপলক্ষ্যমাত্র। নিজের জীবনটাকে কথার ছকে সাজিয়ে চিরে চিরে ব্যবচ্ছেদ করে আত্মনিগ্রহের পরিতোষ লাভ করতে চায়।

অস্বিস্তিতে উঠে দাঁড়াল অহনা। সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে তাঁকে বসিয়ে দিল অশেষ। তুমি বলতে থাক — আমি খাবার দাবার রেডি করি —

না বোস শুনে যা — হাত ছাড়ে না অশেষ। জোর করে বসিয়ে রাখে। ঘরে নিয়ে এলাম মেয়েটাকে — সোফার এককোণে চুপ করে বসল। নতমুখে হাতের রুমালটা পেঁচিয়ে চলেছে। গায়ের পাতলা কোটটা বেঢপ, পা দু'খানা ঢাকা পড়ে গেছে লম্বা স্কার্টে — হাবেভাবে পোশাকে, সাজসজ্জায় পেশাগত কুশলতার কোন ছাপই নেই। সকরুণ দুটি চোখ তুলে একবার মাত্র তাকাল — বুঝতেই হলো তাড়াতাড়ি ছাড়া পেতে চায়। কি জ্বালাতন। সওদাটা সরেস হয়নি। আফসোস হচ্ছে — পেশাটা এখন কোন উৎকর্ষতায় উঠেছে — কত সায়ন্টিফিক হয়েছে — গোটা বিশ্ব স্বীকৃতি দিচ্ছে — মাথায় তুলে নাচছে — সেক্স ওয়ার্কারদের বিশ্ব সম্মেলন হচ্ছে — শিল্প বাণিজ্যের রমরমা নারীদেহের উপচার সাজিয়ে — টাকা, অঢেল ডলারের ছড়াছড়ি। প্রজাপতির মেলায় এতো গুবরে পোকা।

ইশারায় কাছে ডাকলাম। তেমনি নতমুখেই পাশে এসে বসল। শীর্ণ দু'খানি সাদা হাত কোলের উপর জড়ো করা। আমি এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত রেখে চমকে গুটিয়ে গেলাম। হাড়ের মতো কঠিন। মৃতের মতই কঠিন ঠাণ্ডা হিম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়ে মানুষ দেখে এসেছি উগ্র মদের মত তপ্ত, তেজস্কর। এ মেয়েকে স্পর্শমাত্রে মৃত্যু আমাকে ছুঁয়ে ফেলল।

মেয়েটি সোজা চোখতুলে তাকাল। তার চোখ ভাসাভাসা নীল, অসহায় আর ছলোছলো। সেই স্বচ্ছনীল আমাকে অসাড় করে দিতে লাগল। মোহিনী বারাঙ্গনার বদলে এই আড়ষ্ট কেঠো শরীর আমার রক্তে কতটুকু উন্মাদনা জাগাতে পারে —

পানপত্র এনে রাখলাম। ওকেই আগে দিলাম — সসঙ্কোচে গ্লাসটা নিয়ে মৃদুকণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল। ইস, বাকি রাতটা খড় চিবিয়ে কাটাতে হবে।

অশেষ তার কাহিনী টেনে নিয়ে চলেছে। নির্লজ্জ কুরুচিকর এইরকম অনুপুঙ্খ বিবরণ তার সামনে বসে কোন প্রাণে যে বলে যাচ্ছে অশেষ — কোথাও একটু আটকাচ্ছে না — ভীষণ অপমান লাগছে অহনার।

আমি আধশোয়া হয়ে পানীয়ে চুমুক দিচ্ছি — আর ভাবছি — তেমন মাথামুণ্ডু কিছু নয় অবশ্য —

টয়লেটের দরজায় শব্দ হতে ঘুরে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলাম — একি একি — খাঁটি বাংলাতেই। মেয়েটা কখন উঠে বাথরুমে গেছে, গায়ের অন্তর্বাসটি জীর্ণ দেহের অনেকটাই অনাবৃত — হেমন্তের শেষ ফ্যাকাসে পাতাটির মতো সে থর থর করে কাঁপছে —

বলতে যাচ্ছিলাম — যা বলব ভেবেছিলাম — দেখলাম সযত্নে সে তার উপরের পোশাকটি হ্যাঙারে রাখছে —

আমার মনে হ'ল এই হত দরিদ্র অবস্থাই তবে ওদের সমাজতন্ত্র বিদায়ে প্রবৃত্ত ক'রেছে — না কি আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরেন কাঁথা ব'য়ে। আমি তাকে টেনে এনে তক্ষুনি কম্বলে চাপা দিলাম —

চোখ বড় বড় করে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে — সে চোখে কি ছিল জানি না অন্তত লীলালাস্য ছিল না। আতঙ্কও ছিল না — তার সমতল বুকের মতই তা ভাবলেশহীন।

মেয়েটাকে আমি ছুঁতে পারলাম না — গা থেকে ময়লা গন্ধ আসছে, মুখের সাথে দেহের রঙ-এর মিল নেই — যেন একমেটে প্রতিমার দেহে নিঁখুত মুখটি বসানো। বিশ্রী লাগল বিছানাটায় গন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বার্লিন প্রাচীরের টুকরোয় নোট চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কি যেন বলে সেই ঠাণ্ডায় সেই স্বল্পবাসা মেয়েটি বেরিয়ে গেল। শুনেছিলাম সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা বিদেশী পারফিউম, লিপস্টিক কি দু' একটা ডলারের জন্যেও নাকি শরীর ভেট দিয়ে বিদেশীদের খুশি করে দেয় — কিন্তু এমন জীর্ণ জর্জরিত মেয়ে কি পারফিউম চায়? একটা আনকোরা গরম পোশাকই ওর বড় প্রয়োজন। শীতল শরীরের কি কোন প্রলোভন থাকে।

সকালে লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছিলাম। বন্ধুদের এড়িয়ে কোনের একটা টেবিলে বসেছি। মনটা মুষড়ে আছে। পাশের টেবিল থেকে ইশারায় একজন কালকের অভিজ্ঞতা শুনতে থাকে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম — দেখ সমাজতন্ত্র ওদের কি হাল করেছে — ওরা ভারতবর্ষের পথের ভিখারীরও অধম — কেন কমিউনিস্টদের চাইবে লোকে —

লোকটার চোখ কৌতুকে কুঁচকে গেল — ওরা এখন আরোই সমাজতন্ত্র চায় ব্রাদার — সমাজতন্ত্র ওদের বেকারত্ব ভুলিয়ে দিয়েছিল — এখন এই মেয়েগুলোই

সকলের আগে বেকার হয়ে যাচ্ছে — বাসস্থান হারাচ্ছে — পথের পরে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকছে — শীতে অনাহারে —

এত ধনসম্পদের আড়ম্বরের মধ্যেও — বিশ্বের দ্বিতীয় না তৃতীয় দেশ — আমি থ হয়ে গেলাম — কি জানি কেন কিছু ভাল লাগল না — উঠে চলে এলাম।

ব্যাগ গুছিয়ে পাথরখানা আনতে গিয়ে দেখি — ডলার নোটের একটা তখনও চাপা দেওয়া আছে — তাহলে তার বিবেকও আছে — । তার সামনে দাঁড়াতে তখন আর আমার কোন কুণ্ঠা ছিল না। মেয়েটিকে আমি স্পর্শ করতে পারিনি — ওর মধ্যে আমি অসহায় ভারতীয় দরিদ্র মেয়েকে দেখেছিলাম — আমার তো মনুষ্যত্ব একেবারে মরে যায়নি। পরম স্বস্তিতে বুক ভরে গেল। আমি যেন নতুন করে বেঁচে উঠলাম। সোজা কলকাতায় রওনা হলাম। থেমে গিয়ে কি যেন অধীরভাবে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল অশেষ — তারপর কলকাতায় এলাম — না আসা হলো না — কি করে হবে —

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি কি ভিড় — ফুর্তি শেষ এখন সবাই ফেরার জন্য খেপে গিয়েছে — লাউঞ্জে তিল ধারণের জায়গা নেই — চত্বর লোকে লোকারণ্য। আর কি শীত। শীতে জমে যাওয়া ভয়ে হাত পা নাড়িয়ে দ্রুত পায়চারি করছি — এক জায়গায় দেখি কলকে — ধপ করে শরীর ছেড়ে দিলাম।

ইন্ডিয়ান — সাহেব আমেরিকান। চ্যালারাও ছিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি —

বাঙালী

আমি তো হাঁ

কোথা যাওয়া হবে — বাংলা বলছে পরিষ্কার। সেখানেই গেঁড়ে বসলাম। অশেষ থেমে গেল। চিন্তায় একেবারে ডুবে গেল —

কলকাতা কিন্তু এসেছিলাম — কাকে দিলাম টুকরোটা — স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল যেন।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে অহনার — আর মুখ বুজে এই ট্র্যাশ শুনতে পারছে না। বাধা দিয়ে বলল — রেখে দাও তোমার বার্লিন প্রাচীর — সে তো মোটে বিশ চল্লিশ বছরের ব্যাপার — আর এখানে যে কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে — চারশ বছরে পুরনো একটা মসজিদ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে — একটা ঐতিহাসিক সম্পদ — কয়েক ঘণ্টায় চুরচুর — তোমার বার্লিন প্রাচীরের দুপারে রয়েছে একই জার্মান জাত আর বাবরি মসজিদ — তার দু'পাশে রয়েছে হিন্দু আর মুসলিম — এক দেশ, তার মানে বোঝ —

মাত বোল বাবরি মসজিদ — রাম জনম্‌ভূমি হ্যায় — দু'হাত মাথায় তুলে অহনাকে থামিয়ে দিতে চায় অশেষ —

তারপরেই লাফিয়ে ওঠে — আমার জোব্বা, জোব্বা কোথায় —

আছে — অসহ্য। এরকম একটা গুরুতর কথার মধ্যে অশেষ কিনা জোব্বা জোব্বা করে অস্থির। এ ঘর ও ঘর ছুটোছুটি করে অশেষ তার সামনে এসে হামলে

পড়ল — কোথায় ফেললি — বিতৃষ্ণার সাথে অহনার পিছন থেকে জোব্বাটা বার করে ছুঁড়ে দিল অহনা — বাব্বা কি দুর্গন্ধ। গা গুলিয়ে আসে —

লাফিয়ে পড়ে লুফে নিল অশেষ — কি করছিস, এই এই — মনে হচ্ছে বাস্তবে ফিরে এসেছে। — এই দ্যাখ তোর বাবরি মসজিদ স্যুভেনির — নে রেখে দে — তার দিকে এক টুকরো কাল পাথর এগিয়ে দেয় অশেষ —

তীব্র ঘৃণায় ছিটকে সরে এল অহনা — ছিঃ তুমি — অবাকও কম হয়নি সে।

যাঃ পাগল — অ্যালেকের মেডিক্যাল ইউনিটে ছিলাম — ভাঙা টাঙা কি তোর আমার কাজ — সে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কি বলব আকাট মুখ্যু জোয়ান দেহাতীগুলোকে হনুমান সেনা বানিয়ে হি-হি আর শুধু মুদু ব্যাটারা পাথর চাপা পড়ে থেঁতলে মলো — মাথার চুল দু'হাতে টেনে ধরে অশেষ — কি রক্ত, কি রক্ত, তাল তাল — অপ্রকৃতিস্থের মত চুল ছিঁড়তে শুরু করে —

অ্যালেক, কে অ্যালেক —

গুরুজী, এয়ারপোর্টের সেই সাহেব — সেই তো হাত ধরে আমায় উদ্ধার করল — বলল — প্রাণ অনন্ত, এক জীবন থেকে আর এক জীবনে তার সঞ্চরণ — প্রাণের ক্ষয় নেই — প্রাণই ঈশ্বর — ঈশ্বর তোকে ডেকেছেন — তোর উদভ্রান্ত বিবেক শান্তি পাবে — সান্ত্বনা পাবে — নিজেকে তুই সঁপে দে — বেশ কথা বলে কিন্তু — বল একেবারে শান্ত সমাহিত হয়ে গেছে সে। হঠাৎ কি মনে করে চেঁচিয়ে উঠল — হেনা — দু'হাত বাড়িয়ে হাত চেপে ধরেছে তার — আমরা বিয়ে করেছিলাম না — দ্যাখ তো মনেই পড়ছিল না — কেন তোর কাছে আসতে মন টানতো — তোর কাছেই ফিরে এলাম — অহনার কাছে ঘন হয়ে আসছিল অশেষ —

দরজায় বেল বেজে উঠল — কলবুক ভেবে দৌড়ে এল অহনা — ওয়ার্ড বয় দাঁড়িয়ে — জলদি, দিদি জলদি — আউট ডোরে বহুৎ সারে জখমী কো লে আয়া পুলিসনে —

অশেষও উঠে এসেছিল অহনার পিছন পিছন — কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে, উত্তেজনায় কাঁপছে — দাঙ্গা! মোছলমানগুলো আবার হিন্দু খুন করছে — কমিউনিস্টরাই ওদের চ্যাতাচ্ছে — আর রক্ষে নেই — হিন্দুরা তোদের এবার শেষ করে দেবে — বিষম আস্ফালন শুরু করেছে — । তার রক্ত ঠিকরে পড়া উগ্রমুখের দিয়ে তাকিয়ে অহনা অপ্রস্তুত। ওয়ার্ড বয় ছেলেটা মুসলিম। অশেষকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে দিতে অহনা বলল — আমি আসছি — তুই চলে যা — রাসেদ।

সম্পূর্ণ নতুন এই উৎপাতটির দিকে তাকিয়ে সে যেন চলে যেতে ভরসা পাচ্ছে না — তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে। অহনা ফের ওকে তাড়া লাগায় — এখানে কি তোর — তুই যা —

অশেষ ঘরের ভিতর ভয়ানক চিৎকার করছে — অ্যাঁ, মোল্লা মোছলমানে দেশ ছেয়ে গেল — অ্যালেক বলেছিল ওয়েস্টবেঙ্গল পাকিস্তান হবে — ওরা মোছলমানদের বহুৎ প্যার দিচ্ছে — দু'গুণ তিন'গুণ পয়দা হচ্ছে শালাদের — কলকাতা বাংলাদেশের

ক্যাপিটাল হবে — ওঃ নো কিল দেম কুইক — এ ডেড মুসলিম ইজ এ বেস্ট মুসলিম — কিল দেম — জয় শিয়ারাম, ভিভা আয়ুধিয়া — পাখি পড়ার মতো তারস্বরে আউড়ে যাচ্ছে।

অহনা তৈরি হতে হতে অশেষকে সামলায় — চুপ একদম চুপ — টিভি'তে কি বলছে শোন — প্ররোচনাকারীদের সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তুলে নিয়ে যাবে —

পাগল সামলাবার এই সময় বটে!

অনেক রাতে অহনা ঘরে ঢুকে তাজ্জব……সব লণ্ডভণ্ড

— খালি তক্তপোশের ওপর অঘোরে ঘুমচ্ছে অশেষ। কপালে হাত রাখতে চট করে উঠে বসল — চোখ লাল, ফোলা ফোলা, বিস্ফোরিত। আতঙ্কে বিকল হয়ে গিয়েছে —

কি হল — কাঁধে হাত রেখে পাশে বসল অহনা —

হেনা — ওঃ — অসহায় অশেষ ওকে জড়িয়ে ধরে ককিয়ে ওঠে — এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাই, চল —

কোথায় —

অ্যালেক — অ্যালেক উইল সেভ মি — অহনাকে টানতে থাকে অশেষ —

আঃ কি করছে — মাথা খারাপ — খবর শোননি — বাইরে কারফু, মিলিটারি নেমে গেছে — দেখলেই শুট করবে — ওঠ দেখি বিছানাটা ঠিক করি —

অহনা ঘর গোছাতে শুরু করেছে — কোথায় যাবে সারা দেশে দাঙ্গা হচ্ছে — তোমার মতো একদল উন্মাদ —

হেনা অশেষের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল — প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্যে তোমরা দায়ী হবে না —

দিশেহারা অশেষ দু'হাত জোড় করে — আমি খুন করিনি — প্লিজ — রক্ত আমি ভালবাসি না — সহ্য করতে পারি না —

তোমার সামনে যারা সেদিন মসজিদ চাপা পড়ে মরল — অশেষ দু'হাতে কানমুখ চাপা দিল — হাসপাতালে যে লাশগুলা জমে উঠছে — কে খুন করেছে তাদের —

খুন, খুন কিসের — মোছলমান খুন করলে পাপ কিসের — রুখে উঠল অশেষ। বাঃ তুমি দেখি হিটলারের কথাই বলছ — তীব্র শ্লেষের সাথে বলল অহনা — হিটলার বলেছিল — ইহুদীরা মানুষ নয় — ভাবছিলাম তুমি অসুস্থ — তালে ঠিক আছ দেখছি হিটলার ছারখার করেছিল নিজের দেশটাও — আর তোমরা — কি মতলব তোমাদের —

ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অশেষ আঁ আঁ করে বিছানা আঁকড়ে গোঙাতে থাকল — অন্ধকারে আমি ভয় পাই হেনা —

অহনা টর্চ খুঁজে বার করতে করতে বলল — কোথায় পালাবে প্রত্যেকটা মৃত্যু তোমাকে ধাওয়া করবে। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে সে।

— আমি সহ্য করতে পারি না হেনা — আমি মৃত্যুকে ঘৃণা করি — হেনা আমি বাঁচতে চাই — হেনার হাত টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখে অশেষ — আমায় তুমি

বাঁচাও —

আলো জ্বলে উঠল। ভয়ে মনোবিকারে বিপর্যস্ত অশেষের দিকে তাকিয়েই টিভি'র নব ঘোবালো হেনা। — এখনই নিউজ হবে। বি বি সি সব দেখাচ্ছে — অযোধ্যাকাণ্ড যে হিটলারি কাণ্ডের চেয়ে কিছু কম নয় — তাই দেখ — নিজের মৃত্যু চাও না — অন্যের মৃত্যু চাওয়ার কি অধিকার আছে তোমার — এত নৃশংসতা আছে তোমার মধ্যে —

মাথাটা অহনার হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে কেঁদে ফেলল অশেষ — না হেনা না — আমি একটা কাপুরুষ — জঘন্য হীন মনোবৃত্তির সাথে লড়তে আমি পারি না — এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে ঝাঁপ দিই — তুমি আমাকে ঘিরে রাখ হেনা —

অহনা নিজেকে সংযত রাখার খুব চেষ্টা করছে। সে জানে না কিসের উপর দাঁড়িয়ে তারমধ্যে এই উথাল পাথাল। অশেষ তো আর স্বপ্ন নেই — এক শুকনো পত্রহীন বনস্পতির কঙ্কাল। কোন প্রাণের ঐশ্বর্য সেচনেও আর তা পুষ্পিত হবে না।

আমার তাকে অস্বীকার করার শক্তি নেই কেন। সে অশেষ নেই — তবু সে আছে —। সে কোনদিন আবার এসে দাঁড়াবে ভাবেনি অহনা। চিরকাল সে কৃতজ্ঞ থেকেছে অশেষ তাকে আর জড়ায়নি বলে। তাকে মুক্তি দিয়েছে বলে। নিদারুণ অভিমানে হৃদয় বোবা হয়ে গেছে — তবু একটু স্বস্তিবোধ চাপা থাকেনি — ছোট্ট একটি ঘাসের শীষের মতো —

অশেষের মুখের পরে আলোর আড়াল — সুখ নয়, সম্ভাবনা নয়, নতমস্তকে সত্যকে অসত্যের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে বিনম্র উপহার দিতে চায় এক ঝলসানো অতীত — অহনার তা গ্রহণ করার অধিকার আছে তো।

গন্ধমাদন

গড়ের পাড়ে কালভার্টের একেবারে শেষের ধাপে নেমে বসল শরণ। হাতে লম্বা ছিপটি, রাস্তা থেকেই ভেঙে এনেছে। তাই দিয়ে জংলা গাছগুলোকে এন্তার পিটিয়ে গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে। খুব কেঁদেছে সে। চোখের কোলে ময়লা হাতে মোছা জলের দাগ। কর্তাবাবুর বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে এখানে। নতুন জামাইবাবুর সামনে তাকে যা নয় তাই বলে গালাগালি তো দিলেন-ই—তার ওপর মুনিষ তারিনীকে দিয়ে তাকে গো-বেড়ন খাওয়ালেন।

মার অসুখ বলেই না সে কাজ করতে এসেছে। ভাল থাকলে মা তাকে কাজ করতে পাঠাত নাকি! সে ইস্কুলে যেত। সে তো মার সাথে সাথে ঘুরত—মার কাজে একটু সুসার হয় তাই দেখত। মাকে যে শরণ খুব ভালবাসে—মা ছাড়া আর কাকেইবা ভালবাসবে।

ডাক্তার বলল—মাকে যত্ন করতে হবে তো খোকা, একটু মাছ-ডিম-দুধ খাওয়াতে হবে—ওষুধ বিনেপয়সায় পাবি—

শরণ অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—মার মুখখানা সত্যি কেমন যেন লাগছে। চোখ দুটো কোথায় তলিয়ে আছে আপনি বুজে আসছে। এত বড় মানুষের মুখে—সবগুলোই একসঙ্গে ফুটে বেরিয়ে এসেছে—রোজ দ্যাখে বলে কি চোখে পড়েনি—

ঘামে ভেজা ঠাণ্ডা হাতে ওর ড্যানা ধরে টানতে টানতে মা বলতে লাগল—চ, রে শরণ চ—

বাড়িতে এসে একেবারে শুয়ে পড়ল। শরণ মার গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রেগে উঠল—এমন ছুটতে লেগেছিলে কেন মা—ডাক্তারের কথাগুলো ঠিকমতো শোনাই হলো না। মায়ের পায়ের হাড়গুলো তার হাতে বিঁধছে।

ছোট হলেও শরণ বুঝতে পেরেছিল—মা বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। ধানকলের প'ড়ো মাঠে খেলা করতে করতে সে এক এক সময় দেখতে পেত মার হাতে কুলো যেন আটকে গিয়েছে—আর ধান ঝাড়তে পারছে না। ঘরের কুলো তো নয় কারখানার কুলো—এ কুলোর সেও টক্কর দিতে পারে না—তবু মাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে, ধান রোদে দেওয়া, পায়ে করে ধান নাড়ার কাজটা সে চালিয়ে

নিতে পারে—পাখিও তাড়ায়। তবে মালিকের লোকটা ওকে ধারে-কাছে দেখলেই তেড়ে আসে—মাকে বকা ঝকা করে—

কাজটা মার থাকবে না—মার শরীরে আর দেয না। জোর করেই শরণ মাকে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল।.মায়েবা সব ওই রকম। লখার মা টা ঝপ্ করে মরে গেল—চিকিচ্ছেই হলো না। ওর ভয় তো সেইখানে।

ডাক্তারের কাগজ দেখিয়ে মালিকের ঘরে গিয়েছিল শরণ। পাওনা টাকা ক'টা আনতে। আর চিকিচ্ছের জন্য বাবু যদি কিছু দেন—টাকার খুব দরকার।

মা হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছে—আমার আর বেঁচে কাজ নেই রে শরণ—আমি মরলে তুই তোর বাপের কাছে চলে যাস্—

শরণ ক্ষেপে আগুন—দুত্তোরি বাপ—তোমার মরা টরা হবে না—আমি চিকিচ্ছে করাব—

হাতি গেল তল, চামচিকে বলে কত জল—মা' পাড়ার লোকজন ডেকে ডেকে বলে বেড়াল এসব কথা।

ম্যালা ভ্যাজর ভ্যাজর করো না বলে দিচ্ছি—আমি চিকিচ্ছে করাব—ডাক্তার বলেছে তুমি একদম ভাল হয়ে যাবে—বড়দের মত জোর গলায় কড়া করেই বলেছিল শরণ।

ওরে আমার বাপরে—সত্যি করে হেসে ফেলেছিল পুষ্প—শরণের মা।

তারপরে তো এদের এখানে কাজ করছে। কি না করে সে। তার আসল কাজ পোলট্রির খোয়াড় পরিষ্কার করা। বাবুদের খোরাক দেবার কথা। তাই যতক্ষণ খেতে না বসছে সবার ফুট ফরমাস খেটে বেড়ায়। দুটো ডিমের জন্য ওকে অমন মারটা মারল। পঞ্চাশ-একশ ডিম রোজ হয়—দুটো-একটা ডিম তার থেকে নষ্ট যেতেই পারে—কি বা ক্ষতি। গাছের ফল পাকুড় ছেলেরা পেড়ে নিয়ে যায় না? মুরগিতেও তো লড়ালড়ি করে ভেঙ্গে দেয়—এক আধটা। আর খোয়াড় পরিষ্কার যদি বল—সে কি যে সে কাজ—নরক—কি দুর্গন্ধ—পেটের ভাত উগলে আসে। খালি পেট থাকে তাতেই বমির ঝোঁকে তার বুক-পিঠ ব্যথা হয়ে যায়। ওনারা কেউ ধারে কাছে ঘেঁষে না—এক বালতি জলও কেউ এগিয়ে দেয় না। প্রথম প্রথম তো সে ভাতও খেতে পারত না—দু'খানা হাতে সে কি দুর্গন্ধ, সে গন্ধ যেন সারা দিন-রাত গায়ে মেখে থাকত—খেয়ে শুয়ে শান্তি ছিল না তার।

মা বসে বসে কাঁদত। বলেছিল ছাই মাখিস—তবে না সে কাজটা চালিয়ে গেছে। কাজটা ছাড়তেও পারেনি—সে তো ওই ডিমের জন্যে। মাকে যে ডাক্তার ডিম খাওয়াতে বলেছে। নাকে-মুখে ফেট্টি বেঁধে মায়ের নাম করেই সে ঢুকেছে খোয়াড়ে।

মা ভাল হয়ে উঠেছে, এখন লোকে বলে ছেলে বটে তোর—স্বন্ন গভ্ভা তুই—ওইটুকু ছেলে—রাজরোগ থেকে তোকে টেনে তুলল—পাষণ্ড বাপের ছেলে হলে কি হবে—

তা সে পাষণ্ড বাপের কাছে যায়নি — লোকে বলেছিল — যা পয়সা আদায় করে নিয়ে আয় — তার তো দেবার কথা — না দেয় তো পঞ্চায়েতে যাস —

যাবে কেন ? যায়নি শরণ — গিয়েছিল তার দুটো দামড়া ভাইয়ের কাছে। পয়সা খরচ করেই গিয়েছিল। গাঁয়ের কাছেই তাদের দোকান —

ভাইদের দেখেছিল — মাল বেচছে। শরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ওদের —

আমি শরণ —

কি চাই —

মার খুব অসুখ —

মার অসুখ তো এখানে কি — ভাগ্ — কিছু হবেটবে না —

তবুও দাঁড়িয়েছিল শরণ — তোমাদের মার অসুখ। ওদের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে — ওজনের পাল্লা ঝুলে পড়েছে — দু'জনে ওর দিকে তাকিয়ে রইল — একটা কথাও বলল না —

রাগে দুঃখে শরণের মাথার ঠিক ছিল না — খুব চেঁচিয়েছিল সে — ওদের নামে থু থু ছিটিয়েছিল — ছুটে বেরিয়ে আসার মুখে কে একজন ওকে ধরে ফেলল — কি হয়েছে বাপ —

হাউ মাউ করে কাঁদছিল শরণ। ছেলেটা কে রে — ওর সামনে দাঁড়িয়ে সেই প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করেছিল। ওর মুখটা তুলে ধরে বলেছিল — দেখি দেখি, এ যে একেবারে বাপের মুখ বসানো — এই বুঝি সেই ছেলেটা —

ওরা আসেনি। শরণ চায়ওনি ওরা আসুক। মাকে এখন একবার দেখে যাক তারা। কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে মা। ওরা না দেখুক, সে আছে, মাকে দেখার লোক লাগবে কেন — মা একা তার, আর কারুর নয়।

আর তো ক'টা মাস, আর তারপর কর্তাবাবুর কাজ সে ছেড়েই দিত। শহরে যাবে — একটা হাতের কাজ শিখবে —

আর সে ফিরবে না কর্তাবাবুর কাছে। নতুন জামাইবাবু বলেছেন — তেমন কোন কাজ শিখতে পারলে পয়সার অভাব থাকে না। গ্রাম থেকে লোক তো এ জন্যেই শহরে চলে যাচ্ছে।

ঝোপগুলো ছিন্নভিন্ন। ছিপ্‌টি আর চলছে না। হাত জ্বালা করছে। ঝাঁঝালো রাগটাও ঝিমিয়ে এসেছে। ঘুম পাচ্ছে শরণের, খিদেও পাচ্ছে। উঠে গিয়ে চওড়া রাস্তাটার ওপর চোখ বোলালো। কেউ নেই। একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। একটা-দুটো ভ্যান গাড়ি, লরি চলছিল আওয়াজ পেয়েছে একটু আগে। এখন আর দেখা নেই।

মার জন্যে, না হলে এমন একটা লরি চেপে সে চলেই যেতে পারত — দূরের কোনো শহরে। দিদিমণি বলছিল না ওখানে কাজের লোকের আকাল — যারা আসে তাদের পছন্দ হয় না —

শরণ ঘর ঝাড়পোঁছ করছিল — সব শুনেছে। নতুন জামাইবাবু দুষ্টুমি করে বলল — ফরমাস দিয়ে পাঠাও না ভগবানের কারখানায় — দিদিমণি হাত-পা ছুঁড়ে

চেঁচিয়ে উঠলেন — মা দেখেছ কিরকম — সবাই হাসছিল। জামাইবাবু চোখ ইশারায় বলল — ওকেই নিয়ে চল না — যদি তোমার বাবা দেন — বেশ চট্‌পটে আছে।

হুঁ, বাবা ওকে দিচ্ছে —

শরণ তখনই ধরে ফেলেছে জামাইবাবুর মতলব। এই জন্যে বিকেল-বিকেল ওকে নিয়ে ঘুরতে বেরুনো। এটা সেটা খাবার খাওয়ানো — — ঘোড়ার ডিম। মাকে ছেড়ে এখন সে কোথাও যেত না। এখন তো আরোই হবে না — ডিমের জন্য কেমন বলল — ওইটুকু ছেলের পেটে পেটে এত। ডিম কি তার হাতে ছিল — ছিল তো খড়ের গাদায় — বেরিয়ে পড়েছে —

সকালে এসে রাশ রাশ ময়লা ঘেঁটে ডিমগুলো সে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে — একটা একটা করে ধুয়ে তোলে — গুনে গুনে বাবুর কাছে জমা দেয়। তারপর পাইকার এসে নিয়ে যায়। এ গাঁয়ে বাবুর পোলট্রির কদর আছে। খাবার মেশানো, খাবার দেওয়া, ওটা বাবু আর হারাধন করে। মাঝে মধ্যে মুরগিও চালান যায়। নিজেরা মুরগি কেটে খায়। ওকে কি দেয় — একটু ঝোল আর আলু — বুকের খাঁচা কি গলা — কোনদিন এক টুকরো ভাল মাংস ওকে দিত যদি — ও মার জন্য ঠিক নিয়ে যেত — মাকে তো মাংস খাওয়াতে পারেনি —

যাক্‌গে, ডাক্তারবাবু তো বলেছে — মা ভালো হয়ে উঠেছে, আর কি! মা এখন হাসে, মাকে কত সুন্দর লাগে। মা ওর মাথা বুকে জড়িয়ে কাঁদেও। দু-দুটো জোয়ান ছেলে, স্বামী থাকতে মার আমার এত কষ্ট। এবার সব শুনে এসেছে সে।

দোকানের বুড়োটা সেদিন বলেছিল — চল পঞ্চায়েতে যাই — তোকে দেখিয়ে আনি গে — দশ বছর বাদে বউ-এর পেটে বাচ্চা এসেছে আর বলরাম বলে দিলে — ওর বউ নষ্ট — ও বাচ্চা ওর নয় — এখন পাঁচজনে দেখুক — ঝটকা মেরে চলে এসেছে শরণ। আর একটু বড় হতে হবে ওকে — মাকে বেইজ্জতির বদলা নেবে। — ও ছেড়ে দেবে না — কাউকে না। মা নাকি দেবী — ভগবান। ভগবান ভাবলে মাকে কেমন পর পর লাগে। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, এরা মা — দূর, অত গয়না, অত সাজগোজে মা মনে করাই যায় না — ছুঁলে যেন সব নোংরা হয়ে যাবে। না, মা মাই — আর কিছু নয়, দেবী টেবী নয়। বুড়োরা যে কেন এসব বলে —। মাকে অপমান করলে ভগবানের অপমান হয় — তা হবে —। ভগবান যা করতে পারে করে দিক — তবে সেও ছাড়বে না। ওই দামড়া ছেলেটাকেও না। শুধু আরও বড় হবার অপেক্ষা — তারপর তার বোঝাপড়া — মাকে বেইজ্জতি শুধু করোনি তো বাপু তোমরা আমাকেও দাগা দিয়েছ — এমন টুঁটি টিপে ধরব বুড়ো ভামটার —

মা বলে পঞ্চায়েত কি করবে — আমার যে কেচ্ছা হলো — তার কি হবে — লোকে ভুলে যাবে — আবার আমি যাব সেই লোকের ঘরে — মরে গেলেও না —

তাই তো শরণ কোথাও যায় না — লোকে তাকে বলরামের বেটাই বলে। মাকে বলে, হ্যাঁ রে পুষ্প সীতার মতো ছেলের হাত ধরে গিয়ে দাঁড়াগে — কার ছেলে তা বিচার হোক — বিচার করুক পাঁচজনে —

মা সেসব শুনেই যায় — সবাই চলে গেলে — একদিন বলল, হুঁ ওই দুঃখেই তো মা সীতা পাতাল গেলেন — পুণ্যিবান মানুষ — আমাদের তো গায়ে কেরাসিন দিতে হবে —

এ কথার পর আর কি ওদের কাছে যাবে শরণ। কখনো না। দুঃখে দুঃখে দিন তো কাটাছে তাদের। এবার দিন ঘুরবে — মা ভাল হয়ে উঠলে — সে শহরে গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে আনবে।

সূর্য মাথার উপরে উঠে পড়েছে। খালের সরু জলে রুপোর মত ধক্ ধক্ করছে সূর্যের গোল বলটা। জল ঠেলে ঠেলে সেখানেই একটা ডুব দিয়ে নিল শরণ। মনে হ'ল রূপকথার মত সূর্যের তেজ পাবে। এতক্ষণে খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। গুটি গুটি পায়ে বাড়ি এসে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা তার খালি লাগে। পায়ে যেন জোরই নেই। দাওয়ার ওপর আঁচল পেতে শুয়ে আছে মা। ঘুমিযে পড়েছে। ডাকতে মন কেমন করে। সাহসও হয় না। মায়ের গা ঘেঁষে শোয়। চোখ বুজে এসেছে — চটকা ভেঙে উঠে বসল পুষ্প — হ্যাঁরে কখন এলি তুই — ওরা খুঁজতে এসেছিল — কি হয়েছে — কোথায় গিয়েছিলি —

শরণের চোখ ভরে জল এলো — উপুড় হয়ে পড়ল মার কোলের উপর। ওর খোলা পিঠে হাত বোলাতে পুষ্প বলল — খাসনি তো — আয় খেতে দি — এ কি, হ্যাঁ, একি ছেলের পিঠের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

আমি ও বাড়ি আর যাব না মা — সহজ ভাবেই বলতে গিয়েছিল শরণ কিন্তু গলা কেঁপে গেল। ভাত বেড়ে দিতে দিতে পুষ্প — আচ্ছা সে হবেখন।

খাওয়া শেষ হতে না হতে ঘুমে ঢুলে পড়ল শরণ। পুষ্প ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে — আর চোখের জলে ভাসছে। এই ছোট্ট শিশু তার ছোট্ট দু'খানা হাতে তাকে আগলে দাঁড়িয়েছে। জীবনের এতবড় কদর্যতার মধ্যে — এই পাওনাটুকু তাকে স্বর্গের স্বাদ এনে দিয়েছে। সবাই বলে শরণের মতো ছেলে ক'টা হয় — মার জন্য বুঝি সে গন্ধমাদন বইতে পারে। মরণ যখন হলো না — ফের দু'পয়সা রোজগার করতে পারলে — শরণকে এবার রাতের ইস্কুলে পাঠাতে হবে।

কর্তাবাবুর বাড়ির লোক এসে পড়ল সন্ধ্যের মুখে মুখে — শরণ ফিরেছে — উঠোনে বেরিয়ে এলো পুষ্প — আমরা ওকে সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি —

কেন, কি করেছে ও — পুষ্পর উৎকণ্ঠা জেগেছে।

না, না, তেমন কিছু না — বাবু রাগের মাথায় ওকে মেরে বসেছেন — ও সেই যে বেরিয়ে এসেছে — খেতেও যায়নি —

বেলা তো গেছে — এখন কি যাবে —

চলুক না, সবাই ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন —

ঘুমোচ্ছে — যে —

পুষ্প ভাবছে ছেলেকে ডেকে তুলবে কিনা — ব্যাপারটা তার শোনাই হয়নি ছেলের

কাছে। বোকা ছেলেটা — দুঃখী, অভিমানী ছেলেটা — মনে লেগেছে নিশ্চয়ই — উঠুক তারপর শুনবে —

আমি কাল নিয়ে যাব ওকে।

বেশ, তাই যেও — বাবু বার বার বলে দিয়েছেন —

দরজা আগলে বসে রইল পুষ্প। আঁধার ঘনিয়ে আসতে মশায় ছেঁকে ধরেছে ছেলেকে — পাতলা কাপড়ে যত্নে ঢেকে রেখে — সন্ধ্যেবাতি দিতে উঠে গেল।

মনটা খচখচ্ করছে। কিছুতেই মাথায় আসছে না — কি হয়েছে ও বাড়িতে — ধরে মারল পর্যন্ত ছেলেটাকে।

শরণ হাপুস নয়নে কাঁদছে। ওকে ডাকতে এসেছিল শুনে ওর কান্না একেবারে হেঁচকিতে ঠেকেছে। এমন করছে কেন ছেলেটা — কেমন মন্দ ডাকছে মন। মারল কেন ওরা? লোকদুটো কিছু বলল না-ই বা কেন! দুধের ছেলেটাকে দিয়ে তো নরক ঘাঁটা করিয়ে নেয় — খাটা পায়খানায় মেথর লাগে — শতখানেক মুরগির ময়লা — সে কি কিছু কম তার চেয়ে। প্রথম প্রথম ছেলেটার কষ্ট চোখে দেখা যেত না - খেতে পারে না, শুতে পারে না - দুর্গন্ধটা যেন তার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে — পাগল পাগল করত — যখন তখন বমি ওগরাতো — অসহায় এই শিশুটার জন্য আর তো উপায় ছিল না।

ধানকলের বাবুরা তো হাত তুলে নিল — ছোট্ট ছেলের কাজ কোথায় এখানে — তারপর এখন এসব নিয়ে নাড়াঘাটা চলছে খুব — সরকারের বারণ — কে কোথায় শত্রুতা করে দেবে — বাপু —

বুড়ো নকুল সর্দার কাজটা ধরে দিল সেদিন — নয়তো মায়ে ছায়ে কি যে করত। নিজে বাঁচুক না বাঁচুক — ছেলেটার প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে।

তা বলতে নেই বাবুরা খারাপ ব্যবহার করেনি তেমন — ছোট বলে পয়সায় হয়তো ঠকায়, একজন বড় মানুষ হয়তো আরও পয়সা খিঁচতে পারত, আরও খোরাক। অসহায় তারা পরের দিকে ভাতও তার হাঁড়িতে ছিল না।

ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেরই বুকের যাতনা শান্ত করতে চায়। কেঁদে কেটে আরও অস্থির হয়ে পড়ে শরণ। আদর করে পুষ্প ওর মুখে চুমো খায় — আমাকে বল কি হয়েছে — অমন করছিস কেন — কালই আমি যাব — আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে আসব — নকুল সর্দারকে নিয়ে যাব — আর কাঁদিস নে বাপ এবারে থাম —

হাঁচড়ে পাচড়ে দু'হাত গলা জড়িয়ে ধরে শরণ, শক্ত করে এঁটে ধরে — না, তুমি যাবে না, কক্ষনো যাবে না — ব্যাকুল হয়ে ফের হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে। সে যে মার কাছে সেই কথাটাই বলতে পারছে না — সে যে ভেবে পাচ্ছে না — শুনে মা কি বলবে — মা কি বলবে, আর বাঁচতে চাইনে শরণ — কেন তুই আমায় বাঁচালি

যাব না বই কি, একশবার যাব — এতগুলো দিন ধরে নরক ঘাটছে ছেলেটা গরিব, অনাথ বলে অতটুকু ছেলেকে মারতে তাদের হাত উঠল — রাগে-দুঃখে তার

সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল — গলা বন্ধ হয়ে এল — সকাল হোক একবার —

কাঁদতে ভুলে গেল শরণ। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে সে। মায়ের গলা থেকে হাত আপনি আল্‌গা হয়ে খুলে এল। কিছু না ভেবেই পুষ্প উঠে গেল রাতের খাবার ব্যবস্থা করতে। পিছনে পিছনে দুর্বল পায়ে উনুনের পাশে এসে দাঁড়ায় শরণ। তার ছোট্ট বুকখানা ভয়ে, উৎকণ্ঠায় হিম হয়ে যাচ্ছে। ওঃ এ কষ্ট সে আর সহ্য করতে পারে না — একেবারে ভেঙে পড়ে — হঠাৎ মার হাঁটু ধরে গায়ের সঙ্গে লেপটে যায় — মা —

ধোঁয়ানো উনুনের দিকেই পুষ্পর নজর। কাঠকুটোগুলো ধরে উঠল কিনা নেড়ে চেড়ে তাই দেখছে —

খড়ের গাদায় দুটো ডিম পেয়েছে দমবন্ধ হয়ে আসে শরণের — ওরা আমাকে মেরেছে মা — এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে একবুক কান্না উথলে ওঠে তার।

পুষ্প। একহাতে ছেলেকে জাপটে ধরে অন্য হাতে হাড়িতে জল ঢালতে ঢালতে বলে — ওখানে ডিম পেড়েছে দেখিসনি —

জোরে জোরে মাথা নাড়ে শরণ — ওরা তো খাঁচায় থাকে — উদ্বেল কথা জড়িয়ে যায় তার।

তবে — বলেই থম্‌কে যায় পুষ্প। হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে খসে আসে। শরণ মার পিঠে মুখ লুকোয়। জ্বলন্ত উনুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে পুষ্প।

মুখখানা কেমন হয়ে যায়, হাড়িতে জল ঢালা বন্ধ হয়ে যায়। কাঁদতে ভুলে যায় শরণ, কি করবে সে এখন — মার ওই পাথর হয়ে যাওয়া মুখখানা কি এখনই বলে উঠবে — আমি আর বাঁচতে চাইনে শরণ —

সহসা মার কোলের উপর হুমড়ি খেয়ে — আকুল হয়ে বলতে থাকে শরণ — আর আমি ডিম আনব না মা — আর করব না মা, তুমি তো ভাল হয়ে গেছ।

ধীরে ধীরে অসাড় হাতখানা ছেলের পিঠের ওপর রাখে পুষ্প। ডিম সে খেয়েছে — কোনদিন তো জিজ্ঞাসা করেনি — এ ডিম সে পেল কোথায়, কি করে পেল — দু'চোখ জলে ভেসে যায় — সত্যি সত্যিই গন্ধমাদন বয়ে এনেছে শরণ — নামিয়ে দিয়েছে তার পায়ের কাছে।

সওয়ার

দেওয়াল ভেঙে পড়ে দুটি শিশু গুরুতর জখম হয়েছে। নিশ্চিন্তে খেলছিল তারা তারই ছায়ায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবরের কাগজের সামান্য কোন জুড়ে একটুখানি খবর। সব চেয়ে বড় খবর ছিল আরও একটা দেওয়ালের, বড় হরফে, পাতা জোড়া আর রঙিন। পুরনোকে নতুন করে জারি করা। পড়তে পড়তে কাগজ খসে পড়ল মাটিতে। শরীর এলিয়ে এল। মাথা ঢলে পড়ল কাঁধের ওপর।

চায়ের পাত্র হাতে তখনই ঘরে এলেন শিবানী, নিচু হয়ে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, ঘুমুলে নাকি। মেঝে থেকে কাগজখানা তুলে রাখলেন টিপয়ের ওপর। ধোঁয়া ওঠা কাপ বাড়িয়ে দিলেন, নাও ধরো — রাতে ঘুম হয়নি, তো, হবে কি করে—

নিশ্চল মানুষটার মুখের ওপর চোখ পড়তে চায়ের কাপ কেঁপে উঠল হাতে। কোন মতে নামিয়ে রেখে, টেবিল থেকে জলের গ্লাস এনে দ্রুত চোখে মুখে ঝাপটা দিতে দিতে কাজের মেয়েটিকে ডাকলেন। তাকে পাখা করতে বলে ডাক্তারকে ফোন করতে গেলেন। লাইন পেলেন না। পড়ি মরি করে পাশের বাড়ি ছুটে গেলেন।

ততক্ষণে মাথা তুলে কাগজখানা খুঁজছিলেন বাসুদেব। শিবানীর ভয় ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন — জলটল ঢেলে একাকার করেছ — কই কাগজখানা — শিবানী এগিয়ে এসে কপালের উপর হাত রাখলেন, কাগজ থাক, এখন কেমন লাগছে গো — নানকু ডাক্তারের কাছে গেছে, একবার দেখে যাক।

ও কিছু নয় — মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল — তুমিও যেমন — বাসুদেব বুঝতেই পারেননি কি তাঁর হয়েছিল। কোন ঢেউ এসেছিল চেতনার কুল ভেঙে — শিবানীকে এড়াতেই ব্যস্ত হয়ে কাগজখানার খোঁজ করছিলেন। কিছু কিছু ভাবনা এতই আপনার, চাইলেও কারো সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় না। অন্যকে কেমন করে বোঝাবেন — তিল পরিমাণ সময় কখন অনন্ত হয়ে ওঠে, ফুরোতে চায় না — যেন নিঃশেষ করে রেখে যাবে — সে পীড়নের ভাষা নেই, অবয়ব নেই। জীবনের সীমা যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যতই তার দান ক্ষয় হয়ে আসছে ততই নিশ্চল হয়ে বুকের উপর ভর করে থাকছে কত ভুল, কত অক্ষমতা, কত অন্যায় — যার এক

একটিকে তিনি দেখেছিলেন সাফল্যের এক একটি স্তম্ভের মতো। ফেরার পথে সে সব ছাই এর মত গুঁড়িয়ে যাবে কে জানত।

অত কি ভাবছ — শিবানী ঝুঁকে পড়েছেন মুখের উপর। বাসুদেব হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা মুঠোয় টেনে নিলেন — কি আবার ভাববো — দিন ফুরোলে চলে যাব — পিছুটান তো নেই — বলে নিভন্ত হাসি হাসলেন।

পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে চেয়েছিলেন পারলেন না। বুকভার হয়ে রইল। ভাবনাগুলোকে শিবানীর সাথে আজ তিনি ভাগ করে নিতে চান কিন্তু মেলাবেন কি করে — কোনদিনই যে তেমন করে নিকটে টেনে নেননি তাকে। এও তাঁর স্বভাবের অসঙ্গতি কিংবা অপূর্ণতা —

গাদা গাদা খবরের কাগজ পড়ে মগজে তাতিয়ে না তুলে, গ্রন্থাবলীগুলোয় ধুলো পড়ছে সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলে পার —

পৃথিবী যে অনাদরে ঘরের বাইরে থাকতে চায় না, জোর করে ঢুকে পড়ে, তোমাকে তারা পরোয়াই করে না — দু'জনেই হাসলেন মৃদু কৌতুকে।

ডাক্তার এলেন, ওষুধ লিখে দিলেন। শিবানী সসঙ্কোচে নানকুর পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমার আবার অফিস আছে বাবা, এবার তুমি বাড়ি যাও — কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। নানকুর দু'হাত চেপে ধরেন — তোমরা আছ তাই নিশ্চিন্তে এখানে আছি —

কাজের মেয়ে বুড়িকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে আবার বাসুদেবের পাশে এসে বসলেন — মুখের উপর থেকে উদ্বেগের ঘন মেঘ সরে গিয়েছে। ডাক্তার বলে গেলেন তেমন আশঙ্কার কিছু পেলেন না তবু — এই তবুতেই বুকের ভিতরে টান ধরে আছে।

অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন ডাক্তার — এখুনি বা আগে কোন অশান্তি, কথা কাটাকাটি, পারিবারিক বিসম্বাদ, কোন দুঃসংবাদ, আর্থিক সঙ্কট —

মনের ভিতরে আর একবার খোঁজ করে এলেন শিবানী। না তেমন কিছু নেই। আর কেনই বা হবে কোন দুর্গ্রহ তো ভর করে নেই। ছেলে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, থাকত জার্মানিতে এখন কানাডায়। মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে। জামাইও বড় চাকুরে। যে যার মতন আছে। টাকা পয়সা যা আছে দু'জনের বেশ চলে যাবে বাকি জীবনটা। এর বেশি কি আর চাওয়ার থাকে এরকম ছাপোষা পরিবারে। মন দুলে উঠল শিবানীর — বুকের ভিতর ব্যথা গুমরে উঠল। মনের কথা মুখে আনা যায় না — তিনি যে ভাবেন, পরিবার পরিজনের মেলামেশায় আঁকড়ে থাকা সংসার। এমন দুটি মানুষের অক্ষম একা একা কানা সংসার যে দিনে দিনে পাথর করে দিচ্ছে তাঁকে —

ভাবনাটা যদি শিকড় বাকড় মেলে তাঁর বুকের সবখানি জুড়ে নাও থাকত শিবানী তবুও তাকে উপড়ে ফেলতে পারতেন না।

বারে বারে ঘাড় নেড়েছেন ডাক্তার, উঠতে উঠতে বলেছেন, শান্তিতে আনন্দে রাখবার চেষ্টা করবেন। নানকুকে বলে বসলেন, ই সি জি ব্লাড সুগার করে বাবাকে

নিয়ে যেও চেম্বারে — দেখি কি দাঁড়ায়। নানকুর দিকে চেয়ে শিবানীর হাঁটু দুটো মুহূর্তের জন্য জোর হারিয়ে ফেলল। বাসুদেব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন — ও আমার প্রতিবেশী — মানে বন্ধুর ছেলে —। শিবানী স্তব্ধ হয়ে বাসুদেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন — তবুও বাসুদেব স্বীকার করলেন না নানকু তাঁর ছেলের বন্ধু। ছেলেরই মত।

বড় ভাল ছেলে — না — ডাক্তার বেরিয়ে গেলে শিবানী ফিরে এসে আপনমনে বললেন। শিবানী থাকতে পারলেন না, দেখ তো রুমিকে তুমি ওর হাতে কিছুতেই দিলে না — এখন কেমন ব্যাঙ্কে চাকরি করছে — শিবানীর কাঁধে চাপড় মেরে উচ্ছসিত বাসুদেব ঘাড় [illegible] করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, তোমার জামাই ফরেন ঘুরে এসেছে — ডেপুটি ডাইরেক্টর, কতবড় চাকরি — কি যে বল —

শিবানীর চোখের জল ঝরঝরিয়ে নামল, ওগো ওই ধুয়ে জল খাও — নানকুর সাথে বিয়ে হলে ঘরের দোরে থাকত — একটি না হোক আর একটি মুখ দেখতে পেতাম—

বাসুদেব হা হা করে হেসে উঠলেন —

শিবানী ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এঘরে এসে শিবানী একা চোখের জল মোছেন। কাকে দোষ দেবেন। ধেড়ে মেয়েকে কত দিন বসিয়ে রাখা যায় — তিনিও তো জোর করতে ভরসা পেলেন না — আহারে। চোখ মুখ ধুয়ে গেলাসে জল নিয়ে ওষুধের বড়ি হাতে এঘরে এসে দেখেন জানলার বাইরে দুচোখ মেলে শুয়ে আছেন বাসুদেব — মন যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। নিজেকে এমন হারিয়ে ফেলা অবস্থায় কোনদিন দেখেননি তিনি। নিজের গলায় নিজের যোগ্যতার তক্‌মা ঝুলিয়ে চলা যার অভ্যাস — তার এমন আত্মবিস্মৃত চেহারা তাঁকে বড় বেদনা দিল। নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়ালেন — বাসুদেব কোন কথা বললেন না — কথা দিয়েই কি শুধু, সারা অবয়বেও মানুষ কত বেশি নিজেকে প্রকাশ করে দেয়।

হাত বাড়িয়ে শিবানীকে কাছে টেনে আনলেন। শিবানীর হাতের জলের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন — বসো —

শিবানীর চেয়ারের হাতলে বসলেন। যৌবনেও এমন অন্তরঙ্গ হয়ে কখনও বসেছেন কিনা মনে পড়ল না — বড্ড চোখে জল আসছে তাঁর —

ওষুধ খাওয়ালেন। মাথাটা বালিশের ওপর ঠিক করে শুইয়ে দিলেন।

অবাক হয়ে শিবানীকে দেখছেন বাসুদেব-কত অচেনা, কত দূরের লাগছে — কবে যে এক নেহাত মামুলী নারী তাঁর ঘরে এল, যার চোখে চেয়ে পাখীর নীড়ের কথা কোনদিন মনে পড়ল না, যার কোন অধরা মাধুরী আবিষ্কারের আবেগ মথিত হলেন না — অনাদরে পড়ে থাকা, ধুলোয় মালিন্যে বেরঙ এক আসবাবের বেশি মূল্য দেননি যাকে — তার মুখাটা হঠাৎ করে কবে তেলরঙা গভীর এক ব্যঞ্জনাময় চিত্র হয়ে উঠল — সকালের নরম আলোয় জাদু নাকি এ — মন দিয়ে দেখা ছায়াচ্ছন্ন

শিবানী যেন অজানা রাজ্য — যার কোন বন্দরে কোন পাহাড় চূড়ায়, কোন অরণ্য পথে তাঁর পা পড়েনি। নখের যুগ্যি নয় মেয়েটাই কত উপেক্ষা, কত অনাচার — কত মর্মাঘাত অনায়াসে বহন করে গেছে — যেন স্পর্শও করেনি — এমন অবলীলায় সব প্রত্যাখ্যান করে গেছে, আজকের আগে এ উপলব্ধি তাঁর হয়নি কেন! আশ্চর্য! আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে থাকার এ শক্তি তো তাঁর নেই।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাসুদেব। তাঁর নয় শিবানীরই তো রক্তচাপ বেশি, হয়ত আরও কোনও রুগ্নতা অপ্রকাশ্যই রয়ে গেছে — তাঁকে বিব্রত করতে চায় না বলেই —

অত কি ভাবছ — চোখ খুঁজে শুয়ে থাক তো—

শিবানীর বাহুতে হাত রাখলেন বাসুদেব — শীতল, সেই শীতলতা স্পর্শমাত্রেই স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়ে যায় — বুকের কোথায় শিউরে উঠে — অবসন্ন গলায় বলেন — কি আর ভাবব -

শোন উঠো না যেন - যাই একবার দেখে আসি রান্নার কি হলো —

মেয়েটাই যা পারে করুক না আজ —

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এখুনি আসছি —

শিবানী তাঁকে দেখে, যত্ন করে ব্যাকুলও হয় আশ্চর্য—

অফিস থেকে ফিরে নানকু খোঁজ নিতে এল। ই সি জি-র ব্যবস্থা করে এসেছে, বিকেলের দিকে। তাঁরা তৈরি হয়ে থাকবেন — একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে আসবে সে।

বাসুদেব ভীষণ আপত্তি করলেন — আমি অথর্ব নাকি — নিজেই চলে যেতে পারব — কাউকে লাগবে না।

নানকুর সামনে শিবানী কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। বুড়ি চা করে এনেছিল — খাবার সাজাতে হাত কাঁপছিল — সহজ হতে পারছেন না।

অফিস থেকে এসে আব ঝামেলা করতে হবে না বাবা — খাবাবের প্লেট এগিয়ে দিলেন — খেয়ে নাও।

এই তো বাড়ি গিয়ে খাব —

তা হোক —

কারো একজনের বল ভরসা যে আজ তাঁর বড় প্রয়োজন।

সব সেরে ঘরে এলেন শিবানী — বাসুদেবের খাবার নিয়ে — পাতলা একপিস পাউরুটি সেঁকা আর এক বাটি দুধ।

বাসুদেব খেতে খেতে নিজেকেই যেন বললেন — ছেলেটা ডিউটিফুল — আজকাল কটা ছেলেই বা এমন হয় —

মুখ নিচু করলেন শিবানী-টিউবের ফটফটে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পরস্পরের মুখ— লজ্জিত হতে পারার মতো আড়ালটুকুও নেই—

রুমির আছাড়ি কান্না দেখে বাসুদেবকে বলতে এসেছিলেন শিবানী— আর কিছুদিন দেখা যায় না, বড্ড কাঁদছে মেয়েটা —

আজকালকার বাজার — ভাল পাস করা হলেই যেন আর চাকরি মেলে।

শিবানীও টলে গেলেন। তার ওপরে খুঁতো ছেলে। রাজনীতির গন্ধ আছে। কদিন বাদে নানকুর বাবা রিটায়ার করবেন। গোটা সংসারের দায় — ওই ছেলের ঘাড়ে। টিউশানির কটা টাকা, বাপের পেনশন — ছোট ভাই বোন দুটি-। বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন — তবু আর একটা তো গলায় গলায়—কোথায় এক প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করছে। ছোট ছেলেটা এখনও কলেজের গণ্ডী পেরোয়নি। সবার উপরে বাসুদেবের দৃঢ় ধারণা একেবারে অকম্মার ধাড়ি। কিস্যু হবে না-দূর দূর -

রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেননি শিবানী। শুয়েছেন মেয়েকে কাছে নিয়ে — ভয় জেদী মেয়ে কি-না কি করে বসে। আর চোখের জল ফেলেছেন নিঃশব্দে।

বাসুদেব লাফাচ্ছেন — এত ভাল সম্বন্ধ ভেঙে দেব — কি যা তা বলছ — যদি আর তেমন না পাই — বযস তো বসে থাকবে না তোমার মেয়ের—

শিবানী এক একবার ভাবেন — খুঁত খুঁত করার কিছুই নেই। ছেলে শিক্ষিত, পরিবার শিক্ষিত, নিজেদের বাড়ি ঘর, মোটা চাকরি — এ নিয়ে কি আপত্তি করা সাজে। আবার মেয়ের কাটা ছাগলের মত ছটফটানি দেখেও বুক ফেটে যায়।

শেষে রুমি আর কোন কথাই বলল না, কাঁদল না— কতদূরে চলে গেল। আনতে চাইলেও আর আসে না। বিয়ের পর সন্ধ্যের আঁধারে আঁধারে দ্বিরাগমনে এল রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে চলে গেল, বলল তো হনিমুন — কে জানে -- মেযে জামাই ঘরে তুলতে এসে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিলেন তিনি— মরা মাছের মত সেই ফ্যাকাশে মুখে কি যে ছিল — কোন প্রসাধনই তাতে প্রাণের আলো ফোটাতে পারেনি। চোখ মাটিতে গাঁথা। হেঁট হয়ে হেঁটে এল পুতুলের মত যেন সম্পূর্ণ অজানা এক ঘর দুয়ারে সে প্রথম পা ফেলছে।

আমি যদি চাকরি করতাম কিছুতেই পারতে না এমন করতে- বিয়ের দিন নিদারুণ ক্ষোভে হতাশায় গুমরে উঠেছিল রুমি। ভেতরে ভেতরে সে চুর চুর হয়ে যাচ্ছিল।

যা করেছি ভালর জন্য করেছি — বুঝবি, একদিন সব বুঝবি — প্রাণ খোলা হাসি নিয়ে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন মেয়েকে বাসুদেব। দারুণ অবজ্ঞায় পিঠ ফিরিয়ে রইল রুমি কাঠের মত শক্ত হয়ে — তবুও কথা শেষ করে গেলেন, ক'দিন যাক না — নিদান দিলেন যেন।

পরেরদিনই চলে যাবে শুনে ব্যস্ত হয়ে বলতে এলেন শিবানী, কালকেই যাবি কিরে — তা হয় নাকি — প্রথমদিন জামাই এল, কি ভাববে — পাঁচজন আত্মীয়স্বজন আছে — শিবানী দিশেহারা হড়ে পড়েছেন —

ঘরের এক কোনে চেয়ার টেনে বসেছিল রুমি। ঘরে নাইট বাল্‌ব জ্বলছে, লাগছে শ্বেত পাথরের মূর্তির মতো। বাইরে আকাশ মেঘলা, সজল হাওয়া মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরের ভিতরে। জানলার পর্দাটা গুটিয়ে আছে ন্যাতার মত। রাস্তার বাতির হলদেটে ছোপ তার মুখের উপর —

তোমাদের মুখ রাখতেই এসেছি — নিয়মরক্ষা —

রাত পোয়াতেই চলে গেলে খুব মুখ থাকবে — দু'দিন থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি — কিছুতেই যাওয়া হবে না, এই বলে গেলাম —

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বিক্ষুব্ধ শিবানী।

আমার একটা বিবেক আছে — হৃদয় আছে — মা —

প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন যেন নিরেট পাথরে — স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেয়ে জামাই এ কি কোন বোঝাপড়া হয়েছিল, কে জানে। আসানসোলের এক স্কুলে চাকরি করতে লাগলো মেয়ে। তারপর থেকেই শোনা গেল বিলেত যাচ্ছে জামাই। সেইতো নানকু চাকরি পেয়ে গেল-জানলে কেমন লাগবে মেয়েটার-বুকের ভিতর ধড়ফড়িয়ে উঠল —। উৎফুল্ল শ্বশুর জামাই-এর বিলাত যাত্রা নিয়ে পাড়া মাতিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে বেড়ালেন এ কৃতিত্ব তাঁর, সবার ঈর্ষা পীড়িত মুগ্ধতা একলা তাঁরই প্রাপ্য। কেবল কৃতিত্বের প্রকাণ্ড তকমার নিচে মেয়েটা চাপা পড়ে গেল। সব বুঝেছেন শিবানী — সয়েছেন বুক বেঁধে।

ছেলেটা সবার জন্যেই করে -- শিবানীও হাসলেন। রুদ্ধ বাতাস সরে যাক --

সকালে নানকুর বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে — সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, ব্যগ্র হয়ে বলল, কি হয়েছে মাসিমা — সে ডাকে কোন ক্ষোভ, কোন তাপ ছিল না। ছেলেটার এবার একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি ওর মার সাথে কথা বলবেন। তখুনি মনে হ'ল তা কি আর হয়-রুমির বিয়েটা তাঁরা অপমান হিসাবেই নিয়েছেন হয়তো। মেয়ের কত ভাল বিয়ে দিয়েছেন এ নিয়ে বাসুদেবের পাড়া জুড়ে বাগাড়ম্বর, বুঝে করুন, অভ্যাস বশে করুন, ওদের হেয় করার কৌশল ছাড়া আর কিছু কি কেউ ভাবতে পারে। না — ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মত মুখ তাঁর নেই।

কার্ড ছাপানো হলে রুমিকে কয়েকটা দিয়ে বলেছিলেন তোর বন্ধুদের যাকে ইচ্ছে নেমতন্ন করিস — রুমি তাকিয়েও দেখেনি — উঠে চলে গিয়েছিল —

বুড়ি ডাকতে এল — নানকুদা এসেছেন —

কে-চমকে উঠলেন শিবানী, এমনই ডুবে গিয়েছিলেন অতীতে।

কাগজ এনেছে — দাদু তোমায় ডাকছেন —

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন — চা দে গিয়ে, যাচ্ছি আমি-এঘরে এসে শুনলেন নান্‌কু রিপোর্ট রেখে চলে গিয়েছে।

মিছেই গাঁট গরচা -- হেসে বললেন বাসুদেব, কিছুই পাওয়া যায়নি — বলেছিলাম কিনা —

ভাল কথা তো — বর্তমানে ফিরে এসেছেন শিবানী।

এত ঘেমেছ, কি করছিলে-তোমারও প্রেসার ট্রেসারগুলো দেখিয়ে নেব-বলে দিলাম — অদ্ভুত এক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন শিবানী — আঁচল দিয়ে মুখ গলা ঘাড় মুছে নিলেন। বড্ড ঘেমেছেন সত্যি — ভিতরের জামা কাপড় পর্যন্ত ভিজে গিয়েছে — পাখাটা খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন হয়তো — ।

শরীর খারাপ লাগছে—কই দেখি, কাঁধের উপর হাত রেখেছেন বাসুদেব—শিবানীর মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন—দু'জনে একসঙ্গে বিছানা নিলে—উদ্বেগে কথা শেষ হল না—আবারও ঘেমে উঠছেন শিবানী—এবার অস্বস্তিতে।

চা হাতে এসে দাঁড়ালো বুড়ি — নানকুদা চলে গেলেন — বললাম যে চা আনছি, বসো —

আমায় দে না—সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলেন শিবানী —

পাখাটা বাড়িয়ে দে তো মা—কি রকম ঘেমে গেছি দ্যাখ। বুড়ি বেরিয়ে যেতে বাসুদেব আস্তে করে বললেন দু'জনেই দু'জনকে দেখে রাখতে হবে বুঝতে পারলে — আর থাকতে পারলেন না শিবানী, রুমিকে আনতে হবে যাবে বলেছিলে-তা আর হ'ল না।

হবে খ'ন, সব হবে খ'ন ভেব না —

ও আর আসবে না—হু হু করে কেঁদে ফেললেন—কিছুতেই সামলাতে পারলেন না—কত বড় শাস্তিটা আমাদের দিল—

ভালই তো আছে বাপু, দিব্যি চাকরি বাকরি নিয়ে গুছিয়ে বসেছে — তুমিই শুধু মুদু কাঁদাকাটি করে মরো —

চোখ মুছতে মুছতে শিবানী বললেন — এত বছর বাদে বাচ্চা পেটে এল — ও এখানে আসবে না — দেখ এ আমি তোমায় লিখে দিতে পারি — নাতির মুখ দেখা আমাদের কপালে নেই।

দেখ না, এবার নিয়ে আসবই। তবে চাকরি করে তো —

আহা, চাকরিতে যেন ছুটি নেই—তাছাড়া নিজে আর যাওনি যেন — বাসুদেব হাসেন—অভিমান বুঝলে, যা চেয়েছে পেয়ে এসেছে কিনা। কেমন করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল শিবানীর-যা কোনদিন বলতে পারেননি, তাই বললেন—ছাই বোঝ তুমি, সর্বনাশা জেদ—পদে পদে হেনস্তা করা—

বাসুদেব চুপ করে থাকেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি তাঁর পছন্দ নয়। শ্বশুর শাশুড়ি রুমিকে চোখে হারান, পাড়া প্রতিবেশী প্রাণ খুলে প্রশংসা করে। ঠিকই মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে — যেন তিনি তার কেউ নন — বুকে তাঁর কি বাজেনি। কি করবেন সন্তানের মঙ্গলের স্বার্থে বাবা মাকে অনেক সহ্য করতে হয়। আর বিয়ে মানেই সন্তানকে পর করে দেওয়া — গোত্রান্তর করেছেন, পরের ঘরে তুলে দিয়েছেন আর তিনি চাইবেনই বা কি!

যাকে পর করেননি নিজের স্বপ্ন দিয়ে একাগ্রতা দিয়ে যাকে ক্রমেই আপনার পাঁজরের হাড়ের তুল্য করে তুলেছিলেন—সেও কি পর হয়ে গেল না। জীবনের সব শখ আহ্লাদ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে অকাতরে গুটিয়ে এনেছেন রাজার সুখে ঈর্ষা করেননি—সেই চোখের মণিটি যে তাঁর অগাধ জলে হারিয়ে গেল—সেই সর্বস্ব হারানোর হাহাকার ঢাকতেই বুঝি এই সামান্য দুঃখে এত উতলা হওয়া। মেয়ের মন, সন্তানের মুখ দেখলে সব গ্লানি ভুলে যাবে। নিজে

মেয়ে হয়েও শিবানী বুঝতে চান না। কোথাও তার মেয়েকে কি সে বেশি বোঝে, হয়তো অনেক বেশি সংবেদনশীল তাঁর রুমি। কিন্তু যুগটাই যে পালটে গেছে — কি তার জানে সে — বোঝাতে গেলে অযথা তর্ক বিতর্ক অশান্তি।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের যে মান্ধাতার ধারণা, তাই যে অচল হয়ে যাচ্ছে। এই-ই প্রগতি। মানুষের অভিষ্ট আজ উপার্জন — অর্থ উপার্জন, মেধাও উপার্জনের উপাদান। সবাই ছুটেছে সেই সোনার চাবিটির সন্ধানে। যে না ছুটছে সে উজবুক, সে বোকা পাঁঠা। নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখুন শিবানী — অভিলাষকে যখন জার্মানি পাঠালেন — পাড়াশুদ্ধ আত্মীয় স্বজন কি রকম হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

ওঃ বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা দাপিয়ে উঠল সদর্পে — গোত্তা খেলেন বাসুদেব। ছেলে বটে তাঁর, হীরের টুকরো। তিনি নিজে খারাপ ছাত্র ছিলেন না। ছেলেকে নিজের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সবকটি ধাপ পূরণের মত করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছেন। ছেলের স্টার পাওয়া ছিল তাঁর স্টার পাওয়া। এই কৃতিত্বের একটুখানি অবশ্য তার মাকেও ছাড়তে হয়। রাত জেগে সে বসে থেকেছে ছেলের পাশে, শেষ রাতে ঘুম থেকে তুলে গরম দুধ খাইয়ে বসে বসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেও নিশ্চয় স্বপ্নের একটি অতিসূক্ষ্ম জাল রচনা করে থাকবে।

মেয়ের মাথাও মন্দ ছিল না — কিন্তু তিনি অনন্যচিত্ত হয়ে একটি লক্ষ্যই ভেদ করতে চান। মেয়ে যা করেছে সে তার নিজের উৎসাহে, হয়তো দাদাকে দেখে। রুমি একটা চাকরিও জোগাড় করে ফেলল। তিনি কিছুতে করতে দেননি। দিলে বুঝি আজ সমস্ত পাটটাই পালটে যেত। নানকুকে ভাল লাগেনি কোনদিন, বড় দোষ উচ্চাশার অভাব — নিরাসক্ত গোছের। আরে মাটি টাকা টাকা মাটির দিন কি আছে! একদিন সংসার যার ঘাড়ে চাপবে, তার কি অমন ক্যাবলামি সাজে? অভির বন্ধু নানকু। অভিকে পড়াবার সময় এসে বসতো — একই সঙ্গে পড়ে — হয়তো অভিই বলে থাকবে। শান্ত বুদ্ধিমান। নিজের মত করে তাকেও গড়ে পিটে দেবেন ইচ্ছে ছিল — নিজের উপর অগাধ আস্থা — সব সময় বলতেন — কমপিটিশনের যুগ এসে গেছে — মাটিতে নেমে নিজের পথ নিজেই করে নিতে হবে — মনে রাখবে চারশ মিটার রেসে নেমেছ, একটি একটি করে প্রত্যেককে পিছনে ফেলে যেতে পারলেই তবে ট্রফিটা তোমার। আর যদি না পার ছাপোষার বাইরে কিচ্ছু হতে পারে না। বিজ্ঞানই এ যুগের স্বর্গের সিঁড়ি, কমপিউটার, ইলেকট্রনিক্স, পরমাণুর যুগ। নানকু কেমন করে সব এড়িয়ে স্বতন্ত্র একটা ধরন নিয়ে বেড়ে উঠল আর অভি ঠিক তাঁর পরিকল্পনার ছাঁচে খাপে খাপে বসে গেল — সে জয়েন্ট দিল, মেরিট র্সাচ এ

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বসল। কোথাও আটকাল না। সিলেক্টেডদের তালিকায় তার জায়গা বাঁধা।

উল্লাসে প্রীতি ভোজ দিয়ে ফেললেন। খাটাখাটুনি করল নানকু। সারাক্ষণ খুশিতে মশগুল — সে তখন অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে। বিজ্ঞান তাকে টানল না। বাসুদেব নিজের ব্যর্থতা মানতে রাজি ছিলেন না। অন্য একটি ব্যাখ্যা দিলেন — অভির প্রতি ঈর্ষা, কুৎসিত ঈর্ষার জ্বালায় বিজ্ঞান ছেড়ে দিল — অভির সমানে সমানে কোনদিন হতে পারবে না কিনা —

আর সেই থেকে ছেলেটার প্রতি তাঁর জাতক্রোধ জন্মে গেল। নিঃশব্দে উপেক্ষা করে গেল তাঁকে ওই অর্বাচীনটা —

ওর দ্বারা কিস্যু হবে না। গাটস্ নেই। প্রতিযোগিতায় বসতেই ভয় পায়, নাকি কনসেপ্‌শনই ক্লিয়ার নেই — নয়তো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স — ভ্রু উঁচিয়ে চোখের পাতা টান টান — চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এসব বলা তাঁর অবসেশনে এসে পৌঁছেছিল। যে চায়ের টেবিলে একা শিবানী থাকতেন তাঁর পাশে। তিনি জানতেন নানকুরা কত নিগ্রহ সয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আনাগোনা করে —

অভি জার্মানি চলে গেল — তাঁর আর মাটিতে নজর পড়ে না। স্বপ্নের জাদু কার্পেট পায়ের নিচে — পশ্চিম গোলার্ধের এক বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আশেপাশের সব কিছুর প্রতি তাঁর নিদারুণ তাচ্ছিল্য। ইউরোপের যে কোন জায়গা থেকে এ জায়গা কত যে নিকৃষ্ট তাই ভেবে তাঁর ঘুম ভাঙত — ঘুমোতেও যেতেন তেমনি কোন নিরক্ষীয় ভাবনা মাথায় নিয়ে — কারণ বিদেশী ম্যাগাজিনে তখন ঘর ভরে উঠেছে।

পড়তে পড়তে অভি দেশে আসতে পারেনি। বাসুদেব ছেলের খরচ সামলাতে কোচিং খুললেন। নানকুকেও ঢুকিয়ে নিলেন — ফার্স্টক্লাস পেয়ে সে তখন বসে। তারপর তিনি নানকুর অস্তিত্ব ভুলে গেলেন প্রায়। সে হ'ল কর্মচারী —।

একবার এসেছিল অভি শেষ পরীক্ষা দিয়ে। বাড়ির টাকায় কি কুলানো যায় — শেষের ক'বছর সে একটি ফার্মে কন্ট্র্যাক্টে কাজ করছিল। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত — তার পরেও বেশ ক'বছর টাকা পাঠাত, মোটা মোটা টাকা, তাইতেই বাড়িখানা রিমডেলিং করলেন একেবারে আধুনিক ডিজাইনে। আর মেয়ের বিয়ে দিলেন। ছেলেকেও জানিয়েছিলেন মেয়ে দেখছেন ছুটি নিয়ে আসতে।

তার শেষ চিঠি এসেছে কানাডা থেকে। জেরালডাইনকে নিয়ে তারা জার্মানি থেকে এসেছে কানাডায়। তার সঙ্গিনী তাদের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে সরে গেছে।

জেরিনাকে সে বলেছিল — ছেলে আমার ওকে আমায় দাও —

জেরিনা বলেছে — কি প্রমাণ আছে ছেলে তোমার — আইনের চোখে অবিবাহিত মায়ের সন্তান মায়ের —

প্রমাণ আমার আছে —

হেসে গড়িয়ে পড়েছে জেরিনা, বার্থ সার্টিফিকেট? ও তো জাল — টাকা দিয়ে বানানো — উজবুক।

স্তম্ভিত অভিকে হটিয়ে দিয়েছে সে —

না, শিবানীকে এসব বলতে পারেননি বাসুদেব। এই কটু সমস্যা সে বুঝবে কিনা — বুঝতে চাইবে কিনা — জানেন না। আর বলেই বা কি লাভ। তার বুকের জ্বালাটা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেওয়া।

অভি তার শেষ চিঠিতে লিখেছে — 'আমি ফতুর হতেও রাজি আছি বাবা, যদি আমার ছেলেকে আমি পাই। লিখেছে আমরা কি তবে সন্তানের বাবা হতেও পারব না। অনেক বড় চিঠি, অনেক কথা হৃদয় উজাড় করে লিখেছে 'আমিও তো ভেবেছিলাম তোমার মত করেই আমার ছেলেকেও আমি বড় করে তুলব জীবনের সিংহদ্বারে হাত ধরে নিয়ে যাব — মার মতো করে আমিই তার দীর্ঘরাত্রির তপস্যা স্নিগ্ধ করে তুলব — মমতায় শুভকামনায় ঘিরে রাখব তাকে — একটি সুদুর্লভ বৃক্ষের মতো।

তুমি বললে ফিরে আয় — তোর মা আছেন, আমি আছি, আমাদের অগাধ স্নেহ দিয়ে তোর সব ব্যথা বুকে করে বইব।' —

এরপর অকস্মাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে — "দেশত্যাগী জেরালডাইন পৃথিবীর কোনপ্রান্তে গিয়ে ঠাঁই পাবে আমি জানি না। ভারতীয় বলে সে আমার সাথে আসার সুযোগ করে নিয়েছিল — এখন তো তার কোন নাগরিকত্ব থাকবে না — কি হবে ওই অভাগা ছেলেটার, শরণার্থী শিবিরে শিবিরে ক্লেদাক্ত জীবনে — ওকে তারও কোন প্রয়োজন নেই —

শেষটুকু বড়ই খাপছাড়া — 'আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা, পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়েও তার কাছে সন্তান ভিক্ষা চাইব — যা সে চায় নিক —

আমি কি নিয়ে ফিরব বাবা"

বুক কাঁপছে, কাঁপতেই থাকবে। তিনিও জানতেন না। যে গ্রুপ ফোটো সে পাঠিয়েছিল তার ওপরে তো লেখা ছিল না — এ সন্তান বিবাহজাত নয় —

ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলেন বাসুদেব — শিবানী, শিবানী-এক্ষুণি একবার এস, এক্ষুনি —

তড়িৎগতিতে ছুটে এলেন শিবানী-কি হলো, ওগো কি হলো —

একটা কথা — স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন, বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন — কাতর অনুনয়ে জানতে চাইলেন — চেনা জানার সেই প্রথম রাতে কি বলেছিলাম আমি তোমায় — নিবিড় কোমল তাঁর গলা — আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না —

শিবানী আরও ঘন হয়ে বসে অবাক চোখ তুলে দেখতে থাকেন — জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে।

ভিতরে ভিতরে কাঁপতে থাকে সর্বাঙ্গ। তবে কি প্রথম চেনার সেই লগ্ন সত্যিই এল তাঁর জীবনে।

প্রথম দিনেই সেই তরুণ, তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সেদিনের সুতীব্র সুবাস তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে — ধীরে ধীরে দু'চোখ বন্ধ করলেন। চোখের কোণে বহুকালের জমাট বাঁধা অভিমানের অশ্রু চিক্ চিক্ করছে — বাসুদেব তাঁর হাত দুটি তখনও শক্ত করে ধরে আছেন — কি বলেছিলাম, বল বল — উত্তেজনায় শিবানীকে ধরে ঝাঁকুনি দেন — চোখে মুখে গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাস —

সে রাতেও চোখে জল উপচে পড়ছিল শিবানীর — কেন তা নিজেও জানেন না — তাঁর অশ্রু ধোয়া চোখে মুখে নিবিড় আসক্তি এঁকে দিয়ে — বাসুদেব বলেছিলেন — কেঁদ না — ছিঃ, আমি কোনদিন দুঃখ দেব না তোমায় —

একথা বোধ হয় আজ আর বলা যায় না।

সংক্রান্তি

ভোর হতে দেরি নেই আর। ঘন কুয়াশায় মোটা মাফলারে মাথা মুখ মুড়ে বুড়ো আইভানভ নাতির হাত ধ'রে মস্কো স্টেশনের পথে হাঁটছে। তার পরণে গতানুগতিক শ্রমিকের মোটা পোশাক। নাতির পোশাক অবশ্য একটু জাঁকালো। তাতে যথোপযুক্ত লেস বোতাম পকেটের আধিক্য যেমন আজকাল ফ্যাশান। সকালের প্রথম ট্রেনটাই ধরতে চলেছে তারা। বাতাস বার্চ ম্যাপেল পাইনের নব পল্লবের সুগন্ধে ভারী। রোদের তাপে এ কুয়াশার ভার একটু পরেই সব মিলিয়ে যাবে।

রেলের কাউন্টারে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে এক নিমেষে কে কোথায় ছিল বিশাল কিউ তৈরি হয়ে গেল। শেষ প্রান্ত হারিয়ে গেল জনসমুদ্রে।

কয়েকটা রুবল বাড়িয়ে দিল আইভনাভ-লেনিনগ্রাদ।

সরে যান মশাই-ও নামে স্টেশন নেই - রেলকর্মীটি ঝেঁঝে উঠলো।

আহ্লাদ নাকি, লেনিনগ্রাদ নামে স্টেশন নেই — আমার জন্ম কেটে গেল।

দাদু বুঝি কাগজটাগজ পড়েন না। অল্প বয়সী ছেলেটি পিছন থেকে টিপ্পুনী কাটে। চোখেমুখে কৌতুক মাখামাখি। লাইনের আরও পিছনে পরিণত যৌবনা এক মহিলা তরল গলায় বললো — পিটার্সবুর্গ দাদু-জলদি।

মাশা স্তম্ভিত দাদুর হাত টেনে ধরে — তুমি সেদিন বললে যে — লেনিনগ্রাদ কি যে সে নাম — লেনিন নিজে স্মোলনি থেকেই তো বিপ্লব পরিচালনা করলেন — তবে না সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা হলো-আর ফ্যাসিস্তরা তিন বছর অবরোধ করে রেখেও কিছু করতে পারলো না — হেরে পালিয়ে গেল —

কি খোকা বাড়িতে স্তালিনের ছবি আছে তাই না—

মাশা বিরক্ত মুখে তাকালো — আমার নাম সের্গেই আইভানভ — দাদু হলো — মুখ-কালো করে আইভানভ বললো-দিনল, জারের আমলের নামেই টিকিট দিন —

গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজছে। প্ল্যাটফরম দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য। এই সাত সকালে এত লোক যে কেন শুধু মুদু রেলের স্টেশন জুড়ে ঘোরাঘুরি করছে ভেবে পেল না আইভানভ। আজকাল মানুষজন হয়েছেও তেমনি — সোভিয়েতের যে মূল কথা - কাজ করো নিজের জন্য, কাজ করো সকলের জন্য — এ আর এরা মানেই না। অপরের জন্য কাজ তো দূরের কথা নিজের জন্য কাজটুকু করতেও যেন

এদের গায়ে বাঁধে। শখের বাবু — কমিউনিস্টদের খিদমদ খাটবো না — তুই শ্রমিক-কলে খামারে কাজ করবি না - যার যা কাজ করবি না — তবে এই ব্যবস্থাটা কি করে চলবে — বুঝতিস, যদি আগের আমলে মালিকের হাতে পড়তিস-ঠেলা বুঝিয়ে ছেড়ে দিত-যতসব গণ্ডমূর্খ —

গাড়ি নড়ে ওঠার সাথে সাথে আইভানভ মাশাকে জানালা থেকে টেনে এনে সিটে বসিয়ে দিল। মানুষের নিশ্ছিদ্র ভিড় কেটে শীর্ণ এক মহিলা ছুটে এসে চলন্ত গাড়িতেই উঠে পড়ল। তার পরণে জীর্ণ হয়ে যাওয়া সামান্য পোশাক শুকনো মুখে দীর্ঘ অপুষ্টি আর ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার ছাপ। কম্পার্টমেন্টের দেওয়ালে দেহের ভার রেখে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে — যেন শ্বাস কষ্টে ভোগে। হাতে ছোট্ট প্যাকেট মূল্যবান কিছুর মত সাবধানে বুকের কাছে ধরে রেখেছে।

আইভানভ সরে গিয়ে তাকে বসার জায়গা করে দিল। নিজের মালের পাশেই প্যাকেট রাখতে বলে সস্নেহে হাসলো। মেয়েটি ম্লান নির্জীব মুখে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো। আইভানভ নিজেকে সামলে নিল। মেয়েটির সাথে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। একে দেখার সাথে সাথে এক বিস্মৃত অতীত যেন মূর্তি ধরে সামনে এসে পড়েছে। যেন তার মা কিংবা বোনের মতো। সোভিয়েত সমাজে যেখানে এত সচ্ছলতা —

মাশা বলে বসলে — ওতে কি আন্টি —

মেয়েটি ফ্যাকাসে একটু হাসি নিয়ে ফিরে তাকালো এবার। সকালে না হয় নিষ্কর্মারা জড়ো হয়েছিল মস্কোয়। কিন্তু এখন তো কারো বেআক্কেলের মতো কাজকর্ম ফেলে স্টেশনে ভিড় জমাবার কথা নয়। কে জানে কাজকর্ম ফেলে দিয়ে হুল্লোড় করার কোনো নতুন হুজুগ জুটে গিয়েছে কিনা। এই করে দেশটা এরা উচ্ছন্নে নিয়ে যাবে — কেউ কিছু করতে পারবে না।

মাশার হাত ধরে ভিড় ঠেলে প্লাটফরম পার হয়ে এল আইভানভ। আশ্চর্য, একজন রেলকর্মীকেও তার নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পাওয়া গেল না। আবার ট্রেন ভর্তি করে যে এত লোক এল — তারাই বা কোথায় — প্ল্যাটফরমের বাইরে তো কেউ নেই — শুধু তারা দুজন আর সেই রহস্যময় মেয়েটি। ভানিয়া গাড়ি এনেছে — উঠে বসতে মেয়েটি এগিয়ে এল। শীর্ণ হাতখানা দরজায় রেখে করুণ অনুনয়ের সাথে বললো — এ গাড়িতে একটু জায়গা হবে —

আপনা থেকে আইভানভের ভ্রূতে ভাঁজ পড়লো, মাথা ঘুরিয়ে দেখল পথে আর কোন গাড়ি ঘোড়াই নেই — কেমন একটা সর্বাত্মক ধর্মঘটের চেহারা। অনিচ্ছুকভাবে বললো — কোথায় যেতে চাও —

চার্চে —

ভানিয়া, আমাদের নামিয়ে দিয়ে একে চার্চে পৌঁছে দিতে পারবে —

আচ্ছা-আচ্ছা —

গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়েছে — দূরে স্টেশন চত্বরে জমাট নিশ্চল ভিড়টা ফুলে

দুলে ওঠা উত্তুঙ্গ ঢেউ-এর আকারে পথের উপর আছড়ে পড়ল যেন। আইভানভ পিছনের কাচ দিয়ে দেখতে দেখতে বললো — কি হচ্ছে বল তো ভানিয়া- লেনিনগ্রাদে যেন নাজীরা বোমা ফেলেছে —

বুড়ো তুমি মরবে — ওই বুলিটুলিগুলো এবার ছাড় —কি ভ্যাজর-ভ্যাজর, বলি কি হচ্ছে এসব — অধৈর্য আইভানভ ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে — এই তো সেদিন গেলাম এর মধ্যে, আরে সামনে পিছনে সবদিক থেকে লোকে যেন ধেয়ে আসছে —

ওদের আগেই পৌছে যাব — বক বক করে আর মাথা খেও না আমার —

দেখতে দেখতে রাস্তাঘাট মানুষে মানুষে ছয়লাপ — এক একদিক থেকে লাফঝাঁপ দিতে দিতে আসছে কম বয়সী ছেলের দঙ্গল — গরবাচভকে চাই, ইয়েলৎসিন দেশ বাঁচাও — বুকে ঘুষি মারতে মারতে চেঁচাচ্ছে তারা — ইয়েলৎসিন, ইগেলৎসিন —

হুম — ভানিয়া হঠাৎ গাড়িটা একটা গলিতে ঢুকিয়ে দিল — নেমে পড়, নেমে পড়— একটু গলি দিয়ে হেঁটে যাও — ওকি মাশাকে দুজনের মাঝখানে রাখ —

গেট খুলে মাশাকে নিয়ে ঘরে চলে এল আইভানভ। মেয়েটিকে চার্চের চূড়ো দেখিয়ে বলেছে — হেঁটে চলে যাও বাছা — কি আর করবো।

সবে চেয়ার টেনে বসেছে জানালা থেকে মাশা ডাকলো — আন্টি ভয় পেয়েছে দাদু, দেখ —। মেয়েটি তখনও কাঠের মত দাঁড়িয়ে। প্যাকেটটা তেমনি বুকের কাছ ধরা। কুণ্ঠিত সন্ত্রস্তভাব।

এসো, হে হল্লা মিটুক ততক্ষণ — আইভানভ হাতে নেড়ে ডাকল। মেয়েটি শরীরটাকে যেন একরকম টেনে এনে চেয়ারে এসে বসল। সামোভারে জল ফুটছে। এক কাপ গরম চা তাকে এগিয়ে দিল আইভানভ। ঘরে আর কোন শব্দ নেই — বাইরে জনরোল দেওয়ালে দরজায় এমন কি বুকের হাড়গুলোতে পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলছে।

মাম্মি — জানালা থেকে চেঁচিয়ে উঠল মাশা — ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে

মাম্মি-মাম্মি —

দরজার মুখেই আইভানভ পুত্রবধূকে দৃষ্টি গেঁথে ফেললেন — কি ব্যাপার ছুটি নিয়ে এলে —

ধর্মঘট, বরিস নাকি ধর্মঘট ডেকেছেন —

ওঃ কিছু লোক দেখছি দেশটাকে আর দাঁড়াতে দেবে না — সোভিয়েতের এখন কত বড় বিপদ — পুনর্গঠনের সময়কার মত প্রাণ দিয়ে খাটা দরকার —

বাবা, আপনি যখন তখন স্তালিনী ধুয়ো তুলবেন না তো — লোকে আপনাকে বুঝবে না—

তা কেন বুঝবে — ফ্যাসিস্তরা যে দেশটাকে গিলে ফেলেছিল — তোমরা তো তাও উড়িয়ে দিচ্ছ। আমি, ভানিয়া, হাজার হাজার কমসমল গেরিলারা — এখনও আমার একটা পা নকল, এখনো আমার বুকের খাঁচায় ওদের বুলেট রয়েছে —

উত্তেজনায় পড় পড় করে জ্যাকেটটা খুলে ফেলে আইভানভ — মরলে বের করে দেখ সত্যি কিনা—

মাশা ছুটে আসে — দাদু তোমার সেই পদকটা আমার দেবে কিন্তু —

গেলিয়া এগিয়ে এসে সযত্নে জ্যাকেটটা পরিয়ে বোতাম এঁটে দেয়। মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে মিষ্টি করে হাসে — গুডমর্নিং — আটকে পড়েছেন তো —

আন্টি, মা, আমাদের সঙ্গে এসেছেন —

বেশ তো — ব্রেকফাস্টে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই —

না না — এখুনি যেতে হবে — আড়ষ্ট হয়ে ওঠে মেয়েটি —

বাঃ এত সকালে এসেছো নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি তোমার — আইভানভ বলে — যাও টেবিল সাজিয়ে ফেলগে —

মেয়েটি সেই থেকে একভাবে বসে আছে। তার গুটিশুটি বসার ভঙ্গিটি এমন করুণ, জীর্ণ পোশাকের নিচে কাঁধের চৌকো হাড়খানা এমনভাবে খাঁড়ার মত ফুটে উঠেছে। জারের আমলের জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এমনি মানুষেরাই তো পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকতো। সেইসব অশুভ স্মৃতির তাড়না আইভানভকে পীড়িত করে তুলেছে। গলার কাছে শক্ত কিছু আটকেছে — কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু এ মেয়েটির মর্যাদাবোধ এখনও টিকে আছে — নির্মম বাস্তব তাকে একেবারে গুড়িয়ে দিতে পারেনি।

সশব্দে দরজা ঠেলে উদভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকল ভাসিলি — তুমি পৌঁছে গেছ — যাক্-মাশা, মাশা কোথায় —

এই তো বাবা — দেখ আন্টি —

আচ্ছা — তোমার মা-মা কি—

গেলিয়া ব্রেক ফাস্ট টেবিল সাজাচ্ছে — ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আইভানভ — তুমিও ধর্মঘট করেছ — হলো কি তোমাদের — দেশটাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাও—

না বুঝে বড্ড বেশি কথা বল তুমি — দেশটেশ নিয়ে ভাবার কি তুমি ছাড়া কেউ নেই নাকি — বিরক্ত হয় ভাসিলি — সরকার ধর্মঘট ডাকলে আমরা কি করতে পারি। গেলিয়ার কারখানায় দাঙ্গা হয়েছে মেশিনপত্র ভাঙচুর হয়েছে — মেশিনগুলো বাঁচাতেও কারখানা বন্ধ রাখা দরকার — নাও, টি ভি খোল দেখি কতদূর কি এগোল — হাত বাড়িয়ে নিজেই সে টি ভির নবটা ঘুরিয়ে দিল। টি ভি-র পর্দায় ছবি ভেসে এল।

দ্যাখ, রুশ সংসদ ভবনের সামনে ট্যাঙ্ক, ব্যারিকেড —

রুশ জনগণের কাছে আহ্বান — রাষ্ট্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করুন — সারা দেশ অচল করে দিন — পথে নেমে আসুন — আমাদের উপর আক্রমণ এগিয়ে আসছে — ছবিটা স'রে গেল — বুশ— ঝুঁকে পড়ল আইভানভ - কি বলছে রে ভাসিলি -

কি আবার বলবে - হুমকি দিচ্ছে - টাকা পয়সা দেবে না - বরিসের পিছনে দাঁড়াতে বলছে - গরবাচ্যভকে ফিরিয়ে আনতে বলছে -

কেন কি হয়েছে গরবাচ্যভের -

থামো -

"রাষ্ট্রীয় কমিটিকে সমর্থন করুন - আমরা অখণ্ড সোভিয়েত, সার্বভৌমত্ব - এক পলকের ঝাপসা ছবিটা মিলিয়ে গেল -

পর্দা সাদা, কাঁপছে, অস্পষ্ট ভেসে এল - "মুক্ত বাজারনীতি আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করবে -"

বরিসকে দেখা গেল ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে - "গরবাচ্যভ আমাদের প্রিয় নেতা - তাঁকে টেলিভিশনে কথা বলতে দিতে হবে - অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হয়েছে তাঁকে - হত্যার উদ্দেশ্যে - স্তালিনপন্থীদের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

তোমরা খেতে এস - পর্দা তুলে মুখ বাড়ালো গেলিয়া-

তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঝড়ের বেগে ভিতরে এসে ঢুকল ভানিয়া। নাক মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে-

ভানিয়া-উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে আইভানভ - কি কাণ্ড - বাঁ হাতের কব্জিতে নাকমুখের রক্ত মুছে কথা বলার চেষ্টা করে ভানিয়া - কিন্তু রক্তে মুখ ভরে যায় - বেসিনে ফেলে আসে। ভাসিলি তার শুশ্রূষায় লেগে যায় - চেয়ারে বসিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগায় বরফের কুচি মুখে দেয় একটু একটু করে -

বাইরে কি দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল - দিশেহারা হয়ে পড়ে আইভানভ।

একটু সবুর কর বাবা, রক্ত বন্ধ হোক -

ওঃ ভানিয়া-

আরে, গাড়ি ঢুকিয়ে এলাম রাস্তায় - একটা হেলিকপ্টার বুঝলে ভাসিলি-রেডিও ট্রান্সমিটারে ফুল ভল্যুমে ঘোষণা করে গেল - পিটার্সবুর্গের দিকে সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে আসছে - ব্যারিকেড করুন - আটকে দিন - প্রিয় নেতা গরবাচ্যভের কোনো খবর নেই - আসুন নেমে পড়ুন - কর্তৃত্ববাদকে খতম করুন -

টিভি পর্দায় আবার জর্জ বুশ - জন মেজর - আরও সব অচেনা মুখ - আমি বসেই থাকব - খাবে না তোমরা -

আঃ বড্ড ব্যস্ত করছো তো - এখন কি খাবার সময় - আইভানভ রেগে ওঠে-

বুঝলে আইভান - এই শালাদের আমি বরদাস্ত করতে পারি না -

আমিও না - মাথা নাড়ে আইভানভ - আমাদের দুর্ভাগ্য ওরা আমাদের বন্ধু-চুলোয় যাক - ওই মারামারিটা কি হ'ল তারপর।

আরে কখানা লিফলেট - মনে হলো ওই হেলিকপ্টার থেকেই পড়ে থাকবে - হাতে হাতে বিলি হচ্ছে - আমি ঘুরিয়ে দেখছি কারা দিয়েছে দেখি সেই যে মার্কিনীরা ইরান যুদ্ধে যাদের ছাড়া আর কাউকে খবর প্রচার করতে দেয়নি সেই সি এন এন-কয়েকজন তাই দেখাদেখি করছি - অনেকেই বলাবলি করছে - এরা আমাদের

ব্যাপাবে লিফলেট দেবে কেন - কখন যে মাবামাবিটা লেগে গেছে - আমাকে পেছন থেকে চেপে ধবেছিল -

আবে দ্যাখ দ্যাখ - আইভানভ আব ভানিযা ঝুঁকে পডেছে - গেহ্যাদি মনে হলো না - "বাজনৈতিক জাতিগত সামাজিক সংঘর্ষ, নৈবাজ্য দেখা দিযেছে নাগবিকদেব জীবন ও নিবাপত্তা বিপন্ন - সমস্ত জনগোষ্ঠী" বিরতি - "মোকাবিলাব জন্য ষোল দফা -"

যাঃ খবব এমন ভেঙে ভেঙে গেলে ক্ষুব্ধ আইভানভ হাঁটুব ওপব সজোবে ঘুঁষি মাবে।

পবক্ষণেই ইযেলৎসিনেব ছবি ফুটে উঠল - আমবা সংসদ ভবনে অবরুদ্ধ - স্তালিনপন্থীদেব চক্রান্ত ব্যর্থ কবে দেবে - মূর্খেবা জানে না - সমাজ বদলে গিযেছে ওদেব ধ্বংস অনিবার্য -

ভানিযা, কি ভাবছ খেতে খেতে কথা বলছিল দুজনে। কেমন যেন বিভ্রান্ত আব অসহায।

- কি জানি - কত কীই তো ভাবছি - আবাব গুছিযে কিছু ভাবতেও পাবছি না - সবই অতীত, অতীত

তোমাব কি মনে হয - এই যে এবা নতুন কোন - মানে যা হলে আব কি সোভিযেত ব্যবস্থাটা অটুট থাকে - গববাচ্যভবা তো বিদেশী পুঁজি এনে ফেলছে - লেনিন যা বলতেন - নাঃ তেমন কিছু খোলসা কবে এবাও বলছে না কি বলো -

প্লেটেব উপব কাঁটাটা ঘষতে ঘষতে ভানিযা চুপ কবে শোনে - বলাব তো অনেক কিছুই আছে - কোনটা বলি - মুক্ত বাজাব - গলদটা কি - এই ব্যবস্থাব মধ্যেই পুঁজি টুজি খাটালে - ওই চীনেবা যেমন বলছে -

কি হলো অসুস্থ বোধ করছ নাকি - এতক্ষণে মেযেটিব উপব চোখ পডল আইভানভেব।

আইবিন - সহসা বলে ওঠে ভাসিলি - তুমি আইবিন না -

মেযেটি তাব উসকো খুসকো মাথাটা প্লেটেব ওপব নামিযে নীববে মাথা নাডে। অভিভূত ভাসিলি টেবিল ছেডে উঠে আসে - একি চেহাবা হযেছে তোমাব আইবিন - আলতোভাবে কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত কবাব ভঙ্গিতে বলে - কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই - ইউ আর অ্যাট হোম ডিয়ার - গলায আবেগের ছোঁযা লাগে তাব।

মেযেটি উঠে পডে টলতে টলতে বেসিনে গিযে হড হড কবে বমি করে দেয - তারপব কাঁপতে কাঁপতে ঢলে পড়ে। ভাসিলি দুই বলিষ্ঠ হাতেব মাঝে তাকে সাদবে টেনে নেয, আইবিন ওঃ আইবিন - গেলিযা, এ যে একেবাবে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে -

আমাবও মনে হয়েছিল মেযেটার শীত লাগছে - মানে এই পোশাকে ওর শীত মানছে না -

ডাক্তার - একজন ডাক্তার - ভাসিলি ব্যগ্র হয়ে ওঠে -

আঃ শোন, আমি এখুনি সামলে নেব - ক্ষীণ হযে আসে আইবিনেব গলা।

আইভানভ একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক দিনের অপুষ্টি, ভাসিলি - ওর শরীর আর বইছে না -

গেলিয়া, প্লীজ, তুমি একটু দেখ - কি করবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না - না, না, দোহাই ভাসিলি - হা অদৃষ্ট - আমাকে এখনও কি চেনা যায় -

ধীর শান্ত গেলিয়া ভাসিলিকে সরিয়ে নিজেই পাশে এসে বসল - দেখ হটবাথের ব্যবস্থা করতে পার কিনা।

এখন একটু ভাল লাগছে আইরিন - মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাসিলি।

কি ভাল বৌ তোমার - প্রায় ফিস ফিস করে বলে আইরিন - বল, রাশিয়ার মেয়েরা নাকি ঘর চায় না - তার ঠোঁটের কোণে মিষ্টি ভাঁজটির দিয়ে তাকিয়ে ভসিলির বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে - এত কষ্ট পেয়েছ একবার আমার খোঁজ করতে পারনি - আইরিন -

অদ্ভুত করে হাসে আইরিন - গত বছরটা আমি একরকম বেকার -

কি যে বল - একজন মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ার - সে চাকরি পায না সোভিয়েত রাশিয়ায় - যেখানে কেউ বেকার থাকে না।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বেকার থাকা যায়, উচ্ছন্নে যাওয়া যায়, চরম নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলা যায় - তুমি তার কি জান -

থাক-অত জেনে আমার কাজ নেই - নিজের এক্তিয়ারের বাইরে -

জেনে কাজ আছে কি নেই, সেই দ্বন্দ্বেই তো আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, ভাসিলি -

এখন থেকে সে সব দুঃস্বপ্ন ভুলে যাও - তোমাকে আমরা সুস্থ করে তুলব - ধীরে ধীরে কপালের উপর হাত বোলায় ভাসিলি।

ভাসিলি সে বড় ন্যক্কারজনক কাহিনী - কি করে ভুলি - নিজের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে—।

ভাসিলি তুমি যখন এখানেই ফিরে আসবে ঠিক করলে - মনে আছে আমি তখন এক স্প্যানিশ বন্ধুকে নিয়ে মশগুল - সে ছিল অ্যাপোলোর মত রূপবান আর তার ছিল অরফিয়াসের বাঁশি - সে কথা বলত মোহময় ভাষায়, বলতে বলতে বিশ্বভুবন ভুলিয়ে দিত আমি মোহিত হয়ে থাকতাম সারাক্ষণ - ও যখন পাশে নেই তখনও সেই মায়ার ভুবন ঘিরে থাকত আমায় - বোধহয় একেই ভালবাসা বলে - অরল্যান্ডো ছিল সাংবাদিক। সাংবাদিকদের রোমাঞ্চঘন মুক্ত জীবনের সম্মোহনী চিত্র সে এমন সজীবভাবে এঁকে তুলত যে আমি শিক্ষানবিশীর যান্ত্রিক, বাঁধা ধরা জীবন থেকে মুক্তি পেতে সাংবাদিকই হতে চাইলাম -

তুমি ওর ফাঁদে পা দিলে - আমি কিন্তু

ভাসিলি তুমি আমায় ভালবাসতে, আমি রাজি হলে - বিয়ে করতেও পিছপা হতে না - অরল্যান্ডো আর আমি বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম -

- সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দিতে এক নতুন রাশিয়াকে আবিষ্কারের পথে নামলাম

আমরা - ওঃ ভাসিলি - ভয়ঙ্কর সেই সব সমাজবিমুখ, আত্মম্ভরি সহজ সুখের সন্ধানী, সেই সব নেশাসক্ত অন্ধকারের জীব, বিশুদ্ধ শিল্পের নামে গজিয়ে ওঠা দলবদ্ধ বীভৎসতার উৎকট কাণ্ড কারখানা - নির্মল সুন্দর যা কিছু সব মুচড়ে নিংড়ে ছিবড়ে বিকল করে দেওয়া, প্রথম প্রথম ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তাম, কত নিকৃষ্ট, কত উলঙ্গ সেই সব উগ্র প্রবৃত্তির চর্চা - অরল্যান্ডো পাশে থাকলে এসব কিছুই অন্য বর্ণে অ্যা রসে অন্য সুরে গাঁথা হয়ে এক অনন্য চরিত্র পেত, একটু একটু করে সব প্রতিরোধ আমার শিথিল হয়ে এল - অথচ একা হলেই এক চূড়ান্ত বিভীষিকার মধ্যে, নিরেট অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি মনে হতো - আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আরও বেশি করে আমি অরল্যান্ডোর সান্নিধ্য আঁকড়ে ধরতে লাগলাম —

- এদের সব স্বাধীন সংগঠন, স্বাধীন টাউনশিপ, পত্র-পত্রিকা, প্রচার ব্যবস্থা যার উপর কোন না কোনভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল - তাতে যেসব লেখাপত্র ছবি ফটোগ্রাফ ছাপা হতো - তার কিছুই তোমার নজরে পড়েনি।

- বিশাল ক্যানভাসে - মনে হবে অগ্ন্যুৎপাত মনে হবে বিস্ফোরণ, মনে হবে পৃথিবীর জঠর উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ঘর্ষণে ঘর্ষণে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে - মনে হবে জীবনের এই অস্তিত্ব কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর -

- ভাসিলি কিছু বলছো না যে - বল- ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে আইরিনের চোখের স্বাভাবিক দীপ্তি -

কি দরকার এসব কথায় - নাই বা বললে আইরিন - ভাসিলি ওর শীর্ণ হাতখানি মুঠোয় চেপে ধরে -

আগে বলি - তারপর বুঝবে - কি দরকার - আমি ইহুদী তুমি জানতে ভাসিলি - হয়তো - জানতো না - আসলে আমরা ওভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম না - কিন্তু অরল্যান্ডো ধরে ফেলেছিল - আমার পাকা গমের মত রঙ, আমার হালকা বাদামী চুল - এমন নাকি ইহুদি ছাড়া হয় না। আমাকে ও ইসরায়েলের কথা শোনাতো - এক ঈশ্বর নির্দিষ্ট দেশ, বলতো জর্ডনের ওয়াল অব সরো'র কথা - বলতো ইসরায়েল সম্পর্কে ভাবালুতার জন্য ও একটুও লজ্জিত নয় - আমার পাসপোর্ট করতে দেওয়া হলো - বিয়ের পর আমরা ঘর বাঁধতে যাব -

অরল্যান্ডো তখন জরুরী দায়িত্ব নিয়ে পোল্যান্ড চলে গেল - কয়েকমাস বাদে ফিরে এল -

কিন্তু এই অবকাশে আমার আপন সত্তা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে - আমার মেধা আমার চিন্তাশক্তি জেগে উঠেছে - পুরনো কাঠামো বেরিয়ে আসছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বাইরের হালকা প্রলেপ - এভাবে তো আমি বাঁচব না - এত বাঁচার পথ নয় -

আমার শঙ্কা আমার সংশয় ধরা পড়ে গেল - আর ওরা আমাকে কোথাও স্থিতু হতে দিল না - যেখানেই কাজ করতে যাই - টিকতে পারি না - অনুপযুক্ত হই,

নয়তো ছাড়তে বাধ্য হই - ওদের সেই সব পত্রিকায় আমার লেখা, বিদেশের কাগজে যার রিপ্রিন্ট বেরিয়েছে - সব কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর হাতে - আমি এক সাসপেক্ট -

আমি তখনই জানতাম ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে - কি করে যে তুমি - উত্তেজিত ভাসিলি নিজেকে সামলে নেয় - তবু শেষ পর্যন্ত যে এখানে এসেছ -

আমি জেনে আসিনি ভাসিলি - চার্চ পর্যন্ত হেঁটে যেতে যদি না পারি -

চার্চে কি তোমার, আশ্রয় নেবে -

দূর, তোমার বাবা নিশ্চযই জানেন চার্চের আশোপাশে কোথাও এক জায়গায় ইহুদিদেব গণকবর আছে - ফ্যাসিস্ত দস্যুরা - মার কাছে শুনে ছিলাম। মাও মৃত্যুর আগে এখানে এসেছিলেন - আমিও এসেছি - অনেক খুঁজে মার জন্যে যে লাল মোমবাতি কিনেছিলাম - তাই একটা জোগাড় করেছি - এখন নাকি ওরকম আর তৈরি হচ্ছে না - এবার আমার প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হবে -

আইবিন - আবেগে ভাসিলির গলা ভারী হযে যায় - ছিঃ একজন কমিউনিস্ট কখনও প্রাযশ্চিত্ত করে না - সে তার ভুল সংশোধন করে - শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে -

আইরিন বলে - ওরা তোমায় লড়তে দেবে না ভাসিলি - ওরা তোমায় কমিউনিস্ট হতে দেবে না - আজকেই দেখ না - তুমি কি করছে জান না - জানো ? আমরা কি ঘরে দরোজা বন্ধ করে বসে নেই - কি হচ্ছে - কোথায় যাচ্ছি আমরা -

- আমরা বসে আছি ভাসিলি - আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে - অন্যদের হাতে - কমিউনিস্টদের হাতে সেই চালিকা শক্তি কি আর আছে ?

আইরিনের হাতের ওপরে ভাসিলির উষ্ণ হাতের সবল চাপ ক্রমেই শিথিল হয়ে এল। মুখের ওপর ঘনিযে আসা কালো ছায়া নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর স্বপ্নোত্থিতের মতো আত্মগতভাবেই বলে উঠল - কিন্তু আমি যে শ্রমিক, শ্রমিকের হাতের পতাকা কে কেড়ে নেবে !

বৃষ্টি বৃষ্টি

নীলেশদাকে কেউ এড়াতে পারে, এ আমরা বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে ছাত্র জীবনে আমরা যারা নীলেশদার ছায়ার ছায়া। নীলেশদাকে না দেখলে চোখে 'সর্ষে' ফুল দেখতাম, তারা যে কত নাচার সে আমি ছাড়া আর কে বেশি জানবে। দুনিয়ায় এমন মানুষও থাকে যাদের ঘিরে সব সময় কিছু লোক আপনিই জড়ো হয়ে যায়। কিসের আকর্ষণে তা তারাই জানে। অথবা হয়তো তেমন করে জানেও না।

ছাত্র জীবনের মেয়াদ পার করে সবাই যার যার থানা বেঁধেছি; কারো নামে বেশি রোগী টানে, কারো নামে ভোগী—করে খাওয়ার সড়ক পথে জাঁকিয়ে বসার দুরূহ ব্রতে সদা ব্যস্ত। তারই মধ্যে ওই ভগ্নদূতের আবির্ভাব, মাঝে মাঝে কি বিষম সঙ্কটে যে ফেলে দেয়! এই কদিন. আগে এক ওজনদার রোগী পাকড়েছি—নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার লম্বা ফিরিস্তি গছিয়ে দিয়েছি। রোগী সামনে বসে—রিপোর্ট খুলে দেখবো-দরজা ঠেলে নীলেশদা—আগাপাস্তলা উড়ো খৈ চেহারা—বিনা বাক্যব্যয়ে জাঁকিয়ে বসে পড়লো। মুশকিল—রিপোর্ট বের করার উপায় নেই—সরিয়ে রেখে রোগীকে যে বাইরে অপেক্ষা করতে বলবো—তেমন হেঁজিপেঁজি তো নয়। নীলেশদাকে উঠিয়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে বসাব ভাবলাম—

ওঠ, ওঠ, ভিতরে চল, কি অবস্থা তোমার—হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খাও।

রোগী ছেড়ে উঠে আসছি। নীলেশদা হাসলো—চা এখানেই বল—আমার তাড়া আছে—

এই লোকটা হাসলেও বিপদ—বুঝলাম ধরা পড়ে গেছি—হাসা ছাড়া আর উপায় কি—আমিও হাসলাম—

গ্রামের চাকরি করবো না, এ আমি গোড়াতেই ঠিক করেছিলাম। আর সেই গণ্ড গ্রামেই আমাকে ঠেলে নিয়ে এলো নীলেশদা—'আইক্যাম্প' করবে। হাতুড়ে, ওঝা, পুরুৎ পয়গম্বর যেখানে চিকিৎসার 'সোল' দায়িত্বে—তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে আমার মন করে না। সেখানে এদের হাতেই মানুষ বেঁচে বর্তে থাকে, দিব্যি থাকে। তাছাড়া আমার, মানে, এই আমার মত অনেকের একটা নিজস্ব মতবাদ আছে—ওষুধ বিষুধের রাসায়নিক দূষণ থেকে গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষদের রেহাই দেওয়াই উচিত। ওদের বরং শিকড় বাকড়ে টোট্‌কা-টোটকাতে টিঁকে থাকাই ভাল। গ্রামের মানুষের

আলগা দরদে লোকে যে আকছার চোখের জল ফেলে তাদের এই দূষণ-টুসন সম্পর্কে আর একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার। অবশ্য এইসব চোখের জলের বিন্দু গণনা করে, কারো কিছু ফায়দা থাকতেও পারে, সে আমি জানি না। তবে একথা বলবো, প্রসূতিবিদদের গ্রামে যাওয়া আবশ্যক। আমি প্রসূতিবিদ নই। চোখের ডাক্তার, ভদ্রলোকের অর্থাৎ কালি-কলমের কারবারিদের ডাক্তার—গ্রামে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া নীলেশদাদের বাড়াবাড়ি বইকি! নীলেশদা না হয়ে আর কেউ হলে তবু ভাবতাম, রাজনীতি নামক সর্বঘটে বুঝি আমের পল্লবের ব্যবস্থা হবে। বাক্স ভরা স্যাম্পেল ওষুধ, না-বাতিল কিছু যন্ত্রপাতি, এক দঙ্গল পথ শিশু (এও এক ফ্যাশান। আজকালকার কারবারে এদের খুব রমরমা)—পাঁচজন দাদা, ডঙ্কা বাজিয়ে চলে এলো, আমাকে ভাগিয়ে নিয়ে। যেন পিকনিকে আসছে।

ক্যাম্পের নামে যেখানটায় এসে পা রাখা গেল—তার দশা দেখে হার্টফেল করার মতো। একগাদা টোল টোপলা, লটর-পটর করতে করতে শেষ দু মাইল এবড়ো খেবড়ো টাঁড় ডাঙ্গড় ভেঙে ইস্কুল বাড়ি নামক জায়গায় পৌঁছেছি। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর, গা-হাত-পা টনটন, জুতোয় পা কেটে ভ্যান রিকশায় আদ্যন্ত ঝাঁকুনি খেতে খেতে সবার আগেই এসে দেওয়াল ভরসা করে নেতিয়ে পড়েছি। আর ওই জাতজন্ম খোয়ানো লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াগুলো দিব্যি নাচতে নাচতে গান গাইতে গাইতে পায়ে হেঁটেই এলো, তাই নয়—ফের দাপাদাপি করে কাজে-কর্মে লেগে গেছে। যাবে নাইবা কেন—ওইসব পায়ে দলা, ছ্যাঁচা খাওয়া, অশ্রদ্ধায় অবহেলায় ইট-কাঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত প্রাণশক্তি নিয়ে বেড়ে ওঠা মরুভূমির বাবলার সাথে কি তার মত অঢেল প্রাচুর্যে বড হওয়া মাখন মাখন ছেলের তুলনা হবে! এই নর্দমার জীবদের যত দেখছি ততো গা ঘিনঘিন করছে, রাগে ফুঁসছি এ কোন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে পড়েছি রে বাবা!

প্রথমে ইস্কুল বাড়িটা পরিত্যক্তই মনে হয়েছিল। ভাঙাচোবা টেবিল বেঞ্চি, ফুটো-ফাটা টিনের চাল—মরচে ঝরে পড়ছে। চওড়া মাটির দেওয়ালে বড়-বড় ফাটল—বিশেষ বিশেষ প্রাণীর পক্ষে বেশ আরামদায়ক আস্তানা। একটা দিকেই শুধু একটু সংস্কার হয়েছে—একটা বড় লম্বা ঘরই আস্ত পাকাপোক্ত। স্কুল নাকি সম্প্রতি হায়ার সেকেন্ডারি হয়েছে, তাই এই নতুন ল্যাবরেটরি ঘর।

এখানেই থাকা বুঝলি—ওই বেঞ্চি-টেবিল জোড়া দিয়ে মাটিতে মাদুর-টাদুর যা পাওয়া যায়, খড়-টড় বিছিয়ে নেওয়া যাবে—

তারপর—

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন নীলেশদা

—সাপ-খোপ, পোকা-মাকড়—একটু থেমে যোগ করলাম—মশা-মাছি, ইঁদুর-বাঁদর।

একটা চড় বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন—রাস্কেল, গদী, সোফা, গিজার হোটেল বুক করে বিলাস ভ্রমণে এসেছিস।

মাথা বাঁচাতে ছিটকে সরে এলাম—শরীর সিঁটিয়ে গেল ব্যথায়। এরই মধ্যে সর্বাঙ্গ

টাটিয়ে উঠেছে। বিপাকে পড়ে বললাম, নিদেন একটা মশারি—আমি বাপু কুইনিন গিলতে পারবো না—

সবার সঙ্গে এক মশারিতে শুতে পারবি তো—

একসঙ্গে—

একখানাই ভাল ঘর ছাদ আঁটা—ওদিকে যা—দ্যাখ গিয়ে চা হচ্ছে বোধহয়—

চা খাওয়া মাথায়—বাবা, আমি এসব পারবো না—ঝোপ বুঝে কেটে পড়তে হবে—ভাবতে ভাবতে বারান্দা থেকে নামছি—বাইরে বেরিয়ে ভাবগতিকে বুঝে আসবো—কোথা থেকে উচ্চিংড়ে একটা লাফাতে লাফাতে এলো—খাবার দিচ্ছে গো—খেয়ে যান—কোনখান থেকে কেউ তাকে ধরিয়ে দিল, ডাক্তার সাহেব—সেও পাখি পড়ার মতো ধুয়ো টানল—সায়েব—

এ সেই নোংরা হাঘরদের একটা, রামো : এরা এভাবেই পায়ে পায়ে ঘুরবে—এদের সাথেই শুতে বসতে হবে—

খিদেটা রীতিমতো সাড়া দিচ্ছে, দুপুরের খাবার অভিজ্ঞতা তখনও টাটকা রয়েছে। পথের পাশের বাংলা হোটেলে কিছু খাওয়া জুটেছিল—যার অনেকখানিই আত্মস্থ হয়নি। বেঞ্চের ওপর নোংরা শালের পাতায় কলায়ের গ্লাসে খাওয়া—অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবা ছিল না—নীলেশদার কনুয়ের খোঁচা খেতে খেতে তার খানিক গলাধঃকরণ করেই উঠে না পড়ে পারিনি। রান্নার খাদ্য কেমন—তা নয়—শুধু পরিবেশনেই গা গুলিয়ে উঠেছে।

গুটি গুটি এসে লাইনে দাঁড়ালাম, মস্ত ঝুড়ি একটা দুহাতে আঁকড়ে এগিয়ে আসছে একজন জোয়ান ছেলে—তার পিছনে পিছনে সেই দুটি হাভাতে—হাতে হাতে ঠোঙা ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঙায় মুড়ি আর ছোলা সেদ্ধ, এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা। একেবারে হতভম্ব। বুক খালি করা খিদের মুখে মুড়ি! জল চাইতে বেল। নীলেশদার ঠিক নজরে পড়েছে—দূর থেকেই আশ্বস্ত করছে—ওরে খেয়ে দেখ—ঘরে ভাজা মুড়ি—এমন মুড়ি খাসনি—

লম্বা টানা বারান্দা, পুরু হয়ে জমে আছে ধুলো। এখানে ওখানে ছাগলের নাদির ছড়াছড়ি, হলুদ পেচ্ছাব শুকিয়ে আছে—ঠোঙা হাতে নির্বিকার সব বসে পড়ছে তারই আশেপাশে।

কলকাতা ছেড়েই যখন বেরিয়েছি, মন চাইছে মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে। ঝিরঝির হওয়ায় গরমের ঝাঁঝ লেগে থাকলেও শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। স্কুল চত্বরটা বিরাট। তাকে ঘিরে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, সোঁদাল, সোনাঝুরির নতুন চারা তরতর করে বাড়ছে। অনেক দূরে প্রাচীন এক ঝাউ গাছ ডালপালা ভাঙা পঙ্গু—আর সব ধূ ধূ ফাঁকা প্রান্তর। এই নতুন প্রকৃতি যতই মনকে টানুক—নতুন জায়গা কাউকে সঙ্গী না পেলে একলা একলা ঘোরাঘুরি ঠিক হবে না হয়তো। এতো ভিতরে ঝাড়খণ্ডীরা আসে না কখনও, তবু সাবধানে চলাফেরা করার কথা বলাবলি হচ্ছিল

শুনেছি! এদিকে মন-মেজাজ যা বিগড়ে আছে এ সংসর্গ থেকে খানিকক্ষণ অব্যাহতি পেলে বাঁচতাম। কিন্তু সঙ্গী কোথায় পাই। স্থানীয় ছেলেদের সাথে হাত লাগিয়ে সকলে ক্যাম্প গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত।

এখানের রোদ বড় ঝাঁঝালো। তাকানো যায় না। এতক্ষণে তেজ কমে আসছে। অস্ত আলোর হলুদ রঙ লেগেছে। পাখিরা ডাকতে ডাকতে ফিরে যাচ্ছে— ডানার আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে—। কি একটা গন্ধের রেশ পাওয়া যাচ্ছে। বৃক্ষ-লতাহীন প্রান্তর কোথায় গিয়ে মিশেছে। এমন নিঃসীম প্রান্তরের বুঝি বিহ্বলতা আছে, পাখিদের নিজস্ব আকুল করা ঘরে ফেরার ডাক—আসন্ন সন্ধ্যায় মানুষ এমন একা হয়ে যায়—হাতড়ে বেড়ায় কি যেন ফেলে এসেছি, কি খুঁজে পাওয়া হলো না, কোন পুরনো ক্ষতে নতুন রক্তপাত—ঠিক এমনটা হয়তো নয়, অথচ এমনি এক অসহায়তায় টনটন করছে বুক—দূরে সরে গেছে ক্যাম্পের কোলাহল, ব্যস্ততা। একা বসে আছি। আঁধার ঘিরে আসছে।

অনামুখো এক ছোঁড়া সম্মোহনের জাল কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দিল। নীলদা ডাকছে—ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছি বিমনা—সে তড়বড়িয়ে আরও কিছু বলতো হয়তো

—হাতের ইশারায় তাকে ভাগাতাম।

বেজার মুখে উঠে দাঁড়িয়েছি, চোখের ওপর দিয়ে নীল রঙের একটা পাখি কাছের কোন ঝোপ থেকে উঠে গেল চড়া সুরে ডাকতে ডাকতে, অনধিকার প্রবেশে নিশ্চয়ই বিরক্ত। ওকে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ি আর কি। কলকলিয়ে অনেক হাসি উথলে উঠলো। এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম সেইসব ছেলেরা। আর তাদের সঙ্গে এক আধ ময়লা কাপড়ে কোন পথ কন্যা গাছকোমর বাঁধা। খোঁপায় তার কেউ কাঁটা ভরা বাবলার হলুদ ফুলের এক গোছা গুঁজে দিয়েছে।

আমার জন্যেই যেন ওৎ পেতে ছিল গিয়ে দাঁড়াতে একেবারে খড়্গ হস্ত। কি ব্যাপার তোর—আই ক্যাম্পটা শেষে পণ্ড করে দিবি, সবাই মিলে আমরা এতো চেষ্টা চরিত্র করে ক্যাম্পটা খুলেছি—গলা খাটো করে বললো—এক একটা রোগী ধরে আনা কি শক্ত যদি জানতিস—নীলেশদার এমন বিপন্ন চেহারা কখনও দেখিনি—আমাকে প্রায় ড্যানা ধরে নিয়ে চললো আর কি—পেশেন্ট বসে আছে—পালিয়ে না যায়—যেন আমিই ছাড়া পেলে উড়ে যাব।

কি করি—হেসে ফেললাম—প্রোটিনের সন্ধান করছিলাম—কি জায়গা বেছেছো মাইরি

শেষে বোতলের সন্ধানেও বেরুবি বোধহয়—বয়সে বড় হলে কি হবে—নীলেশদার জিভের আড় নেই।

এতো খোলাখুলি রঙ্গরসিকতা করবে যে লজ্জায় মুখ কালো হয়ে যাবে।

চট করে আউটডোর ছাপ মারা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে বাঁচি। সেখানে এক বুড়োকে নিয়ে বেশ বড় জটলা। ইনিই আমার মহামান্য রোগী। বুড়ো দাঁতহীন খোনা

গলায় হাউমাউ করে কাঁদছে—ছেলে ছোকরারা তাকে ঘিরে হাসছে, অভয় দিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে—

কি ব্যাপার—অভ্যাসবশে পেশাদারী কায়দায় পকেটে দু হাত চালান করে দিতেই স্বরটাও গম্ভীর আর রুক্ষ হয়ে উঠলো। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সবাই একযোগে কথা বলতে চায়। বুড়ো তাদের এড়িয়ে কি করে যে হুমড়ি খেয়ে এসে পায়ের উপর পড়লো—গোড় লাগে সাহেব, চক্ষু ভাংগা হবি বলে টেনে নে এয়েছে—আন্ধা আছি, আছি পেরাণডা তো যাচ্ছে না—ই বয়সে কি অক্তে জোর আছে—মোরে ছেড়ে দেন—ছেলে-ছোকরারা ছাড়বে না—বুড়োব নাতি, বুড়োর ছেলে সঙ্গে। ওদের বোঝাপড়া করতে দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। রোগী পেলে অপারেশন করবো—মনোরোগের চিকিৎসা আমার নয়। ওরা শুনি বুড়োকে ধমকাচ্ছে—চোখে দেখ না বলে বাড়ির লোকের মাথা খাচ্ছ দিনরাত—অপারেশন তোমার হবেই—

চোখ দেখা, চোখের অপারেশন অল্প হলেও নির্দিষ্ট কিছু কিছু জিনিসপত্র লাগে। সে সবের কি ব্যবস্থা হযেছে কে জানে—আমাকেই সে সব করে নিতে হবে বোধ হয়—নীলেশদা তো দরজায় পৌঁছে দিয়ে হাওয়া। কিন্তু রোগী দেখব কি ধোয়ার কুণ্ডলী মাঝে মাঝেই ঘরের ভিতরে ঢুকে চোখের জলে নাকের জলে এক করে দিচ্ছে। ব্যাপারটা দেখতে ভিতরে ঢুকতে হলো। খুপচি মতো ধোয়ায় অন্ধকার এক ঘর—পা না দিতেই চোখ মুখ জ্বালা ধরিয়ে দমবন্ধ হয়ে এলো—হেঁচে কেশে এক সা—ছটফটিয়ে বেরিয়ে এলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরের ব্যাপারটা দেখে তো চক্ষু স্থির—এই, এই কি করছিস—সভ্যতা ভব্যতা মাথায়—অমার্জিতভাবে গর্জে উঠেছি—মাথায় আগুন জ্বলছে—

সেই বেয়াদপ পথো মেঘটা — ময়লা কাপড়ে কালো মিশমিশে এক হাঁড়ি থেকে একটা বড় ফরসেপ করে বোধহয় ফোটানো যন্ত্রপাতি তুলে তুলে একটা ট্রেতে রাখছে। ট্রেটা ঘরে মেঝেয় নামানো। পা ঠুকে ধমকে উঠলাম — ভাগ্ এখান থেকে — ঢের হয়েছে — গেট্ আউট —

গায়ে মাখলো না — ঘুরে তাকালো না পর্যন্ত ধোঁয়ার বেড়াজাল ভেদ করে তার চুলের মুঠি ধরে বার করার ইতরতা পর্যন্ত যে এগোতে পারবে না, এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই বোধ করি সমান তেরিয়া গলায় বলে দিল — যান আপনার রোগীরা অনেকক্ষণ এসেছে — টেবিলে হাত ধোবার জল, স্পিরিট ল্যাম্প, স্পিরিট দেওয়া আছে — আমি এখুনি আসছি — এখানে আর গলা ফাটাবার দরকার নেই।

রাগে অপমানে জ্ঞানশূন্য হয়ে, জুতোর শব্দ তুলে বারান্দা পেরিয়ে একেবারে অফিস ঘরে নীলেশদার সামনে। হুঙ্কার ছাড়লাম — আমি এখুনি চলে যাচ্ছি — এই অসম্মানের মধ্যে তুমি আমাকে টেনে এনেছ। নীচ, লোফারদের সঙ্গে কাজ-কারবার জানলে আমি কখনো আসতাম না — চোখের মতো একটা সেনসিটিভ অরগ্যান নিয়ে এরকম ছেলেখেলা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব—প্রফেশনে আমার সুনাম আছে — আমি এথিক্স মেনে চলি —

আরও ছড়বেছড় বলে যেতাম কি না জানি না—

আরে থাম থাম—মাথা ঠাণ্ডা করে বল—হয়েছেটা কি—নীলেশদার পাথরের মতো ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর আমায় থামিয়ে দিল—অনেক খেটেখুটে পেশেন্টদের জড়ো করতে হয়েছে—ফার্স করতে নয়—

ফার্সের কথা বলছো—সে আমি করছি—বুকে হাত দিয়ে বলতো—গরিব নির্বোধ গেঁয়ো লোকগুলোর সরলতার সুযোগ তাদের তোল্লাই দিয়ে এনে ফেলেছে—তোমাদের প্রচার চাই না,—তুমি যে আজকাল মডার্ন সমাজসেবক সেজে বিদেশী আমদানির ধান্ধায় ঘুরছ—তোমার এ দুর্দশা কল্পনা করা যায়। আমায় দিয়ে এদের চোখ-কানা করার তুঘলকি কাণ্ড আমি কিছুতেই হতে দেব না—

—কি যা তা বক্‌ছিস—তোর যা যা দরকার বলেছিলি সবই তো গুটিয়ে এনেছি, তোকে দেখিয়েই এনেছি—জেনে শুনে অন্ধ করা, হেনতেন—মানে কি এসবের—ভেস্তে দিবি ঠিক করেছিস নাকি—এতটুকু উত্তেজনা ছিল না নীলেশদার মধ্যে।

ওষুধেই সব হয়ে যাবে—অস্ত্রপাতি, তুলো, গজ, ব্যাণ্ডেজ, স্টেরিলাইজ করতে হয়—এটা তো জানো—

আমিও তো একজন ডাক্তার—কাঁধে হাত রাখলেন নীলেশদা—

আমার কাঁধ কুঁকড়ে গেল—সব আছে—ঠিক যেমন দরকার তেমনি ব্যবস্থাই আছে—যার হাতে আছে তার কোন ত্রুটি আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি—

তাই বটে—কাঠের জালে হাড়ি বসিয়ে যন্ত্রপাতি শোধন

আরে দূর প্রেসার কুকার এনেছি না—

তবেই হয়েছে—এই তো দেখে আসছি আমি—একটা অশিক্ষিত অজাত কুজাত মেয়ে ধরে এনে শো করছো—

ছিঃ শেখর—তোকে আমি মার্জিত ছেলে বলেই জানি—কোন মেয়ে সম্পর্কে এতো সহজে অকথা কুকথা উচ্চারণ করা কি ঠিক—বিশেষ করে যাকে এতো লোক এতো সমাদর করে—

এতক্ষণে নিজের চার পাশটা দেখলাম—যে যেখানে ছিল উঠোনে ইতঃস্তত দাঁড়িয়ে—ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছে।

মাথাটা তোর বিগড়ে গেল নাকি—এক্সপার্ট লোক ছাড়া কি হেলথ ক্যাম্প হয়—একটাও বাজে লোক আনিনি আমরা—সোনা কাকা মানে অযোধ্যা ডাক্তারের দাতব্যখানা ওই মেয়েটাই চালায়—

আমি ঠোঁট মুচকে হাসি তোমাদের পথকন্যা—তাহলে সে দাতব্যখানা কেমন বোঝাই যাচ্ছে—ওই আপদমস্তক নোংরা—উচ্ছৃঙ্খল একটা মেয়ে, বিতৃষ্ণা ঢাকার আমার কি দায়—কোথায় কোন হাতুড়ে দাওয়াখানা চালায়—তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি?

জানিস না—ভাল কথা—তবে ওই তোকে অ্যাটেণ্ড করবে—আজকের মতো চালিয়ে নে—

বিনা বাক্যে ব্যয়ে নীলেশদা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটির সামনে।

অজগাঁয়ে হিটার কি গ্যাসের আশা করেননি নিশ্চয় — এখানকার মানুষ কাঠকুটো জ্বালায়—প্রেসার উঠলে কি স্টেরিলাইজ হবে না?—মেয়েটি নিচু গলায় বললো।

সেই নোংরা কাপড়ে, একমাথা অবিন্যস্ত রুক্ষু চুলে সে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রের উপর সবই যথাযথ সাজানো-গোছানো। মুখে নিঃশব্দ পিত্তিজলা হাসি। দাঁতে দাঁতে চেপে বললাম — যাও, অ্যাপ্রো পরে এসো —

মেয়েটি নির্বিকার। বললো — অ্যাপ্রো কোথায় পাবো-হাতে স্পিরিট মেখে সে তখন আগুনে হাত স্টেরিলাইজ করছে। দেখলাম সেই গাদাখানেক যন্ত্রপাতি থেকে ঠিক ছোট্ট রিট্র্যাক্টর কি আইরিস সিজার এনে রেখেছে ট্রেতে।

এই পোশাকে তুমি অ্যাসিস্ট করবে — অসম্ভব — আমি

ওই তো পারেন, কথায় কথায় হুমকি দিতে। আগে কাজ করে দেখান — যুদ্ধ ক্ষেত্রে ডাক্তাররা কি রকম চিকিৎসা করে সিনেমায়ও কি দেখেননি — রোগীর জামা স্টেরিলাইজ করেছেন। — নিন শুরু করুন — আমার আরও কাজ আছে —

একজনের চোখ দেখার পর যন্ত্রটা যে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে ফের স্টেরিলাইজ করে নিতে হয় — দেখলাম সেটা সে জানে —

আমি অ্যাপ্রো এনেছি তোমাকে দেব — আমার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে — এমন অপরিচ্ছন্ন বেশবাসে একজন সহকারীকে দেখতে —

তাহলে তো আবার একটা টুপিও লাগবে — খোলাখুলি হেসে উঠলো বাচাল মেয়েটা —

রোগী দেখা শেষ হলো। শিশুদের চোখের সমস্যাই বেশী — সবই প্রায় ভিটামিনের অভাব — চোখে ক্যাটার‍্যাক্ট কাটার অবস্থায় রয়েছে অনেকদিন — এই সেই বুড়ো — হাউ হাউ করে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙে ফেলেছে। তার জন্যে বেড রেডি করতে হচ্ছে। বুড়োর বাড়ির ছেলেদের নিয়ে মেয়েটি ক্লাসঘর থেকে টেনেটুনে দুটো বেঞ্চ এনে জোড়া দিল। বাড়ি থেকে আনা কাঁথা কম্বলেই পাতা হলো তার শয্যা। মনটা খুঁতখুঁত করছিল। নান্যপন্থ্যাঃ।

ওঃ কি রোদ। রোদের দিকে তাকানো দূরে থাক। শরীরে জ্বালা ধরেছে — চোখ-মুখ পুড়ে যাচ্ছে। স্নানটা সেরে ফেলতে পারলে একটু স্বস্তি হতো। আগের দিনে স্নান হয়নি। খিদেও পেয়েছে। মুড়ির মতো হালকা পদার্থ কতক্ষণ আর পেটের জ্বালা জুড়োবে।

স্নানের ব্যাপারটা যে কতদূর গুরুতর — হায় হায়, কলকাতা ছাড়ার আগে তা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম — একেবারে খেয়াল হয়নি — এ যা ব্যাপার-স্যাপার-খিদে তেষ্টা নিকুচি করেছে — প্রকৃতি যে কত রকমে আমাদের বেঁধেছেন — । সাঁতার জানি না, পুকুরে-টুকুরে সলিল সমাধির সুবন্দোবস্তই আছে। নীলেশদা পরামর্শ দিলেন — পড়ুয়াদের একটাকে ধরে নিয়ে যা, স্নান করিয়ে দেবে—আমরাও তাই কবি —

গিয়ে দেখি, তোলপাড় করে স্নান চলেছে পুকুরে—সেই হতভাগাগুলোর সাথে মেয়েটাও। দেখেই লাফালাফি — নেমে আসুন — ও সাহেব, আমি স্নান করিয়ে দেব — আমি স্নান করিয়ে দেব —

সমুদ্রে স্নানটান করেছেন তো — নুলিয়ার মতো এরাও বেশ স্নান করিয়ে দিতে পারবে — মেয়েটা গলা জলে দাঁড়িয়ে — দু'হাতে জল কাটতে টিপ্পুনি কাটে। আমাকে পাড়ের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসতে থাকে — যান বাবা, ঘরে গিয়ে বসুন — জল নিয়ে আসছি —

কথাগুলো হুলের মতো বেঁধে, এর সাথে মেশা অবজ্ঞার সুরটা অগ্রাহ্য করা যায় না। অক্ষম রাগে রি রি করে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলাম। বলতেই পুকুর আসলে ওটা ডোবাই, তায় শুখা টাঁড় অঞ্চল — জলও তেমন গভীর নয়। এসব সত্যি। কেবল সাঁতার যারা না জানে তারাই বোঝে জলে নামার আতঙ্ক!

শামুকের মতো গুটিয়ে গিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে বালতির জলে চারপাশের জোড়া জোড়া চোখের সামনে স্নান করতে বসলাম। তোয়ালে সম্বল করে নিজের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে — লক্ষ বার ধরণী দ্বিধা হও বলতে বলতে — । আজন্ম বাথরুমচারী, পোশাকদুরস্ত মানুষেরাই আমার এ দুর্দশা মালুম করতে পারবেন। অথচ ভিজে কাপড়ে পুকুর থেকে ছেলেগুলোর সাথে বালতি করে হাতে হাতে জল তুলে আনলো যে মেয়েটি তার দিকে চোখ পড়তেই চোখ আপনি বুঁজে এলো। দৃশ্যটা এমন কিছু নতুন নয়—সিনেমার পর্দায় নিত্য দেখা। বৈকল্যহীন। অনায়াসে সে ভিজে কাপড় ছেড়ে, শুকনো কাপড় পরলো, ছেলেগুলোকে ছাড়তে সাহায্য করলো, চিরুনি দিয়ে তাদের আঁচড়ে দিল। চোখ না তুলেও আমার কুণ্ঠার অবধি নেই। অথচ কতো সহজে এক নারী জননী হয়ে উঠতে পারে।

আপনাকেও চুল আঁচড়ে দেব নাকি —

হরিবল্ — মুখ লাল করে ঘরের ভিতরে এসে কাপড় ছাড়লাম। এই মেয়েটার উসকানিতেই সবাই বাঁদর নাচছে — মনে হতে লাগলো, সবাই আমার কাণ্ড দেখে মুখ লুকিয়ে হাসছে।

সন্ধ্যায় আলোচনা সভা। কাটবো ঠিক করেই রেখেছিলাম। সেদিন হয়নি, আজ পারবো, নতুনত্বের ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে গ্রামটায় ঢুকে পড়া এখন আর ততো সমস্যা নয়। খাদ্যাভাবে বড়ই কাহিল হয়ে আছি — প্রোটিনের অভাব যে করেই হোক কাটাতে হবে। তৃণভোজী আমি একেবারেই নই। রীতিমতো মাংসাশি। সেদিন নতুন বলে মানুষের সহানুভূতির ঘাটতি হতে পারতো আজ তো নয়।

আট দশ ঘরের গ্রাম — এলোমেলো ছড়ানো ছিটোনো — এমনি ছোট ছোট বসতি সর্বত্র। দীন দরিদ্র — কোন নির্দিষ্ট পেশাও নেই। আগে নাকি কাঠুরে ছিল — বনের কাঠ কাটতে যেত-ঠিকাদারদের সাথে। বনই ভরসা। গাছের ফল-মূল পাতায়, পশু-পাখিতে জীবনধারণ ছিল। বন চলে গেল ঠিকাদারের হাতে — ওরাও ঠিকাদারের লোক হয়ে গেল। কয় সাল হলো পঞ্চায়েত এলো যে বছর—সেখানে থেকে অবস্থাটা

যেন ঘুরেছে। তারা বন কাটা বন্ধ করতে চাইছে। নতুন বন লাগাও, চারা তৈরি করে — এদেশ জঙ্গলে ছাওয়া ছিল — আমরা গাছের সন্তান — একটু একটু ধরছে লোকের মনে। হাতের কাজ করতে বলছে, ছাগল, মুরগি দিচ্ছে।

—শালপাতার বাসন এই দেখ — না বাবা কে কিনবে হেথা — কারবারি নিয়ে যাবে —

তবে সাহেব, ক্যাম্পে একদিন সবাই মিলে দিব —

এদের কাছে কি নেশার জিনিসের খবর নেওয়া যায়! শুনে এসেছিলাম — ডেলিসাস — দলবল সঙ্গে থাকলে যা হয় — প্রমোদ ভ্রমণে এসে এর স্বাদ যারা নিয়ে গেছে — এ ক্লু তাদের সাপ্লাই দেওয়া। কিন্তু যে সম্মান যে মর্যাদা দিয়ে এরা অনায়াসে মাথায় তুলে নেয় — এ বাঁদরামি এরপর আর মানায়।

ভদ্দর লোকদের এই বিড়ম্বনা। যেই বিক্রমাদিত্যের আসন পেতে দিল — অমনি বিক্রমাদিত্য সেজে বসলাম। নকলনবিশীতে টেক্কা দেয় কে? যাত্রা দলের অধিকারীর মতো বুকে তকমার পর তকমা এঁটে দাম বাড়াতে জীবনের সব সম্পর্ক সমৃদ্ধির চাকায় বেঁধে অন্ধের মতো সেই আবর্তে পাক খেতে খেতে চলেছি। এই ছকটি ভাঙা বড় কঠিন। যত সীমাবদ্ধ হোক — এখানেই তুমি স্বচ্ছন্দ, এই চেনা গণ্ডিতেই তুমি বুক ফুলিয়ে বিচরণ করতে পার। গণ্ডি ছাড়ালে এক অজ্ঞাত দুনিয়া, নানা অপরিজ্ঞাত রহস্য—বোধবুদ্ধি থই পায় না। তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে সেই প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয়।

অতি সাধারণ একটা মেয়ে ভিজে কাপড়ে যখন পুকুর থেকে উঠে এলো — এই সজীব চিত্রটি সে সহ্য করতে পারলো না — চোখ বুজিয়ে ফেললো। অথচ গ্রামে-গঞ্জে এদিকে কেউ ফিরেও দেখে না — একই পুকুরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্নান করে সকলের সামনে দিয়ে তারা চলেও যায় — এই ছবি কোনদিন বাসনার চড়া রঙে চোবানো নয়। মেয়েদের ব্যাপারে ডাক্তারদের কোন অলীক মোহ থাকে না — নারীসঙ্গও এমন দুর্লভ নয়। তাছাড়া সুচরিতা, সুচিস্মিতাদের তীরন্দাজী পারাপার করে এসেছে, শেষে কাঁটার ঘায়ে মূর্ছা যাবে না নিশ্চয়!

মেয়েটা কত অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সবখানে একটা গতি এনে দিচ্ছে — সারাক্ষণ হরিণীর ক্ষিপ্রতায় সবেতেই হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে আশ্চর্য প্রাণসঞ্চার করে যাচ্ছে। কি জাদু জানে সে। আপনাকে সবার মধ্যে মিলিয়ে রেখে সবাইকে নিয়ে সবখানে জুড়ে থাকা — এ তো অসাধ্যসাধন — । এ মেয়ে কোথায় শিখল। মনের খুশি যেন ঝরনার ধারায় ঝরেই যায় — ক্ষণে ক্ষণে গান গেয়ে ওঠে. ওদের মিলিত কণ্ঠ। ওদের সাথে আমারও গলা মিলে যেতে চায় — কিন্তু স্বর ফোটে কই!

নীলেশদার সেই কথাটা মনে পড়ে, অত তাড়াতাড়ি কারও সম্বন্ধে কিছু বলতে নেই — সত্যও মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত হয়।

এই চতুর মেয়েটাই আমার তুচ্ছতাকে, আমার আত্মশ্লাঘার ফাঁকা মুখোশটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে স্পষ্ট আলোয় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর আমার বিষদৃষ্টির সামনে

ফনীমনসার মতো মাথা উঁচিয়ে আছে। আপনমনে থাকলে কখন যে মেয়েটা এসে মন জুড়ে বসে — গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ি। বেলা শেষের আলোয় বাইরেটা যে কি অসাধারণ হয়ে ওঠে, অভিভূত করে দেয়। লাল হয়ে আসা আকাশের পরতে পরতে নানা রঙের মেঘ, আশ্চর্য কত রূপে ভেঙে কোন অদৃশ্য শিল্পী আপন খেয়ালে বিমূর্ত অবয়ব গড়ে তুলছে। সিঁদুরে মাটির সিঁথির মতো পথ। দুধারে সোনালী চুল বিছিয়ে আলস্যে এলিয়ে বসেছে প্রকৃতি। মাঝে মধ্যে জবুথুবু মুখ থুবড়ে পড়া কঙ্কালসার ঝোপঝাড় আশস্যাওড়া, বাবলার বিশীর্ণ শরীর শুকনো লতার মরণ আলিঙ্গনে বাঁধা। দূরে মাঠের ওপারে গানের সাড়া পেলাম। সেই হামলাবাজ পথশিশু আর তাদের পাণ্ডাটি শুকিয়ে যাওয়া জংলা গাছের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তারা আসছে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' সার বেঁধে হাতে হাত ধরে যেন নাচতে নাচতে চলেছে। বিব্রত হয়ে ওদের দৃষ্টি থেকে আড়ালে যাব ভাবছি — ঝোপ জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে ওরাই সামনে এসে পড়লো —

ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব —

এ কি রে — আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। এ অবস্থায় এদের দেখে সত্যিই বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

জ্বালানী — রোজ যে রান্না-বান্না হচ্ছে দেখছেন না

তোমরাই রোজ রোজ

আমরাও একটু হাত লাগালাম

এরকম যে ঘুরে বেড়াও তোমার বাড়িতে তোমায় ছাড়ে —

আচমকা একটা বাজে প্রশ্ন করে বসলাম মেয়েটাকে — ছাড়ুক না ছাড়ুক তাতে আমার কি ?

মেয়েটি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে — আমাদের ঘিরে ধরেছে ছোকরাগুলো

আরও মেয়ে কাজ করছে এখানে, দেখেননি

তা বলে কাঠ কুড়োতে হবে —

খারাপ কি, রূপকথায় ঘুঁটে কুড়ুনি রানী, কাঠকুড়ুনী রানীও থাকতো না —

'আমরা সবাই রাজা' গান গাইতে গাইতে ওরা চলে গেল।

বুঝলাম এ ওর তাচ্ছিল্য। বিষিয়ে গেল মন।

কোথাকার কোন দাতব্য খানার দেখভাল করনেওয়ালার দেমাক দেখ—কথা বলার কি ছিরি — কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় — কাকে কতটুকু সমীহ করতে হয় কিছুই শেখেনি — শিখবে কি করে ভদ্রজনের সঙ্গে মেলামেশা থাকলে তো — ওই তো বস্তিবাসী ঝুপড়িবাসীদের নিয়েই কারবার। হাবেভাবে তো মনে হচ্ছে, এই পথশিশুর ধাপ্পাটা ওর, আর কে ওই ডাঃ অযোধ্যা নাথ — নামটা যেন শুনেছি কোথায় — তার দাতব্যখানা, না দাতব্য-টাতব্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, ওসব ব্যধি — তবে আমদানির পথ বার করতে পারলে দাতব্যও বেশ লাভজনক হচ্ছে। আচ্ছা সেই লোকটা নয়তো — নীলেশদা যার জন্যে ডোনেশন তুললো কিছুদিন

আগে — রেডক্রশ না কোথা থেকে একটা মেশিন পাচ্ছে — হার্ট পরীক্ষার — সেটা বসাবে — হ্যাঁ, দাতব্য-টাতব্য কি একটা বলেছিল বোধহয় — তাহলে এই সেই, নীলেশদার তাই এত অদিখ্যেতা মেয়েটাকে নিয়ে। এই তো বাবা পথশিশু-টিশুর ব্যাপার এবার বোঝা গেল। ওহো, সেই জনস্বাস্থ্যের প্রেসিডেন্ট নয়তো। চুলোয় যাক্।

শুনেছিলাম কাছাকাছি সুন্দর একটা স্পট আছে। তারই সন্ধানে এসেছি। যত এগিয়ে যাই ততোই বড় বড় বুক সমান সোনালী ঘাসের প্রান্তর। বাতাসে রেশমের মতো কাঁপছে। সেই জংলী কঙ্কাল, সেই লতা-পাতায় জড়িয়ে নিশ্ছিদ্র ঝোপঝাড়। আকন্দ, ঘেঁটু, ফণী মনসা। ফণী মনসায়ও এমন হলুদ ফুল — আকাশে হলুদ আলো, গাছে হলুদ ফুল, পাতায় হলুদ, হলুদ ঘাসের সমুদ্র এই তরল হলুদে আপ্লুত হয়ে গেছি।

কখনও কি জানতাম এমন বিনা কাজে ঘাসের এক পরিত্যক্ত প্রান্তরে নিরুদ্দেশে পথ খুঁজে মরবো। দিন আসে প্রাতঃরাশের টেবিলে, তারপর টেবিল থেকে টেবিলে দিন বয়ে রাত আসে, মাঝে মধ্যে যানবাহনের কোলে, কেদারার আশ্রয়ে পকেটভরা টাকা হাতের মুঠোয় — এই যার প্রাত্যহিকী।

বাঃ বেশ — নীলেশদা আমার চেম্বারে বসে বলেছিল মঙ্গলগ্রহের জীবের মত নিজের নিজের নিশ্ছিদ্র স্পেসক্রাফটে ঘুরছিস — এই জন্যেই তো গ্রামে এসে ডাক্তারী করতে পারিসনে, ডাক্তারী পাস করলে তোদের কারও শিং গজায়, কারও ঘাড়ে কেশর। এই জনহীন শূন্যতায় দাঁড়িয়ে একথার শ্লেষটুকু যেন ধরাছোঁয়া যায় — অপমান মনে করে জ্বালা ধরে না —

কোথায় যাচ্ছি কোনদিকে হাঁটছি কিছু তো জানি না — কে যেন চেঁচিয়ে বললো — ও সাহেব ওদিকে যেওনি, ও বাগে শ্মশান — এদিক-ওদিক তাকিয়ে অদৃশ্যকে খুঁজছি — বুক সমান ঘাসের জঙ্গলের ওপর মাথা জাগিয়ে এক বুড়ো কাস্তে নেড়ে নেড়ে আশ্বাস দিচ্ছে — কুনো ভয় নাই গো— বইলবে "ভূত আমার পূত" জানো লেশ্চয় – কিছুতেই ভয় মাইনবে না— মুনিষ্যিই অমনিষ্যি হয়ে যায় —

থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি — ডাক্তারের ভুতের ভয় থাকে না — কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছি চিনে আবার ফিরতে হবে তো। ঘাসের বোঝা কাঁধে বুড়ো বেরিয়ে এল-কুথা যাবে'গ—ই ঘাসের বড় দাঁত-বুঝে শুনে যেইও, ঘাসের তলায় কাঁটার গাছ।

সাহেব ডাক্তার গো দাদু-চোখ দেখাও তো ক্যাম্পে এস-বড় একখানা কাটারি হাতে একটি জোয়ান ছেলে একখানা মোটা ডাল হেঁচড়ে টেনে বার করে আনছে। বুড়ো কাস্তে উঁচিয়ে তেড়ে গেল তাকে-চোখের মাথা খাক তোর বাপ— হারামজাদা-পরক্ষণেই তার মিঠে গলা-সাব যান না কেন— এই সামনেই খাল। বড় সোন্দর দেশ মোদের, দেখেন কেনে পিত্থিবি যেন সোনা ঢেলে দেছেন-আকাশ জমিনে ফারাক নেই— পা ঠুকে ঠুকে হাঁটবেন কিন্তু, জঙ্গল রাজ্যি ভগবানের জীবরা ঘোরে ফেরে-বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাসের গুছি দিয়ে দড়ি পাকিয়ে চলেছে তাই দেখছি — যাও সাব, যাও ভয় করোনি-সে তুমি মা মনসার নাম লিও।

ছেলেটি এতক্ষণে ডালখানাকে কেটে টুকরো করে কাঁধে তুলে নিল-ক্যাম্পে এসো না দাদু, ঘরের লোকদের অসুখ বিসুখ দেখিয়ে নাও-ডাক্তার বাবুরা ওষুধও দিবে। খোশ মেজাজে বুড়োকে সে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

কলেজে ঢুকে থেকে গ্রামের পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে আসা ডাক্তারদের জটলায় মুখে মুখে কত রোমহর্ষক কাহিনীই শুনেছি। যা থেকে এ ধারণা না হয়ে পারে না যে গ্রামের এসব নামকাওয়াস্তে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সব রাজনীতি ওয়ালাদের ভোটযন্ত্রের এক একটি ইস্ক্রুপ। গোরু-ছাগল তাদেরই খাতিরে ঘর দুয়ারের দখল পায়। ওয়ার্ডে কুকুর চরে বেড়ায়, ওষুধের বাড়ন্ত, সময়ে মাইনেও জোটে না-ওদিকে জনতা জাগ্রত, ভাঙচুর, বউ, ছেলেদের পর্যন্ত রেয়াৎ করে না —

পুলিশ মুখ দেখায়, তাদের হাত পা দেখা যায় না। ফন্দিবাজ রাজনীতিওয়ালাদের এমনি সব কীর্তি কলাপই এ গল্পের সারমর্ম। কোন শান্তিপ্রিয় নাগরিক আরাম, বিরাম, আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে ছুড়ে, চাঁদির হাতছানি কাটিয়ে অযথা ঝঞ্ঝাটে জড়াতে যাবে!

তবে কপালে থাকলে খণ্ডাবে কে? নীলেশদা.শনি গ্রহটি আমাকে অবশেষে সেই গ্রামের ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে ফেলল। কোন রকম ধানাই-পানাই দিয়ে এ লোকটাকে বাগে আনা গেল না। পালাব পালাব করেও এখান থেকে কই কাটতেও পারলাম না। মাকড়সা যেমন করে শিকার জড়িয়ে নেয় এই জালটিতে আমাকে তেমনি তেজ নিংড়ে নির্জীব করে ফেলেছে।

নামকরা জেলা স্কুল থেকে এসেছিলাম। হোস্টেলে থাকতে গিয়ে ফাইনাল ইয়ারের দাদারা পর্যন্ত ইয়ার দোস্ত। নতুন ছেলেদের অনেক বাধবাধ। মফঃস্বলের ছেলেরা আবার বেশি মুখচোরা। চাচা আপনপ্রাণ বাঁচার তাগিদে নীলেশদার ডানার আড়ালে ঢুকেছিলাম। সে যে অনেক কাজের কাজী সে জেনেছিলাম বহু পরে।

জেনেছিলাম নীলেশদা আঁতের মানুষ। মনের চাবিটি কখন যে তার হাতে খুলতে শুরু করেছে কেউ জানতেও পারে না। মেসে এসে নীলেশদা তোমার তক্তপোষে একবার গড়িয়ে যাবেই — পড়ে নেবে তোমার মুখের চোখের লেখা — নীলেশদার কাণ্ডকারখানা নিয়ে মন কষাকষিতে জড়িয়ে পড়ে বাকবিতণ্ডা হয়েছে, রাজনীতির শুঁড় ঢুকে পড়েছে — মারপিটও হয়েছে। ঠিকই নীলেশদার কথাবার্তায় আমরাও রাজনীতির গন্ধ পেয়েছি — তবু যেন মনে হয়েছে নীলেশদা যা বলতে চায় তাতে আমার কথাই যেন শোনা যায়। আমরাও নিজেদের মধ্যে নীলেশদাকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ কম করিনি — তবুও খুলতে পারিনি তার বাঁধন। এ মানুষটির হাতে কত যে ফুল ফুটতে পেরেছে, কত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়েছে, বুকে জোর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাসপাতালের বিছানায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে নীলেশদাকে চেয়ারে বসে ঢুলতে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম — কেন যে অমন কান্না পেল —

কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে করতে বললেন ভয় কিরে, আমরা আছি না — হয়েছে তো চিকেন পক্স, সাতদ্দিনে ভাল হয়ে যাবি —

তবুও চোখে জল —

বাড়িতে খবর দিয়েছ — শুধু টেনশনে থাকবেন — মার যে হার্টের অসুখ— কথা বলার জোর ছিল না আর, ফোঁপানিতে ঢাকা পড়ে গেছে —

এখনও মনে পড়লে চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। সামলানো যায় না।

নীলেশদাকে কি আমি ঠেকাতে পারি — তার বেগার পরোপকার নিয়ে, তার গোঁয়ার্তুমি নিয়ে, তার দূরঅভিসন্ধির তথ্য উদ্ধার নিয়ে যতো টিট্‌কিরিই দিই বুকের ভিতরে আর একটা মন মুখ ফিরিয়ে থাকে। সায় দেয় না। আর তাই আমাদের সব স্যাম্পেল ওষুধ নীলেশদার বাক্সেই জমা পড়ে — আমাদের কৃপণ আঙুল আপনি খুলে যায়। মনে করি, এমন মানুষের সব বোকামি যেন মানায়। আর আমাকে যদি বলে আই ক্যাম্পে তোকে ছাড়া আর কাকে নিয়ে যাই বল — আমি নিরুপায়।

চারপাশে কাঁটাভরা ঝোপ জঙ্গলে পথ না হারাই তাই ভাবছি — যে দিকে চোখ ফেরাই সব একাকার একই প্রতিচ্ছবি। লাল সিঁথির মতো পথটাই কোথায় হারিয়ে গেছে একটু একটু করে ঘাসের জঙ্গলে, অন্য গাছপালা সংখ্যায় বাড়ছে — এখনও দুচারটে পাতার পতাকা মাথায় মাটি আঁকড়ে উপুড় হয়ে রসটুকু টেনে টিকে আছে, মরণ তুচ্ছ করে তারই ফাঁকে দু-একটি লালটুকটুকে শীর্ণ ফুল ফুটে উঠেছে, কোথাও ঝরোঝরো গুচ্ছ ফুলের চমক। চোখ জোড়া বর্ণহীনতার মাঝে কি সমারোহ। গভীর বেদনার কেন্দ্রে এক বিন্দু সুখের কান্না। অভিভূত হয়ে, নিশ্চল হয়ে থাকলেই নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া যায় এদের সাথে — কখনও এমন এক হয়ে দেখা দেয়নি পায়ের নিচের মাটি, ঘাস, উপরের আকাশ, একসাথে বর্ণে গন্ধে সমগ্ররূপে। পা বাড়ালেই যেন তাল কেটে যাবে পাখিটার, লাল ফড়িং ডানা মুড়ে জঙ্গলে ডুব দেবে — ঘাসের মাঝের নীলফুলটি অলক্ষ্যে ঝরে পড়বে —

প্রকৃতির মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকৃতি হয়ে যাওয়াই সত্য।

তখন গাছ আপনি মাথার উপর সোনাঝুরি ফুল ঝরিয়ে দেয়, শিরিষ ফুলের পালক খসে যায়, ভেসে যায় — হালকা গন্ধে ভরিয়ে দেয়, পাতারা কপাল ছুঁয়ে কথা শোনাতে বসে, বুকের মাটিতে নতুন ঘাসের অঙ্কুর মুখ তোলে — সারা অঙ্গে পাতালের শীতলতা। তখন পাখিরা কুহক ডাক দিয়ে যায়, ফিঙেরা ডানা ছড়িয়ে নাচে, কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায় বকের সাবি—

তখন হয়তো বিষহরি বললে সাপেরাও ফনা নামিয়ে পথ বেয়ে দূরে চলে যায়, এক মুহূর্তে বিশ্বাসের জগৎ প্রাণ পেয়ে ওঠে। অন্ধকার ঝুপসি গাছের জটায় রাম নামের শব্দে স্তব্ধ হয়ে যায় অমঙ্গল। শব্দও তো প্রকৃতি।

বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের অন্ধ সেবক কুবেরের ভাণ্ডারে চিচিং ফাঁকের কোড আওড়াতে থাকলে, এ দেখার চোখে তো ধাঁধা লেগে যাবে। যে মানুষ অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির নিয়মে প্রকৃতির খেলার সাথী হয়ে চির সবুজ রয়ে গেল — সেই যে একদল

অনদৃত বালক এক অর্বাচীন বালিকা কাঁটা গাছের বোঝা মাথায় হাতে হাত ধরে সোনার প্রান্তর জুড়ে গান গেয়ে গেল। 'আমরা সবাই রাজা' — যেন প্রকৃতির আপন সন্তানেরা অচলায়তনের দরজা ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছে। যীশুর মতো কাঁটার মুকুট মাথায়। ওদের থাকাটা যেন এক অন্যরূপের থাকা। আছে বলেই সব কিছুতে এই যে প্রাণ উপছে পড়ছে— এতে তো মিথ্যা নেই, ছলনা নেই, বিকার নেই। আশ্চর্য — এরাই তো এখানকার প্রাণ — এখানের প্রকৃতির অন্তরের রূপ।

এমন বলেই তো ওরই হাত ধরে, কোমর জড়িয়ে পায়ে পায়ে ঘুরছে ওই ছেলেরা — ওযে দিদিমণি — জীবন দেখতে শেখায় ওদের। ওই গ্রাম্য মেয়ে বধুরা, পুরুষেরা কেমন অনায়াসে ওরই পাশে উনুন ধরাতে বসে, জলফুটিয়ে চা তৈরি করে — কেউ তো সন্ত্রস্ত হয়ে সরে যায় না — আমাকে দেখে যেমন সাহেব বলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার ভাবনায় যখন তখন যে ওই মেয়েটা এসে পড়ছে — এ আমি বেশ বুঝতে পারি। সারাবেলা তারই সংস্পর্শে থাকি - অন্য কারও কাছে হয়তো অভিনব কিছু নয় — কিন্তু আমার কাছে সে পরম বিস্ময়। নারীর যে রূপে পুরুষের হৃদয়ে উন্মাদনা উত্তাল হয়ে ওঠে, রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়— আত্মহারা হয়ে যায় — সেই শারীরী রূপের মাধুর্য তার কতটা আছে তার মুখে তাকিয়ে সে বিচার মনেই আসে না। তাকে ঘিরে যেন সত্তার গভীরে এক অতল অনুভূতি উৎসারিত হয়ে চলেছে সে তো না মেনে উপায় নেই। মনে হয় একটি স্ফুলিঙ্গ, অসীম শূন্যতায় একটি মাত্র জোনাকী হাতের বাঁধনে চিরতরে নিভে যাবে। তারই অনাবিল দীপ্তি আমার নিভৃত অন্তর্লোক আলো করে দিয়েছে।

সহসা চারপাশের প্রকৃতি যেন চাপা গলায় কথা কয়ে উঠলো। ঘাসের বনে ঢেউ উঠলো, মুহূর্তের মধ্যে ঝরা পাতায় ছেয়ে গেল বাতাস। পাখ পাখালির ডানার ঝাপটায় আর্ত ডাকাডাকিতে স্তব্ধ বনভূমি সচকিত হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে মেঘ ছুটে এলো ঝড় মাথায় করে। চড় বড় করে দু-চারটে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরে পড়লো। মেঘের ভারী পর্দা দুফালা করে ভয়ঙ্কর শব্দে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলার মাঝখানে নিজেকে এতো অকিঞ্চিৎকর মনে হলো। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। দুরন্ত হাওয়ার বেগ কাটিয়ে পড়তে পড়তে, গাছপালার এলোপাথাড়ি দাপাদাপি থেকে কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ঝড়জলে কাহিল কোনমতে ক্যাম্পে পা রাখলাম। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা আর হলো না। চারিদিকে ঝম ঝম অঝোর ধারা, টিনের চালের উপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাতাস।

বারান্দায় মাথা বাঁচাবার ঠাঁই নেই। জল থই থই ঘরের ভিতরেও। কোথায় স্যুটকেশ, কোথায় শুকনো কাপড় চোপড়, তোয়ালের হদিস পর্যন্ত নেই। খুঁজিই বা কোথায়, বলিই বা কাকে — সবাই ছুটছে পাগলের মতো — কেউ বেঞ্চি বয়ে আনছে, কেউ ডিসপেনসারি খালি করে ওষুধের বাক্স, শিশি, বোতল যাবতীয় জিনিস একটি একটি করে খুঁটে তুলে আনছে সেই একখানা ঘরে। ভিজে চুপচুপে। আউটডোর, রোগীদের টানতে টানতে সেখানেই ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এমনিতে অন্ধকার,

আলোও জ্বালা যাচ্ছে না— বড় বড় তালপাতা, কচু পাতা ফুটো টিনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক একটু সামাল দেবার চেষ্টা হচ্ছে — রসুইখানার ত্রিপলের বাঁধা ছাদা খুলে তোলা হবে বারান্দায়। কুচোকাচাগুলো যে কত কাজের, কত প্রয়োজন যে তারা মেটায় আজ সেটা দেখলাম। ওদের ছুটোছুটির বিরাম নেই, জলে ভিজে, মাটিতে আছাড় খেয়ে, অন্ধকার হাতড়ে হাতে গায়ে কাটা ছেঁড়া নিয়ে কলকল হাসি ছড়িয়ে বাঁদর সেনারা ঝড়ের সাথে লড়াই করছে। শুধু বিমুঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি একা আমি।

ডাক্তার সাহেব এয়েছেন গ' — চোখ পড়েছে এতক্ষণে তার ওপর। কোন প্রান্ত থেকে নীলেশদা চেঁচিয়ে উঠল — ফিরেছে — ওরে ও কুট্টি, শিগ্‌গির কাপড়জামা এনে দে — মাথাটা শুকনো করে মোছ — মাথায় অফিসের ট্রাঙ্ক নিয়ে ভিজে উঠোন দিযে টলতে টলতে এগোচ্ছে নীলেশদা প্লাস্টিকের চোঙ্গা পরা হারিকেনের আলোর সাথে। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালাম — খোলা মাঠে ঝড় — বাপরে বাপ্ — খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতেই দেয় না — এখন আর বুকের ভেতরে সে আতঙ্কের রেশ নেই।

ট্রাঙ্কটা সাবধানে নামানো হলো। দুহাত ঘষতে ঘষতে নীলেশদা হাসল — 'জয় হনুমানজী' বলে চেঁচালে পারতিস —

তা চেঁচালে যে হনুমানজী এসে পড়তো না কে বলতে পারে, তিনিও প্রাণের দায়ে আমার সাহায্য চাইতেন হয়তো। হাসির রোল উঠল।

সে রাত্রে দেখলাম নীলেশদাকে আর একবার, অথবা এও বলা যায় ক্যাম্পের মূল বন্ধনটি। সকলকে ভিজে কাপড় ছাড়ানো, মাথা মোছানো নিজে বসে আদা, তেজপাতার চা বানিয়ে সবাইকে খাওয়ানো। আর সেই মেয়েটিকে নিয়ে যা করলো সত্যিই বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত।

মুকলিকে ধর, ওকে নিয়ে আয়তো আমার সামনে — কখন বলেছি তোকে জামা কাপড় ছেড়ে মাথা মুছে ফেল— প্ল্যাস্টিকের ব্যাগটা যে মাথায় পরিয়ে দিলাম — গেল কোথায় — রাগে আগুন নীলেশদা।

পরেছি তো — ঝড়ে উড়ে গেলে কি করবো — ততোধিক তীক্ষ্ণ জবাব মুক্‌লির। সবাই ছুটবে, জল ঝাপাতে আর আমি পটের বিবি হয়ে বসে থাকব—

বেশ, চুলের জঞ্জাল নিয়ে যদি জ্বরে পড়িস তো সবার বড় উপকার হবে —

তোর জন্যে ক্যাম্প গুটিয়ে কেটে পড়ব—

ইস্, দেখব-কেমন যাও—

এরপর দেখেছিলাম সত্যিকারের সমস্যাটা।

মুকলির চুল খোলার পর — নিগ্রোদের মত জমাট ঘন চুল তোয়ালেতে তার জল টানবে কি করে। কুচো কাচাগুলো সেই চুল গোছা গোছা ধরে তোয়ালেতে ঘষছে — বুড়ো দাদু পর্যন্ত এসে বসেছে, চিরুণ দেও-দেখি-ও কর্তাবাবুরা দেখ না - উনুনের আঁচ হাঁড়ি করে খানিক তুলে নে এস দেখি -- কোথা চিরুনি আপা চুল বেঁধে আসে আর বাড়ি গিয়ে খুলবে —

ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকনো হতো কালিদাসের কালে একালেও দেখলাম বুড়ো মুকলির চুলের গোছা মাতৃস্নেহে শুকিয়ে তুলছে।

কারও কিছু না হলেও মুকলির জ্বর হলো। আগাম ওষুধ খাইয়েও রোখা গেল না। আমিও খানিক বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। উঠে পড়লাম দু'দিনেই। সে রাতে কে কোথায় কাত হয়েছিলাম কে জানে— অনেক রাতে পিঠের নিচে নরম একটা লম্বামতো কি বরফ শীতল আঁতকে উঠে চেঁচাতে গিয়েও থমকে গেলাম — গরম নিঃশ্বাস পড়লো মুখের ওপর-মৃদু কাতর শব্দ-তখনি জানি জ্বর এসেছে মুকলির। সরে এসে নীলেশদার পাশ ঘেঁষে শুলাম।

সে রাতে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হলো।

ক্যাম্পে বেশ রোগী এসেছিল। বুড়ো দাদুকে দেখতে এলো, দামামার ডাক পড়ার মতো। বংশ পরম্পরার খাতিরে গ্রাম থেকে গ্রামে যে জেনেছে সেই এসেছে — চোখ কাটলে আবার চোখে দেখা যায়। যতো লোক দেখতে এসেছে বুড়ো সবাইকে চিনে নিয়েছে। বুড়োকে তাই বেশিদিনই রাখতে হলো — তাছাড়া মুকলির অসুখ— বুড়ো তাকে ফেলে যেতেও চায় না। সাতদিনের ক্যাম্প দশদিন হয়ে গেল।

মুক্‌লি ভূগলো একটু বেশি। বড় অবাধ্য। নীলেশদা রাগ করে ওকে বাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল।

সেই নির্লজ্জ ব্যাপারের পর নীলেশদা আমায় ছেড়ে দেবে এমন আমি মনেও করিনি। এদের এত কষ্টের ক্যাম্প আমার দুর্বুদ্ধিতে যে পণ্ড হয়ে যায়নি সেই রক্ষে। এতোগুলো মানুষ, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের অসীম উদ্দীপনা আমার বেয়াদবিকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে।

তারই মধ্যে আমাকে নিয়ে পড়ল, মনে হয়, ইচ্ছে করেই — এই শেখর — আলাপ হল এদের সাথে, সকালের প্রথম চায়ের গ্লাস হাতে তুলে দিয়ে। বনে জঙ্গলেই ঘুরছিস, এদের মাঝে এসেছিস, এদেরই যদি না জানিস তো সবাইকে গিয়ে বলবি কি — এই যে দেখছিস— চন্দু, শিব, কুড়োরাম, অর্জুন, ওরে আয় তোরা, — সাহেবের সাথে আলাপ কর— আর ওই যে চা বানাচ্ছে গামছা কাঁধে — ওই ওদের মাস্টার। যা তা নয়, বিজ্ঞানের মাস্টার — এ দিক্‌কারই ছেলে — হাসপাতালে আলাপ। ওর জন্যেই তো এদিকে আসা। কি বলছিলি যেন তুই সেদিন — গাঁয়ের গরিব বোকা লোকদের ঠকিয়ে নাম কিনতে এসেছি — এই সুন্দর মাস্টার কিন্তু সত্যিকারের ওঝার ছেলে— সাপের ওঝা নয় — গুনিন— সে তো আবার তুই জানিস নে বোধহয়— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি — কারও দিকে না তাকিয়েই সবার মুখের চাপা হাসি অনুভব করতে পারছি — প্লাস্টিকের চায়ের গ্লাস — গরমে আঙুল পুড়ছে-পকেট থেকে রুমাল বার করতে হাত সরছে না। ধরণী দ্বিধা হলেও আমার কোন উপকারে লাগত না —

আলাপ করতে যে হৃদয়ের উষ্ণতা লাগে, নিজেকে মেলে ধরতে হয়, সে তো শেখা নেই। বনের সুবিধে সেখানে— সে যে আপনাকেই মেলে ধরে আছে।

ফিরে যাব কলকাতায় এবার শুরু হবে নতুন করে পুরনো বৃত্তে আবর্তনের কসরত। ট্রেনের কামরায় বিবর্ণ মুখে বসেছিল মুকলি। দিন কয়েকের জ্বরে তাকে অনেকখানি নিস্তেজ করে ফেলেছে। আমার মন এখন কলকাতার রঙ-এ রঙ বোলাচ্ছে। সেখানে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে আমার 'হরিবল্' অভিজ্ঞতার কৌতুক কাহিনী উপভোগের জন্য। রিঙ্কি এতোক্ষণে ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে বসে আছে। বড় সুন্দর করে হাসে রিঙ্কি — সে হাসিতে সর্বাঙ্গে তরঙ্গ তোলে। সে যখন শুনবে সাঁতার না জেনেও এক হাঁটু জলে নেবে কেমন করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডুব দিয়েছি। সর্বসমক্ষে, বিশেষত মহিলা সমক্ষে তোয়ালে জড়িয়ে বেশ বদলও করেছি, আর প্রকৃতি দাবি মেটানোর কথা, ডাক্তার হলেও সেসব অভব্য তথ্য সঙ্কেতে সারতে হবে এতোটা তার সহ্য হবে না। এইসব এক একটি কথার পরে পরে যেসব সরস মন্তব্য, বাহবা হাততালি পড়বে। --- তা যতটা আমার সংবর্ধনা তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকারান্তরে কাপুরুষতাব ধিক্কার। তাদেব আফসোস মাথামোটার মতো ধান্দাবাজদের খপ্পরে পড়ে আখেরে না সর্বনাশ হয়।

আমার মা তো ঈশ্বরের কাছে বহুত কৃতজ্ঞতা জানাবেন ছেলে তাঁর ঘাটে আঘাটায নোংরা অস্বাস্থ্যকর খাবার দাবার খেয়েও প্রাণ নিয়ে ফিরেছে তার জন্য।

আর থাকে মুকলির কথা, তার ওইসব বিটলে চেলাদের কথা। এদের মাঝখানে সে ছবিটা বড্ড ম্যাড়মেড়ে আর বেমানান হবে।

জীবনের যে আরও একটা মুখ আছে, নীলেশদার হাত ধরে তাই তো জানলাম। চারদিকে গণ্ডী টেনে, শুধুই নিজেকে লালন করতে করতে গোটা পৃথিবীটা আমাদের বাইরে পড়ে থাকে -- সেখানে মাটির মতোই সঞ্চিত রস, যে রসদে পূর্ণ হয়ে ওঠে জীবন — চোখ সেই গভীরে পৌঁছয় না। মনের আড়ালের সেই ছবিটা উলটে ধরে দেখিয়ে দিল নীলেশদা। বললো, কতটা নিয়ে কতটা দিলি বলতো — বাব-মা যা দিলেন তারই প্রতিদান দিতে পারিস না— পৃথিবী কি দিল তার ঋণ হিসাব করতে বসলো তো —

নাম ভূমিকা

মৈত্রেয়ীকে নিয়ে আমরা সবাই বড় দুর্ভাবনার মধ্যে আছি। মাইনের খাতাটা সেই তৈরি করে রখে। এর মধ্যে যদি না আসে, কার ঘাড়ে যে এসে পড়বে। শয্যাশায়ী মাকে রেখে সে আপিস করছিল। স্তনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এই সেদিন আমরা জেনেছি অভিনেত্রী উত্তরা দেবী ওর মা। সদ্য মুক্তি পেয়েছে তার 'সোনা কাকিমা'। ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের যিনি গোপনে সাহায্য করে গেছেন — কোন একটি সূত্র ধরে পুলিস তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, শুধু সন্দেহের বশে তাঁকে জেলে নিয়ে যায়। স্বাধীন দেশে শেষ জীবনে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধাশ্রমের দোর গোড়ায়। অনাদৃত, অবজ্ঞাত। এ বই অ্যাওয়ার্ড না পেয়ে পারে!

আমরা যখন উত্তরা দেবীর অভিনয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত, পাগলের মত তাঁর অভিনয় দেখতে যাবার জন্য ফন্দিফিকির করে ছুটি নিয়েছি —সে সব গল্প করি, মুগ্ধতায় আপ্লুত হতে থাকি — মৈত্রেয়ীকে কোনদিন কোন মন্তব্য করতে শুনিনি, এমন কি এসব আলোচনার ধারে কাছেও সে থাকেনি। উত্তরা দেবীর কোন অভিনয় সে নাকি দেখেনি। না স্টেজে, না সিনেমায়। আমরা শুনেছি ওদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ অল্পবয়সী মেয়েদের সিনেমা থিয়েটার দেখা পছন্দ করেন না। নিজের সম্পর্কে সে কিছু বলে না কোনদিন। আসলে সেকথাই বলে কম, আবেগ উচ্ছ্বাসও দেখিনি। উত্তরা দেবী যে তার মা তখন সেকথা কেউ জানতামও না। তার সামনেই অভিনেত্রী মায়ের নামে সরস সব জল্পনায় কানাকানি হাসাহাসি করেছি — এখন মনে হলে সঙ্কোচে মরে যাই।

মেয়েটা আবার শুকনো মুখে আমার আশেপাশেই ঘুর ঘুর করে, আমাকেই এসে বলে — আজ দুটি ভাত খাওয়াতে পেরেছি মাকে। বলে, কত কষ্ট নিয়ে ঝুলে থাকা ছবিগুলি শেষ করতে ফ্লোরে গিয়েছেন। কারো কথা শুনছেন না। মা বললেন, অ্যানা প্যাভলোভার কথা। রাশিয়ার কিংবদন্তী ব্যালেরিনার কথা — মহৎ শিল্পীর জীবন— সিনেমাটা দেখে থাকলে বুঝতিস — শিল্পী জীবনের সাধনা কি —

কতকাজ অফিসের — শুনবো কখন — ছবি সরে যায় — টেবিলে টেবিলে পালা পড়ে যায় কলম ঘষার।

আবার একদিন নিজেই বলি-কেমন রে তোর মা-বলে, চোখে আজকাল আলো সয় না গো বন্দনাদি, ভারী পর্দায় ঘর আঁধার করে রাখি-আলোর দীপ্ত বলয়ে দাঁড়িয়েছেন এতকাল-এখন আলোকে বিদায় দিয়ে দিচ্ছেন। শুকনো পাতার মত কেঁপে ওঠে ঠোঁটের রেখা, ভারী চোখের পাতা ঘেঁষে জল। বড় মিষ্টি বড় কোমল মেয়ে মৈত্রেয়ী — অভিনেত্রী মায়ের পরিত্যক্তা মেয়ে ওকে নিয়ে গোটা অফিসে ঔৎসুক্যের সীমা নেই। শান্ত, সংযত স্বল্পভাষী মেয়েটির সাথে অনায়াসে খোশগল্পে জমে ওঠাও যায় না।

অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংশানে ইনস্টিটিউট হলে উত্তরা দেবীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল বছর দুই তিন আগে। বোধহয় মৈত্রেয়ী তখনই অফিসে ঢুকেছে। ও এসেছিল অফিসেব ফাংশানে। আমরা অভিনয় করেছিলাম-মানে অফিস কর্মীদের নাটক। পুরনোরা বলেন, এই অফিস নাটকে একসময়ে তিনি অভিনয় করে গেছেন। উদগ্রীব হয়েছিলাম আমরা। অভিনয় যেন কিছু প্রক্রিয়া নয়, জীবনযাপনেরই প্রত্যক্ষ ছবি-এ আমরা দেখেছি, জেনেছি— কিন্তু তাঁর অভিনয়ে বুঝি আরও কিছু পাওয়া যেত — প্রত্যহকে অতিক্রম করে এক চিরন্তনে পৌঁছে যাওয়া। প্রতিদিনের দেখাশোনা সামান্য মানুষ, জীবনের সন্ধিক্ষণে কোন উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারে।

নাটকের এক একটি চরিত্রে কত কথাই বলার থাকে— শুধু একটি ভাব নয়-বহুপার্শ্বিক প্রতিটি চরিত্রের সাথে সেই চরিত্রের বিবিধ বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণই তো অভিনয়। একটি হীরকখণ্ডের নানান তলে ঠিকরে আসা বহুমাত্রিক আলোর রেখা— সিন্টিলেটিং এফেক্ট। সখীর দৃশ্যের এক অতি নগণ্য নারী চরিত্রে-নিজেকে সেই ছিলেকাটা হীরের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তুলে "শ্রীমতী" হয়ে উঠতে তিনিই পারেন। আমরা বাক্যহারা হয়ে যাই।

কোন ভূমিকা তাঁকে মানায় না-যেখানে যেমন দেখেছি এমন বুঝি আর হয় না-প্রণয়াভিসারিকা থেকে এক দীন দরিদ্র মাতা মেরী, ছোট বড় কত চরিত্র। সেই মেছুনির ভূমিকা মাথায় কাঁকালে মাছের ঝুড়ি, পায়ে মোটা বাঁকা মল-শরীর দুলিয়ে দেমাকি চলন। আর সেই ঝগড়া-হাত মুখ নেড়ে শরীরের প্রতি প্রত্যঙ্গের নির্মম ভাবাভিব্যক্তি —

আবার সেই, দিনগত অভ্যাসের বসে এক নিরাশ্বাস, বিষাদ ক্লান্ত গৃহবধূ-বিশাল টানা বারান্দায় ন্যাতা টেনে টেনে মুছেই চলেছেন, প্রতি দাগে দাগে তার মিশে যাচ্ছে কত অভিমানের তপ্ত নিঃশ্বাস, কত মর্মবেদনা কত অশ্রুপাত। কোথা থেকে উল্লাসের হল্লা উঠছে-স্তব্ধ বাড়িটা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে, ঝনঝন বেজে উঠছে সার্সি, ঝাড়বাতি, দরজা জানলার রঙিন কাচ। কেঁপে যাচ্ছে হাত, ম্লান হয়ে যাচ্ছে নিষ্প্রাণ মুখ।

সকলের পাশে বসে চিত্রাভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠত্বর পুরস্কার, তাঁর সংবর্ধনা দেখলো

মৈত্রেয়ী। কি ভাল লেগেছিল তাঁকে। একেবারে সাধারণের মত ঘরোয়াভাবে বসেছিলেন এককালের সহ অভিনেতাদের সাথে। যাদের কেউ কেউ এখন রিটায়ার করে গেছেন। এই মঞ্চে তাদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আজকের অভিনয়ে তাঁরাও আছেন আমাদের সাথে।

মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন, সাদা খোলের তসর কটকি পাড়-কপালে ছোট্ট খয়েরি টিপ, সুচিস্মিতা সুন্দর। মালা হাতে তরুণীটিকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন — চিরন্তনী জননী।

তাঁর সেদিনের ছোট্ট ভাষণটি—ভুলে যাব না কোনদিন। বুকের কোনখানে গিয়ে যে ধাক্কা দিয়েছিল বলতে পারবো না — বললেন, অভিনেত্রীরাও মেয়ে-আপনাদেরই একজন। বাইরের জগৎ রঙচঙ-এ রাঙিয়ে তাকে যতই চটকদারি করে তুলুক-মঞ্চে, পর্দায় সে তো এসে দাঁড়ায় আপনারই মতন এক নারী রূপে। জননী, জায়া, কন্যা, সখি। সমাজ তাকে যেখানে স্থান দিয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে সে ব্যথায় কাতর হয়, ক্ষোভে যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়, সুখ-দুঃখের দোলায় হাঁসে কাঁদে। অভিনয় তো সেই অনুভূতিই জাগিয়ে তোলা, আমিই সেই দুঃখী, গৃহস্থ ঘরের অনাদারের এক অপচ্ছায়া। আবার আমিই মহিমাময়ী, চিরন্তনী। এই সব মুখগুলিই আমার মুখ। চরিত্র যতই বিচিত্র হোক-অন্তরে তো সেই চিরজাগ্রত, মমতাময়ী। আপনার মতো আমিও পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার ছোপ নিয়ে জন্মেছি। অবিরত তাড়নার মধ্যে বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি তারপর যেদিন সেই প্রশ্ন এলো আত্মবিসর্জন না প্রতিষ্ঠা, নিজেকে সকলের ইচ্ছের মধ্যে বিলিয়ে দেব, না কি স্বতন্ত্র হয়ে উঠে দাঁড়াবো। সব মেয়ের মত আমাকেও যুঝতে হলো-এক কঠিন যুদ্ধ। কাউকে কি আর কেউ পথ ছেড়ে দেয়, আমাদের মেয়েদের পথ তো আরও দুরূহ।

মঞ্চে যে এসে পড়লাম সে এক শুভগ্রহই। সেই ভয়ঙ্কর সময় যারা সয়েছেন তারাই জানেন-কিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে-সব কিছু। আমি আমার মুখই দেখতে পাই-আমাকেই বারবার আয়নায় দেখাই আপনাদের-আমিই আপনি হয়ে উঠি। সত্যি, আর কোন কৃতিত্ব নেই আমার। একটা সত্য পৌঁছতে চেয়েছি কেবল।

হাততালি দিতে ভুলে গেলাম। এমন ভাষণ আর শুনিনি। শুনতে শুনতে কত টুকরো টুকরো দৃশ্য মনের পর্দায় দ্রুত ছায়া ফেলে চলে যেতে লাগলো। দু'চার কথা দিয়ে কত কথাই বলে গেলেন। আলোচনা করেছি-মৈত্রেয়ীর সামনেই-কত ব্যাখ্যাও করেছি- মুগ্ধতা মিশিয়ে।

সংবাদপত্রের 'খাসবাতে'র পাতা পড়ে সকলেই জানে উত্তরা দেবীর স্বামী আছে, একটি মেয়েও আছে। সন্তানকে তিনি পাননি। না, কি চান-নি এমনই শোনা যায়। বিবাহিত জীবন তাঁর শ্রেয় হয়ে ওঠেনি, অনেক রটনা, অনেক শাখা-প্রশাখা। পাদপ্রদীপের রোশনাই-এর জগতে এমন সব মিঠে কড়া রিপু উসকানো অপলাপ চড়া দামে বিকোয়। মানুষ তাতেই মাতে।

হয়তো, কন্যা সন্তান বলেই মায়ের চেয়ে পিতার গৃহই তার নিরুদ্বেগ আশ্রয় মনে

করেছেন। মেয়ে কি কোনদিন বুঝবে তাঁকে। সে তো তাঁর চোখে জল দেখেনি। সন্তানের জন্য শূন্য হৃদয়ের আকুতি অনুভব করেনি। তার শিশু মনে স্থায়ী হয়ে আছে-মায়ের বিলাস, মায়ের সদা অনুপস্থিতি, অজানা অচেনা জগতে চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়া। সে কি সত্যের মুখোমুখি কোনদিন হবে, যখন সে বড় হবে, যখন দুনিয়া চিনতে শিখবে!

সন্তানের জন্যে মায়ের যে কাঙালপনা-মায়ের ভূমিকায় কত রূপে অমল ধারায় ঝরে পড়ছে, সব মুছে গেলেও অভাগী মায়ের বেদনা সত্য হয়ে থাক বে তাঁর অভিনয়ে।

সবাই জানি মৈত্রেয়ীর বিয়ের কথা হচ্ছে। ওর অমন স্নিগ্ধ মিষ্টি চেহারা, অমন মায়াভরা দুটি চোখ, কেউ যে অপছন্দ করতে পারে বিশ্বাস হতে চায় না। তবু সে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে—

ওর থুতনিতে আঙুল রেখে বলি, কাকে মনে ধরে বল— আমরাই যাব তোর বাবার কাছে—

আঃ বন্দনাদি, কিচ্ছু শুনছি না আমি-কানে আঙুল দিয়ে টেবিলে মুখ লুকিয়ে ফেলে মৈত্রেয়ী। বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওর রুক্ষ হয়ে আসা কণ্ঠস্বরে আমরা অপ্রস্তুত।

একবার শুনলাম মৈত্রেয়ীর বাবা নাকি চাইছে মেয়ে চাকরি ছেড়ে দিক। একটি অতি সুপাত্র না হলে হাতছাড়া হতে বসেছে।— চাকরি করতে এলিই বা কেন-কিসের অভাব তোর-

মন চাইলে-মানুষের অভাব কি কেবল টাকা পয়সার-বা কোনদিন চায় আমি চাকরি করি-কবে থেকে পিছনে লেগে রয়েছে-

তাহলে—

তাহলে কি — টাকা তো আর ফেলা যায় না—

'ঠিকই তো, টাকা তার ওপর আর কি কথা'—

নিজের কথাই ধরি যদি বিয়ের পর চাকরি ছাড়ার চাপ কই মেনে তোই নিইনি। অন্যের বেলায় কেমন বিপরীত খাতে বয়ে গেল আমার ভাবনা। কি আমাদের মন — আশ্চর্য।

আমি যখন চাকরি পেলাম, স্কুল ফাইনাল পাস করেছি সবে। আমিই বাবার প্রথম সন্তান। কলেজে পড়বো নেচে উঠেছিল মন। বাবার হাত ধরে তার বদলে অফিসে এসে বসলাম। এক নিকট আত্মীয় সেদিন কত বড় উপকার করেছিলেন-তিনিও জানতেন না। সংসারে সাশ্রয় চেয়েছিলেন বাবা। সে সময়ে শিকড়হীন সেইসব পরিবার ধীরে ধীরে কত মুকুলকে শুকিয়ে বিবর্ণ করে দিয়েছে। বার্ধক্যের দ্বারে এসে সেই একক নারীরা অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার শ্মশানে বসে সকলের সুখ শান্তির মুখে আজ আগুন ঝরা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন ফেলবে না! আজ সে সব কোরবানীর দিন ফুরিয়েছে-ফুরিয়েছে সবার কাছেই। অপরের জন্য সেই সব রক্ত নিঙড়ানো হৃদয়ের শেষ উপচার এখন নিরর্থক। অস্তিত্বের লড়াই ছিল যখন— যখন অর্থের বিনিময়ে

স্বপ্নের ঘর শূন্য হয়ে গেল-তখন তারাই পায়ের পাতা ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে বেঁধে দিয়েছিল-ঘরের বাইরে পা রাখার সাদা সড়ক। আজকের উদ্দাম মেয়েরা নমস্কার করুক তাদের।

"ঘর ছাড়া সব বাঙাল, ভাত কাপড়ের কাঙাল।" নিদারুণ পেটের জ্বালা, প্রাণের অধিক আপনজনের পাণ্ডুর অনাহারী মুখ। মরিয়া মেয়েদের আরও এক দরজায় পৌঁছে দিল। অভিনয়ে। সেখানে তো পাঁক, সেখানে দুর্গন্ধ। তবু মান-সম্মানের পরোয়া না করে, লোকলজ্জা, সমাজসংস্কার মাড়িয়ে তারা জ্বলন্ত পাঁকে ঝাঁপ দিল। কখনও সকরুণ অশ্রুমুখী, কখনও হাস্যে লাস্যে মনোহারিনী, আবার প্রতিবাদে, প্রত্যাঘাতে উজ্জ্বল হয়ে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ রেখে গেছে-ধুলোয় মিশিয়ে যায়নি।

এখনও পাড়ায়, অফিসে, বাড়িতে এই অভাগাদের দেখা কি মেলে না? আমার পিসিমণির মতো। বাবার দিদি। সংসারের হাঁ মুখ এদের জীবনের মণিকাগুলো চয়ন করে নিয়েছে। আজ না আছে তার মান, না আছে কোন হৃদয়ে তার জন্য একটুখানি উষ্ণতা। আদর করার কেউ নেই, কর্তব্য করারও কেউ নেই। উনি যে বড় খিটখিটে, বড় খুঁতখুঁতে। ফটফট কথায় কথা বলে বসেন। সব তেল ফুরনো প্রদীপের বুকের ধিকি ধিকি জ্বলা। তাঁর মনে হয়, বড় নীতিহীন, বড় মাত্রা ছাড়া, এদের নম্রতা শিক্ষা হয়নি। বয়সের দাবিও আছে তাঁর আবার। কারণে অকারণে নিজের স্বার্থত্যাগের উপাখ্যান গাইতে থাকেন।

এঁরা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেই বিশ্বযুদ্ধের কালে, সেই মন্বন্তরের বীভৎসতার মধ্যে। এখনও সেই অভাবী পরিবারের ফ্যাকাসে জীর্ণ মেয়েটি-মাইনের প্রথম টাকাটা এনে মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছে-তাকে ঘিরে অনেকগুলি আঙুল আঁকড়ে ধরে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতে ভুলে গেছে। থালায় গরম ভাতের গন্ধে চোখে জল এসেছে। তারপর কত অনায়াসে শুধু নিতে নিতে আর নিতে সবাই একদিন তাকে ভুলে গেল। মায়ের হাতে মাইনের সব কটি টাকা তুলে দিয়েও আর তেমন করে খুশির তুফান ওঠে না। একদিন কত মেঘ জমতে থাকলো তারাটিকে ঘিরে। সেই ঢলঢল কোমল কলিকাটি শুকিয়ে শ্রীহীন হয়ে গেল। সে তখন পথ হারিয়ে ফেলেছে। চারিদিকে তার স্বার্থের কাঁটা গাছ।

পিসিমণির মা বেঁচে থাকতেই তিনি আমাদের কাছে এলেন। বাবার আশ্রয়ে। দু'জনেই সমব্যথী। আমার মাকে তিনি এনেছিলেন এ বাড়িতে। চমৎকার বুঝতেন এঁরা পরস্পরকে। নিজেকে বোঝানো আর অপরকে বোঝা, এই তো সম্পর্ক। বাবা যখন মারা গেলেন, মা আঁকড়ে ধরেছিলেন পিসিমণিকে-কিছুতেই থাকলেন না তিনি। তখনও বাবার জেঠিমা, পিসিমণির মা বেঁচে। তবুও চলে গেলেন-দেওঘর-আনন্দময়ীর আশ্রমে। এই তো ছিল ঠিকানা তখনকার-বৃদ্ধাশ্রম ছিল না তো।

মাকে লিখতেন-মেয়েটার স্বপ্নগুলো কেড়ে নিস না চিন্ময়ী, ওকে বাঁচতে দিস

একটা আকাশ যেন থাকে ওর জন্যে। সব জানতেন তিনি, অন্যের আশ্রয়ে থাকার লজ্জা, অবমাননা —

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তাড়াহুড়ো করে। তারপর বাসের মধ্যে এক ঘন্টা। ট্রাফিক জ্যাম- ! না, লেক 'গার্ডেন্সে রেললাইন অবরোধ। লেভেল ক্রশিং জুড়ে বসে আছে-গাড়ি ঘোড়া অচল, ট্রেনও বন্ধ। মেয়ের স্কুলে পরীক্ষা, বাস থেকে নেমে হেঁটে উলটো দিকে এলাম-যদি ট্যাক্সি পাই-এগিয়ে চলেছি, তো চলেছি-লোকের মধ্যে দিয়ে-সব উলটো মুখো। যাত্রী বোঝাই-

প্রাণপাত করে মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে অফিসে এসেছি-তখনও ঘাম শুকোয়নি-মনটা বিতৃষ্ণায় তেতো হয়ে আছে।

মৈত্রেয়ী আমার টেবিলে এসে দাঁড়ালো। মুখ তুলে দেখার ফুরসুৎ নেই-আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি যাব দিদি, গলাটা কাঁপছে-চোখের পাতা ভিজে ভিজে—

কি হলো আবার, পল্লব বিরক্ত করেছে ফের-ওকে আমি সাসপেন্ড করিয়ে ছাড়বো—

না বন্দনাদি, আমার খুব দরকার-

কি ছিল ওর গলায়-বলতে পারবো না-আমার অন্যমনস্ক কানেও একটা গভীর জলের তোলপাড়ের মত লাগলো-

যাবি, আচ্ছা দাঁড়া-কি হয়েছে বলতো-আমি উঠে ওর পিঠে হাত রাখি-মনে হলো ও যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। কোনকিছু ওকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছে-এত ছটফট করছিস-একলা ছাড়তে যে ভয় করছে তোকে—

মুখ ফুটে একটি কথা বললো না-একলাই জেদ করে চলে গেল। মনে মনে কত কি ভাবছি-সবাই ভাবছে-এমন শান্ত নিরীহ মেয়েটির জীবনে কি ঘটে গেল-এত উতলা হয়ে ঘূর্ণির মুখে বেরিয়ে গেল।

খবরের কাগজে দেখলেও উত্তরা দেবীর অসুখের কথা আর মনে ছিল না। তাঁর অভিনয় নিয়ে যত গদগদই হই-মনের অন্তরালে তলিয়ে থাকা আবিলতা যখন তখন গুলিয়ে উঠতে থাকে। যার অকৃত্রিম শিল্প প্রতিভার কাছে আপনি হৃদয় নত হয়-তাকেই কচি শিশুটিকে ফেলে রেখে, ঘরের আশ্রয় হেলায় ত্যাগ করে মঞ্চের আলোয় দাঁড়াতে দেখে মন বিরূপ হয়, তাকে নির্মমভাবে দুষি। কোন স্তরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিচার করবো যে, কুয়াশা কাটে না। স্বামী সন্তান বিচ্ছিন্না নারী সমাজের বিষ নজর থেকে রেহাই পেয়ে যাবে! সমাজ যে আমরাও-স্বামী সন্তানের বেশি, একান্ত গৃহকোণের বেশি নারীর আরও কি চাই! নটীর জীবন কি এমনই মহার্ঘ-সবই কেমন খোলামেলা নির্লজ্জ নয়! সেদিন ভেবেছি-তাইতো গৃহত্যাগিনী নারীর কি পরিচয়? তার ওপর যে জীবন গ্ল্যামার জগতে নাম কিনেছে-প্রতিনিয়ত নিজেকে নানা বিভঙ্গে, হাসি কান্নায়, প্রণয় বিরহে, লাঞ্ছনায় যন্ত্রণায়, গর্বে গৌরবে রঙ-বেরঙ-এর পাপড়ি মেলার মূল্যে যে অর্থোপার্জন সেও বুঝি দেহপটের সাথে এক রকমের দেহ বিক্রয়ের তুল্য-শরীরের ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা বিক্রয়-ছায়াকে কায়ার মায়ায় ঢাকার কুশলতা বিক্রয়-

নিন্দা কি তাই—? একজন পুরুষ নটের সময় কি এত ঘোলা করে তোলা হয়, সমাজে যতখানি হেয় হয় এক নারী। ঘরের গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে যাবার খেসারত—

সকলে যখন বলছে এবার কলকাতায় তেমন বৃষ্টি আর হলো না-তখনই আবহাওয়া অফিসকে লজ্জা দিয়ে বিপুল মেঘের সঞ্চার হলো কলকাতার আকাশে। ক'দিন ধরে বিষ্টির বিরাম নেই। বৃষ্টি মাথায় করে অল্প কজনই এসে পৌছেছি অফিসে। জল ধরে যাবার বদলে আরও ঝেঁপে এল। বাদলের মেঘে আকাশ কালি হয়ে গেছে, আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঝড়ো হাওয়া এলোমেলা গর্জে বেড়াচ্ছে। মেঘের বুক ফালাফালা করে বিদ্যুতের ফণা ঝলসে যাচ্ছে সার্সি বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ধারায় চরাচর আড়াল হয়ে গেছে। ভাবনায় পড়ে গেছি ফিরবো কি করে। বাইরে এতক্ষণে নিশ্চয় বানভাসি দশা। মৈত্রেয়ী ফ্যাকাশে মুখে আমার গা ঘেঁষে বসে আছে।

সময় তো কাটাতে হবে। হাফ-ডে করে বেরিয়ে যাবোই বা কোথায়। ক্যান্টিন থেকে তেলেভাজা করিয়ে এনে আমরা আড্ডা জমিয়ে বসলাম। যা হয়, সিনেমা নাটক এসে পড়লো। পল্লব উত্তরা দেবীর গল্প ফেঁদে বসলো। ম্যাগাজিনের চুটকি নয়-নিজের দেখা উত্তরা দেবী। নাটকে ওর আগ্রহ আছে জানতাম-ও যে উত্তরা দেবীর টিমে অভিনয় করে অতশত জানতাম না। বলছিল-উত্তরা দেবীর স্বামী একনাথ অভিনয় করতেন-এখনও করেন পার্শ্ব ভূমিকায়। একদিন স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছিলেন। সন্তান কোলে এসেছে, সংসারের দাবি বাড়ছে। তখনও রিফিউজিরা গ্রাম ধরে আসছে। গ্রামের সম্পর্কও যে সম্পর্ক—এক আশ্রয়ে গাদাগাদি করে মাথা গোঁজা, শুধু প্রাণে বেঁচে থাকা, আর কিছু ভাবার নেই।

তারপর একনাথ একনাথই রয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী হয়ে উঠলেন আজকের উত্তরা দেবী-কিংবদন্তী—

এক বস্তিবাসীনী বধূর ভূমিকা-সন্তানকে ঘিরে তার প্রবল আসক্তি-স্বামীর কাছে কিছু যে প্রাপ্য থাকে-তাই সে বোঝেনি কোনদিন। পশু হয়ে ওঠা ছাড়া অন্যরূপে তাকে কোনদিন দেখেনি। কোলের সন্তানের খাদ্যটুকুও বাঁচে না তার গ্রাস থেকে। লুকিয়ে সে অন্যের ঘরে কাজ নিল-তার হাঁটতে শেখা শিশুকে সে খুঁজে পাচ্ছে না-কাজ থেকে ফিরে। মায়ের সে হৃদয় নিঙড়ানো যাতনা, অভিনয়ের অভিব্যক্তিতে কোন মাত্রায় তুলে নিয়ে গেলেন তিনি-দর্শক স্তব্ধ হয়ে রইলো-প্রতিষ্ঠা এলো তাঁর জীবনে।

উত্তরাদি বলেছেন-ও তো অভিনয় ছিল না। হাঁটতে শেখা শিশুকে আমিও ঘরে রেখে আসতাম-ওই মায়ের প্রাণটা আমারও প্রাণ যে। প্রথম দিনের অভিনয়ের পর সেই দুরু দুরু বুকে বাড়ি ফেরার কথা ভুলবো না কোনদিন। বাড়ির যত কাছে এগিয়ে আসছি, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—পা চলছে না-

নাম হতে একনাথ বাবু তাঁর সুশীলা পত্নীকে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহিলা অভিনেত্রী তখন সুলভ ছিল না। দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে বধূরা-দু এক পা করে এগিয়ে আসছে। সংসারে স্বাচ্ছল্য এনে ফেলেছেন একনাথ।

একনাথবাবু বেঁকে বসলেন-অন্য একটি জায়গায় অভিনয়ের ডাক পেয়ে। নাটক নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে-তাছাড়া এ অভিনয়ে টাকার আশা নেই।

আরে ছোঃ, ওই সব উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ছোকরার সাথে, না যাওয়া হবে না তোমার-

উচ্ছন্নে যাওয়া! তোমাদেরই ঘরের ছেলে-মেয়েরা সব-যাত্রা, সিনেমার প্রযোজক নয়- "গোর্কির মা" করবে ওরা-

মতলব ভালই ফেঁদেছে-তোমাকে ভাঙিয়ে নাম কিনবে আর কি- কাটিয়ে দাও, কাটিয়ে দাও- ওরা নাম কিনবে- তুমি চুষবে বুড়ো আমুল—বিশ্রি অঙ্গভঙ্গি করেন একনাথ-

অবাক হয়ে যান উত্তরা দেবী-কাদের কথা বলছো-বিমলদার নজরে না পড়লে-আমি কি এটুকুও পেতাম-ওঁরা আমাকে 'নীলদর্পণ' এ নিয়েছিলেন, তোমাকে স্টেজে তুলেছিলেন, সব ভুলে গেলে-

ও সব ফোতো কাপ্তানদের আমায় দেখিও না, থিয়েটারের কি বোঝ তুমি—বাতেলা মেরে-মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে তোমার—ধুরন্ধর সব—

ভেবে পাননি উত্তরা দেবী এ কথার কি উত্তর। যে উৎসাহ নিয়ে কথা শুরু করেছিলেন-সেটুকু ফুরিয়ে গেল—খাটুনি তো হবেই-কল পেলে বাইরে যাবো-সবাই চাইছে এ বই কলকাতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে নিয়ে যেতে-এরই মধ্যে ডাক আসছে-

না, কোথাও যাওয়া হবে না- ভাল করে শুনে রাখ, আমি মত দেবো না- ঘরে বাচ্চা রেখে, -ভেবেছো কি তুমি- গলা চড়িয়ে ও এমন প্রতাপ দেখাল-আমি ভড়কে গেলাম। তাহলে আমায় একটা সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হবে। এতদিনের সরল করে তোলা পথ-যে স্বাধীনতা নিজে অর্জন করেছি-তা কেউ কেড়ে নেবে কেন-

ক্ষতবিক্ষত উত্তপ্ত সময়ের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের লড়াই-পুলিশ, ঠ্যাঙাড়েরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে-এখানে লাঠি চলছে, ওখানে রক্ত ঝরছে-মানুষ দিশেহারা-একটা পথ খুঁজে মরছে-

দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, গরিব মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের থেকে এক ধাক্কায় শৈশবের গোষ্ঠ, যৌবনের বৃন্দাবন, বার্ধক্যের বারাণসী তার শান্ত গৃহ কোণ কেড়ে নিয়েছে-মুছে দিয়েছে অনেক মূল্যবোধ, ভেঙে দিয়েছে দেশমাতৃকার মূর্তি, জন্মভূমিই হারিয়ে গেছে। সেইসব হতাশ মানুষের চোখে আশার রোশনী জ্বালিয়ে দিতে সেদিন কতবড় ভূমিকা নিয়েছিল নাটক, সিনেমা—সেই ছিন্নমূল মানুষেরই প্রতিনিধি ছিল তারা, অন্ধ স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল-বাংলার বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিল নতুন বার্তা।

'নবান্ন' দেখে এসে কদিন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছি—বুকের মধ্যে কি যেন হয়ে যাচ্ছে-কিছু ভাল লাগছে না-এ অভিনয় করতে পারবো-

তারপরই 'গোর্কির' মা'তে অভিনয় করার কথা হলো অভিনয় যেন আমাকে টানতে লাগলো-অপরিচয় থেকে উঠে আসতে শুরু করেছি-ডাক-এসেছে-আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছো তো-

'মা'র ভূমিকায় কি অসাধারণ অভিনয় করলেন তপতীদি-নিজের কথা কোথায়-বার বার করে সেই কাহিনীই বলে গেলেন- উত্তরাদি। বিপ্লবের চেতনা ছাড়া কি এই ভূমিকায় কেউ সফল হতে পারে-তপতীদি তো গণনাট্যের মেয়ে-সে তোরা দেখতে পেলি না। না হলে শিখতে পারতিস বিপ্লবী আবেগ কাকে বলে-তার প্রকাশ কত সাবলাইম হয়ে উঠতে পারে—

দু'হাতে মাথা আঁকড়ে কতক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন-আমরা আর কতটুকু শিখলাম-গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন-এই গণনাট্যের মেয়েরা সকলের কাছে কি সম্মান পেয়েছেন-এঁরাই তো জাতে তুলে দিলেন আমাদের-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভ্রমবোধ রুচিশীলতা দিয়ে এঁরা আমাদের মালিন্য ধুয়ে মুছে দিলেন। এঁরা আমাদের নমস্য হয়ে রইলেন।

আর বন্দনাদি, শাসার ভূমিকায় উত্তরা দেবীর অভিনয়ও অনবদ্য হয়েছিল। যাঁরা দেখেছেন এ অভিনয় তাঁরাই বলেন-শান্ত সুশীল শাসা, সুন্দরী শাসা বিপ্লবী চেতনায় দৃঢ় প্যাভেলের প্রণয়ী। দুজনের কারো সাথে কারো দেখা নেই-একজন কারা অন্তরালে অন্যজন নীরবে বিপ্লবের কাজে নিবিষ্ট। তবু ভালবাসার দীপটি অনির্বাণ—

প্যাভেলের সাথে দেখা করে এলে, মায়ের কাছে খবর শুনতে বসে থাকে—আর তাঁরই চোখের মধ্যে দিয়ে দেখে প্যাভেলকে—এও নিশ্চয় খুব সহজ অভিনয় ছিল না, বলো-পল্লব বলে।

সূত্রপাত এখানেই হয়েছিল। একনাথের বাধা মানতে পারেননি। ডাক আসতে থাকলো। 'গোর্কির মা'-র বিপুল চাহিদা। ব্যাঘাত এলো। নতুন কনট্রাক্ট ছেড়ে দিতে হচ্ছে-হাতের কাজগুলো কেবলই অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। এদিকে নামও তো হচ্ছে। অভিনয় শেষে পাশে বসিয়ে তপতীদি বললেন-বিমলদা, এমন আনকোরা হীরের টুকরোটি কোথা পেলে-এ যে ঘষামাজা পড়লে-একেবারে জ্বালিয়ে দেবে-

একনাথ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে-এসব চ্যাঙড়ামি কতদিন চলবে-আমি জানতে চাই। বাড়াবাড়িটা একটু কম কর, দিন নেই, রাত নেই এভাবে—আমরা তো একটা সমাজে বাস করি—কি না—কথা শেষ না করেই দপদপিয়ে ঘুরে চলে গেল। গলা চড়িয়ে বললো, ঝাণ্ডা দিয়ে মাথার কাপড় হয় না-মনে রেখো-

উত্তরাদির কাছে বসে গল্প শুনতে এত ভাল লাগে-আমাদের দেখা চেনা অচেনা অতীতকে নতুন আলোয় চিনিয়ে দিতে পারেন তিনি-

পল্লব সেদিনই বললো-উত্তরাদিকে তো আমি বললাম, আপনার মেয়ে আমাদের অফিসে কাজ করে-

আমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে থেকে নরম করে বললেন-আমার মেয়েকে চিনিস-

সেদিন চেক নিয়ে গেলাম না ও বাড়ি-মৈত্রেয়ী আমাকে দেখেনি-আমি ওকে দেখেছিলাম-

মৈত্রেয়ী নাম-বা বেশ। আশ্চর্য এতটুকু ব্যাকুল হলেন না।

অফিস থেকে বেরিয়ে কি বিপদ, জলে জলময়। কোথায় গাড়ি ঘোড়া। একটা দুটো মোটরগাড়ি জলে আটকে আছে। জল থৈ থৈ শহরটাকে নিশ্চল সিনেমার পটের মত লাগছে। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে কি করি—সে তো আমার হাত শক্ত করে ধরে আছে—অধীর হয়ে পড়েছে—

পল্লব কোথা থেকে এসে বললো-চলো, সিনেমায় গিয়ে ঢুকি-জলটল নেমে গেলে-তারপর দেখা যাবে—

মৈত্রেয়ীর চোখে তখন জল গড়াচ্ছে—

সবাই হই হই করে সিনেমা হলে ঢুকলাম-হল ভরা লোক আমাদেরই দশা তাদেরও—

সারাক্ষণ কানের কাছে কেঁদেই চললো মৈত্রেয়ী।

ভয় কি, বাড়িতে কিচ্ছু বলবে না-আমি ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলি-বেশ তো আমি যাব তোর সঙ্গে। একটাই ট্যাক্সি। চেপেছি সকলে মিলে গাদাগাদি করে। মৈত্রেয়ীর বাড়ির কাছে এসে তো ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া যাবে না-দূর থেকে দেখা গেল দরজার বাইরে ওর বাবা-আমরা আর এগোইনি-ওকে সেখানে ছেড়েই ফিরলাম—।

মায়ের পরিচয় জানাজানি হয়ে যেতে হয়তো মৈত্রেয়ী সারাক্ষণ কাঠ হয়ে থাকে। সহজ হতে পারে না আমার কাছেও। নিজের চারপাশে দূরত্বের গণ্ডিটা আরও নিরন্ধ্র করে তুলছে। নরম নম্র মেয়েটি জ্বলে জ্বলে উঠছিল যখন তখন-বিনা কারণে।

একমাত্র পল্লবই ওকে কড়া হাতে সমঝে দিতে চেয়েছিল-দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মৈত্রেয়ীর মত মেয়ে ওকে চড় মেরে বসলো-

তোমার মা এতবড় একজন অভিনেত্রী-আর তুমি এত কুনো-পৃথিবীকে জীবনের একেবারে বাইরে ফেলে রেখেছো-জোর করে নিজেকে বঞ্চিত রাখার মধ্যে কোনই আহামরিত্ব নেই-পাথরের মত নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল মৈত্রেয়ী।

উৎসাহের আতিশয্যে তার হাত ধরে টেনেছিল পল্লব এসো তো আজ বাইরে টিফিন করে আসি—

ছুটতে ছুটতে নিজের টেবিলে এসে উপুড় হয়ে কি কান্না মেয়ের। আমরা তো হতবাক-উত্তরা দেবীর মেয়ে-উৎসুক অনেকেই পিছন পিছন আসছিল-সবাইকে আটকালাম।

মা অভিনেত্রী বলেই কি আমি সস্তা হয়ে গেছি - মৈত্রেয়ীর বুকের মধ্যে অসম্মানের জ্বালাটা তাকে হতচেতন করে দেয়-বাবা ঠিকই বলে-এখান থেকে না বেরুলে আমার নিষ্কৃতি নেই-এ তার চেতনায় নীলকেণ্ঠর মত মিশে যাওয়া বিষ। নিষেধের যে বাঁধ বাঁধা হয়েছিল শিশুমনে, তারই পরিণাম। হয়তো এজন্যেই মায়ের

পরিচয় দিতে তার নিগূঢ় লজ্জা। হয়তো এজন্যে মা যে তার কত বড় অভিনেত্রী সে তা কোনদিন জানতেও চায়নি।

উত্তরা দেবী একটা বিশেষ সময়কালের নাম। ছিন্নমূল, নতুন ইহুদী, একটু আচ্ছাদনের লড়াই, উদরান্নের লড়াই-এলা অতনুর বিপন্নতা, ছেঁড়া তার, সন্দীপের আত্মসর্বস্ব দেশসেবকের উর্ণাজালে মক্ষীরাণী বিমলা, এ কাহিনী শুধু নয়, এ ছবি, একটা সময়ের ছবি, এরই পাশে চট্টগ্রামে নিঃশঙ্ক আত্মবলিদান। ফাঁসি-গুলি, জালিয়ানওযালাবাগ, রবীন্দ্রনাথ।

তিনি তো 'মাদার কারেজ'। জীবন সচল — কোনকিছুই জীবনের পথরোধ করে দাঁড়ায় না —শ্রেষ্ঠ শিল্পের এই তো শাশ্বত বাণী। মৈত্রেয়ীরা এ সময়কে চিনবে কি করে! ওরা দেখে একে বায়েস্কোপওয়ালার টিনের বাক্সে চোখ রেখে — তীক্ষ্ণ সুরে বেজে যায় চলতি সিনেমার গান। হ্যান্ডেল-ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকটা হাঁকে-মনুমেন্ট দেখ, হাওড়া ব্রিজ দেখ, রাজা রানী দেখ, গভর্নর কা কোঠি দেখ, কৃত্রিম আলোয় রঙ চঙ-এ কিছু ছবি সরে যেতে থাকে-ওরা সে সব দেখে-নিরাসক্ত কৌতুকে।

আমাদের পরে আর কে থাকবে, কেই বা মনে রাখবে —

সেই সব জীবন্ত ছবি, সেই ফেলে আসা বড় আপন ঘর দুয়ার, সেই আমতলা, জামতলা, বটগাছ, নদীর ধার, বকুল অশোকের ফুল ফোটা-কোন গাছকে কে কবে লাগিয়ে গেছেন-সেই সব কথকতা-সেই গাছের গায়ে আপনজনের স্পর্শ-সেই আমসত্ত্ব কুলের আচার-পিঠে পুলি কিছু থাকবে না-কোন স্মৃতি মেদুরতায় কখনও মন ভারী হবে না-মাঠে ঘাটে হারিয়ে আসা-সখা সখিদের জন্য।

মায়ের অভিনয় গৌরব তাকে স্পর্শ করবে কোনখানে-তারা তো আর 'ভাত কাপড়ের কাঙাল' নেই-মার কথা শুধুই অশুচি, অশুভ উচ্চারণ, গভীর লজ্জা, পাপ —

পল্লবের কথায় সেই পাপের ছবি ফুটেছে তার চোখে-মৈত্রেয়ীর সেদিন যেরকম উগ্র মূর্তিতে ছুটে বেরিয়ে গেল —

ছুটি নিয়ে সেই অশ্রুমুখী মৈত্রেয়ী পাগলের মত বেরিয়ে গেল-তারপর আজও আসেনি। দরখাস্ত অনুযায়ী আজই তার ছুটি ফুরিয়ে যাবার কথা-।

যাবে বন্দনাদি, উত্তরা দেবীকে দেখতে-বড় কষ্ট পাচ্ছেন-পল্লব নিয়ে এসেছিল-মৈত্রেয়ীর চিঠি-ছুটিও কদিন বাড়িয়ে দেবার অনুরোধ — মা গুরুতর অসুস্থ।

হতবাক হয়ে পল্লবের দিকে তাকিয়ে রইলাম-এ চিঠি কে দিয়ে গেল —

পল্লব হাসলো — আমিই এনেছি-

কিন্তু মৈত্রেয়ী —

সে তার মার পাশে দিনরাত বসে আছে-উত্তরাদিকে আমি তাঁর মেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি-আর সে হারাবে না-

পল্লব-উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলাম-কি করে পারলি রে ভাই-এ তো অসাধ্য সাধন-

না বন্দনাদি, ভুল ভাঙা - আশ্চর্য কি জান, মেয়েকে দেখে এতটুকু বিনয় নেই মায়ের - যেন এই তো ছিল না। এখন ফিরে এলো-এত সহজে কাছে বসালেন। কি করি, মৈত্রেয়ীকে আবার একদিন পথে ধরলাম-যে মাকে কখনও দেখনি-মারা গেলে আর তো দেখবেই না-জানতে ইচ্ছে করে না মানুষ যার নামে এমন ধন্য ধন্য করে-কি আছে তার মধ্যে-কোন সত্য ! তোমার জানা অসম্পূর্ণও তো হতে পারে। আমাকে এড়াতে পারলে তো - বললাম - জগৎটা যেদিন চিনতে পারবে তখন আফসোসের অন্ত থাকবে না - হতে পারে, তোমার বাবাই এবার তোমায় ঠেলে পাঠাবেন-

সত্যি তুই যা করেছিস, তোর উপর রাগ হয়েছিল-ঘেন্না হয়েছিল-যাঃ তোকে ক্ষমা করে দিলাম-হ্যাঁরে ওর বাবা কিছু বলেনি-

সে তোমাদের ওই মেয়ে ছাড়া আর কেউ কি জানবে —

ভিতরের দিকে আধো অন্ধকারে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছিলেন উত্তরা দেবী। লম্বা চুলের গোছা আলগোছে আছে ধবধবে চাদেরর উপর। কপালের একটা পাশ চশমার আধখানা কাচে, ঢাকা আলোয় বিনা প্রসাধনে তিনি যেন চিত্রপট হয়ে আছেন।

পল্লবের সাথে আমরা দেখতে গেছি তাঁকে। আগের দিনের সেই ঘটনা — ফ্লোরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন-। হিমোগ্লোবিন নেমে এসেছে অসম্ভব।

আলো জ্বেলে দিল পল্লব। তিনি ঘুরে বসলেন-এঁদের ধরে এনেছিস-হ্যাঁরে, ডাক্তার কি জবাব দিয়ে গেছে-প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল।

-কি যে বল, ওই যে তোমার ছিচ্‌কাঁদুনে মেয়েকে দ্যাখ-

ও তো কাঁদতেই এসেছে-তোরা ওর বন্ধু-তোদের সামনে কাঁদুক না-আমি যদি তোদের মত বন্ধু পেতাম রে-আমাকে নিয়ে ওর লজ্জারও অন্ত ছিল না, এখন দুঃখেরও অন্ত নেই-আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন-আপনি বন্দনাদি — আপনার কথা ও খুব বলে-হ্যাঁরে ডেকে তো এনেছিস ব্যবস্থা কিছু করেছিস তো-আমাকে তো কিচ্ছু বলিসনি-

সব হবে দাঁড়াও, দেখছি-তুমি গল্প কর না — সব তাতে নাক গলাতে কে বলেছে-

আমার হাতখানা নিজের তপ্ত মুঠোয় ধরে আছেন-বললেন, আপনার কাছে শুনে শুনেই ওর নাকি প্রথম বিশ্বাস হয়েছে অভিনয় একটা শিল্প, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় এর ছবি যেমন, কণিকা সুচিত্রার গান যেমন, অরুন্ধতী, তৃপ্তি, শোভা সেনেরা যেমন আপনি নাকি এমন অনেক কিছু বলেছেন-যা আগে কখনও শোনেনি-মানুষ তো পড়েশোনে অনেক কিছু-কিন্তু যখন এমন করে কেউ শোনায় যা বুদ্ধির দরজা পেরিয়ে বুকে গিয়ে আঘাত করে তখনই সত্যিকারের জানা হয়, সে বলাটা সবাই বলতে পারে না-

কি বলবো, লজ্জা করতে লাগলো-বললাম-ও আমাকে পছন্দ করে তাই-

পল্লব মাঝে পড়ে থামিয়ে দিল-এই দিনরাত্রির নাটক অভিনয় এসব ছেড়ে এক আধঘন্টা মনটাকে একটু রেহাই দাও-অফিসের দিদিরা এসেছেন-একটু অন্যরকম গল্প কর-

জীবনের বাইরে গল্প হয় নাকি রে, হাঁদা, যতক্ষণ আছি, আপনাদের সকলের মধ্যে আছি-এই অনুভব আমাকে সজীব রেখেছে-এ সমাজে মেয়ে হওয়ার অভিশাপ থেকে কি কারো নিষ্কৃতি আছে-তাদের জন্য কেবল লজ্জা, কেবল নিগ্রহ কেবল অবমাননা। যাকে সুখ বলে আঁকড়ে ধরে আছি-সে তো চরম দাস্য-। মেয়েটার আমার তো জীবনের শিক্ষা হলো না, ওকে আপনারা শেখান-একেবারে কাঁচা, বাস্তবজ্ঞানহীন। জগৎ কলুষে ভরা-সেখানে গ্রিন হাউসের গাছের মত বাইরের আলো হাওয়ায়ও শুকিয়ে না যায় —

মেয়েকে কাছে পেয়ে খুশি হয়েছেন তো-আমার কৌতূহল বাধা মানে না-

ওর বাবা ওকে পাঠিয়েছে-

ওকে ভুল বুঝবেন না-ও বড় ভালো মেয়ে-

ওর বাবার মত না থাকলে ও আসতেই পারতো না-যাকে চেনে না, যার পরিচয় কালিমায় ঢাকা-না এত সহজে মানুষ সংস্কার মুছে ফেলতে পারে না। আত্মহারা হবার কিছু নেই-

অর্থের টান কোথায় নিয়ে যায়-কতকিছু সেই আগুনে সঁপে দিতে হয়। কোথায় ফাটল ধরলো, কি করে তটরেখা সরে সরে গেল-কোথায় মিলিয়ে যাবে সে সব-। যদি মানুষের হৃদয় ছুঁতে পেরে থাকি যদি একটি সত্যকে চিনে থাকি, তাকে প্রাণপণে প্রতিষ্ঠা করতে পেরে থাকি-হয়তো আরও কিছুদিন লোকে মনে রাখবে-হয়তো কোথাও লেখা হবে-সময়টাকে আমরা অস্বীকার করিনি-তার দাবি পূরণের জন্য জীবনপাত করেছি-ভেঙে পড়িনি-

আমি আপনা থেকে বলে ফেলি-এক "মাদার কারেজ"

না, না, অত উপরে তুলো না ভাই-আমি দেশের অতি সাধারণ ব্যথিত হতাশাগ্রস্ত সংসারের চাকায় নিষ্পেষিত মেয়েদেরই একজন, ভ্রমর কিংবা কুন্দ, রমা কিংবা কুমু-এর বেশি আর কতটুকু-

কেন রিভলবার হাতে আপনি কি ছুটে যাননি-ইংরেজ মারতে, পুলিসের অত্যাচারে বর্বরতায় উন্মাদ হয়ে যাননি! উত্তরা দেবী হেসে বললেন-ও নাটকটায় অনেক অতি নাটকীয়তা ছিল-তবে হ্যাঁ মেয়েরা তো গিয়েছিল, গুলি চালিয়েছিল-সবই ঘটনা, আবার এলা আর অতীনের কথা, বিমলা সন্দীপের কথাও সত্যি, অনেক ফাঁকা বুলি, আর ফাঁকিও যে ছিল —

তবে আমাদের সময়টাকে আমরা সততার সাথে তুলে ধরেছি- সেই সব যা আমাদের ঘরে ঘরে জ্বলন্ত ছিল-এক নতুন বার্তা, এক নতুন যুগ এসে গেছে-মুক্তির অন্য অর্থ আরও গভীর অর্থ মনকে আন্দোলিত করেছে-

গোর্কির মা, রক্তকরবী, চার অধ্যায় ঘরে বাইরেতে থেমে থাকলে তো হবে না-

নাটকই তো তখন মানুষের মনকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে-। তেভাগার রক্তক্ষয়ী লড়াই নতুন গান নিয়ে পৌঁছে গেছে-তোলপাড় হচ্ছে-

আমি অভিভূত হয়ে বললাম আমাকে কি শেখাতে বলছেন মৈত্রেয়ীকে-এমন করে শেখাবার কোন্ বিত্ত আছে আমার কাছে!

বাড়ি ফিরে মনে হতো. রোজই না কেন-

অপারেশনের পর কেমোথেরাপি। কয়েকবছর কাটলো। আবার বিছানায় পড়ে গেছেন:

গিয়ে দাঁড়ালে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দেন-যতক্ষণ বসে থাকি হাতখানা ধরে থাকেন তপ্ত হাতের মুঠোয়। মাথার কাছে বসে থাকে মৈত্রেয়ী। জোর করে অফিসে পাঠিয়ে দেন-বেচারা কাজে মন বসাতে পারে না-অস্থির হয়, ছটফট করে।

মৈত্রেয়ীকে যত দেখি নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে—ভুলেই ছিলাম। কতদিন হয়ে গেছে তিনি চলে গেলেন-আমার পেস্কেল রিভিশন হলো-মাইনে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। তিনশো টাকায় ঢুকেছিলাম-ন'শো হলো। খেতে বসে মার কাছে বলছি-তিনি খেতে খেতে বার বার উঠে বেসিনে বমি করছেন। চিরটাকালই দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। আমাকে কাজে ঢোকানোর পরে পরেই বাবা একদিন কর্মস্থলে হার্টফেল করলেন। কলকাতায় এসে অনেক চেষ্টা করে কাটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করতেন। তার তিনটি সন্তান নিয়ে মা মামার আশ্রয়ে-তাঁরও কলোনি জমি। মাথাভরা কোঁকড়া চুল, চকচকে মাজা রঙ, মাকে লোকে সুন্দরী বলতো। অভাবের আগুনের জ্বলে পুড়ে কালি হয়ে গেলেন। আমরা সামাল দিতে পায়ে পায়ে ঘুরতাম-তবু তাঁকে বিশ্রাম দিতে পারতাম না। মা কেবল তাড়া দিতেন-পড়াশোনা কর, এখান থেকে একদিন তো বেরুতে হবে-এ তো চিরদিনের ঘর নয়। আমরা একদিন সে ঘর বানাবো-তাই-না।

যে সময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কলঙ্কের ছিল-সেই সময় মা মাইনর ক্লাসে বৃত্তি পেয়েছিলেন-ষষ্ঠ ক্লাস। শহরে পড়তে যেতে পারেননি- তাই বৃত্তিও ভোগ করতে পারেননি। ভাষাজ্ঞান ছিল, সাহিত্য রুচি ছিল- বাবা মাকে বইপত্র এনে দিতেন-সব ছত্রখান হয়ে গেল।

মার সেই ঘরের স্বপ্ন সত্য হয়েছে। তিনজনের সবাই আজ নিজের নিজের ঘরে।

নিজের রোজগারে ভাড়া বাড়িতে নিয়ে এলাম যখন-কি আনন্দ, কি তৃপ্তি — বুকের মধ্যে গর্ব।

মা-শব্দটি কত ছোট অথচ একটি ডাকে সারা বিশ্ব যেন সাড়া দিয়ে আসে। স্বপ্ন লোকের চাবি তাঁর হাতে, চাঁদমামা তাঁরই আহ্বানে কপালে সোনার টিপ পরিয়ে দেন। তার হাত ধরে আসে ছবি, ছন্দ, গান, আকাশ আপন হয়, সন্ধ্যা আপন হয়ে মায়ের কোল হয়ে ওঠে, গাছপালার ঘ্রাণ, মায়ের বুকের ঘ্রাণে মেশে। চাঁদের আলোর মত কুয়াশা ঘন এক স্বপ্ন হয়ে ওঠেন মা, ছবি হয়ে ওঠেন। কাজল দীঘার গহীন শীতল হয়ে যায় মায়ের আঁচল। তারপর স্বপ্নটুকু ক্ষইয়ে দিয়ে, ভালবাসা বইয়ে দিয়ে দিনে

দিনে জীবনের সব রস একটু একটু করে নিঙড়ে দেন আমাদের পায়ের তলার মাটিতে। কি পেলেন, কি দিলেন তার হিসাব করলেন না।

হাত ধরে মা আকাশ খুঁজে দেন, ডানায় উড়িয়ে দেন তার স্বপ্নদের, ইচ্ছেদের। অপেক্ষা করেন কবে তাঁর দুয়ারে এসে চোখ তুলে তাকাবে-তিনি জানবেন প্রত্যেক. চোখের তলায় জীবনের কত কালি, কতটুকু আলো করে আছে হৃদয়। মানুষ কোনদিন হারে না-সে বাঁচতেই থাকে-মা শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর বুকের তলায় বয়ে যায়-পৃথিবীর অকৃত্রিম জল।

মৈত্রেয়ীকে দেখি-আর প্রাণমন কেঁদে ওঠে-যে কান্না আগে কাঁদিনি। সে কি মায়ের বুকের তলার নোনা সমুদ্র আবিষ্কার করেছে-হয়তো নয়-হয়তো কোন রহস্যময়তা তাকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন করে রাখে। যেমন করে আমরা তাঁর পাশে বসে অভিনীত হতে দেখি-ফুটপাতের কৃষক বধূটি অনাহার শুষ্ক স্তনে শেষবার দুধ পান করাতে চায় সন্তানকে —, "ফেন দ্যাও, ফেন দ্যাও" এর পালাগান, সেই আকুতি, সেই নিষ্প্রদীপ, খাদ্যের লাইন। দেখি ঘর ভাঙা গ্রাম উজাড় করা সন্ত্রস্ত সংসার চুর চুর হয়ে যাচ্ছে, বধূ খুঁজছে স্বামীকে, স্বামী হারিয়েছে ঘরনীকে, সন্তানের ভ্রূণ যার গর্ভে। ১৯৪৩ এর পর ১৯৪৭ একই ছবি —

এবার আর ভিক্ষা নয়, লঙ্গরখানা নয়, ডোল নিয়ে বাঁচা নয়, বাস্তুদখলের লড়াই-মিছিল, মিছিল, আহত স্বামীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, আর বিপুল যন্ত্রণার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে — শিশু।

আর তখনই আমার মা এসে দাঁড়ান। পিতৃহীন সংসারের বোঝা কাঁধে নিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া নখের নিচে হলুদ-লঙ্কার গাঢ় ছোপ, হাতের রেখায় গভীর ফাটল-শুধু রান্নার গন্ধ, ফোড়নের গন্ধ, ঘামের প্যাচপেচে ফ্যানের গন্ধ। মামার আশ্রয়, তখনও মানুষ অসহায় আত্মীয়ের দায় ঝেড়ে ফেলে দেয়নি। আমার চাকরি। খরখরে হাজায় ভরা হাতখানা কপালে রাখলে ঘুমের পর্দায় ঝনঝনানি এখনও শুনতে পাই। নিঃশব্দ, গৃহকোণচারিণী, জীর্ণ মা-আধময়লা কাপড়ে রেশনের লাইনে পায়ে রবারের চটি-বুকের ভিতরে জ্বালা ধরিয়ে চোখ ফেটে জল আসে। আমার সাফল্যের দুয়ার খোলার মুহূর্তে বিদায় নিলেন —

কবে অস্পষ্ট এক অন্ধকার রাতে কলকাতার প্ল্যাটফরমে নেমে কূলহীন সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আতঙ্কের ভারে আমরা দেখলাম দুখানা পা রাখার মাটিটুকুও নেই। বাবার উদ্বেগাকুল চোখে মুখে মৃত্যুর মত ধূসরতা, হাত দুখানা শিথিল, শীতল, ঘামছেন।

সেই আতঙ্ক জাগানো কলকাতার দিনরাত্রি আমাদের জীবনগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। সাপের মত জড়িয়ে জড়িয়ে। আমাদের চোখদুটো প্রতিদিন শুধু ভাতের থালায় আটকে রইল।

মানুষ রূপসী কলকাতার কত কি দেখতে আসে, আমরা এর শিরদাঁড়া ছাড়া আর কিছু দেখিনি। এখন তবু এক একদিন হলুদ রঙ আলোয় একখণ্ড কালো মেঘ

মনুমেন্টের ওপর ছায়া ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াই। রেড রোড বেয়ে ধেয়ে আসা অজস্র ধারা চোখে মুখে মাটির গন্ধ ছুঁইয়ে দিয়ে রাজভবনের বনচ্ছায়ায় মিলিয়ে যায়, কোন দূর বেদনায় কম্পিত হতে থাকে বুক। বৃষ্টিতে ধুয়ে যেতে থাকে বর্তমানের ধুলো বালি, পা সরে না —

. আজকাল একলা ঘরেও কত রকম বিভ্রম মনকে টলিয়ে দিয়ে যায় — শুকনো বকুলের গন্ধ পাই, নতুন কাপড়ের খস খস ধ্বনি ঘরের বাতাসকে জাগিয়ে দেয় —

ঘষা টিপের মত সিঁদুর রঙা চাঁদ কপালে নিয়ে গাঢ় মেঘখানি জানালায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় — চোখ পড়তে মনে হল ঠিক যেন ঘোমটা ঢাকা মায়ের সিঁদুর মাখা মুখ —

চাঁদ এমন অস্ত সূর্যের মত লাল হয়, কলকাতার বুকে এমন করে চাঁদ ওঠে, জানি না কেউ আর এমন দেখেছে কিনা —

অশ্রুহীন চোখ কর কর করে ওঠে, কি যে বেদনা উথলে ওঠে।

মার পাশে থাকিনি, আমার পরে সব ভরসা বুকে নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালের শয্যায়-একা কাটলো-আমি পারিনি পাশে বসে এমন করে সেবা উজাড় করে দিতে।

কত বাঁধনে বাঁধা, কত স্বার্থের সুতোয় টানাপেড়েন, কত সঙ্কট সামনে দাঁড়ায়, নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করতে করতে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসে — সময়ের দাবি মেটাতে সব থেকে কাঙ্ক্ষিত, সব থেকে অন্তরতম সম্পর্ক দুহাতে ছিঁড়তে হয়। তাই ছিঁড়লাম — নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে আপনি তুলে দিয়ে এলাম — মাকেও ছিন্ন করতে হয় নাড়ির বন্ধন। সময় তাকে নির্মম হাতে টেনে নিয়ে গেছে — কোল থেকে সন্তানকে নামিয়ে রেখে পৃথিবীর পথে পা বাড়াবার দাবি বড় হয়ে দেখা দেয় যখন।

মার কথা ফুরিয়ে গেল — অভিমান করেই যেন আর কোন কথা বলতে চাইলেন না — কেন অভিমান। থাক, অনেক 'কেন' সামনে এসে দাঁড়াবে — যার কোন উত্তর নেই — জানি এবার মা ফুরিয়ে গেলেন।

মৈত্রেয়ীর মায়ের সামনে বসে বসে নিজের মাকে দেখি —। ইতিহাসের সেই সময় — সেই অন্নবস্ত্রের হাহাকার, সেই যুদ্ধ, সেই সাইরেন, সেই ব্ল্যাক আউট, সেই তাড়া খাওয়া বাস্তুহারার কোমর বাঁধা, কি ছিল না —। দেশের এই এককোণে একটুখানি জায়গায় দাঙ্গা হয়নি তবু ছেড়ে আসা, বংশানুক্রমিক আবাস, জীবনযাপন, তার মর্মান্তিক বেদনা — এই গোটা ইতিহাস তো আর সকলের সাথে আমার মায়েরও ইতিহাস —

ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো — পাকিস্তান হয়ে গেল, "আল্লা হো আকবর" আকাশভেদী রব উঠলো — 'বন্দেমাতরম্' বলার কেউ রইলো না —

বিশ্বযুদ্ধ চলছে।

ইভাকুয়েশন হয়েছিল গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছিল — যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজির কারণে। মার মামার বাড়ি যশোরের এক গ্রামে, বিনোদপুর থেকে সাত মাইল ভেতরে, গোরুর গাড়ি বা পালকির পথ — দীঘা। সেই স্টিমারে ওঠা, সেই পালকি চাপা আমার!

দীঘায় মস্ত দিঘি পদ্ম ফুলের, গাছে পদ্মমধুর মৌচাক। আর এক পুরনো নীলকুঠি-কড়ি বরগা সিমেন্ট পাথরের এক দুর্গ-পোড়া কাঠামো নিয়ে ভয়ঙ্করের দুঃস্বপ্নের মত মস্ত ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় —। কেউ সেখানে ওঠে না — গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে — কত শত অপঘাতে মৃতদের শান্তিভঙ্গ করে না কেউ —

মার মামার বাড়িতে এমনি গভীর জঙ্গলে ঢাকা সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার প্রাসাদ। বিশাল দেউড়ি — সামনেই ভেঙে পড়ে আছে। — পথ একেবারে বন্ধ। গাছের মোটা মোটা ডালপালা লতা জাল বেয়ে বেয়ে উঠলে এক বড় নাটমন্দির-বিগ্রহও ছিল, কালী। পুরনো লোকেরা চুপি চুপি বলে — ওই নাট মন্দিরের সিঁড়ির দুপাশে নীলকর সাহেবদের পুঁতে রাখা আছে। তারপর থেকেই পরিত্যক্ত পড়ে আছে এই বিশাল অট্টালিকা। ভেঙে দেওয়া হয়েছে দেউড়ি। বুকে আতঙ্কের শিহরণ নিয়ে অসীম কৌতূহলে বার বার এই রহস্যলোকের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে — রূপকথার দেশের মত ওই বাড়িটার গায়ে গায়ে - চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে —

এতো বাঙালির ঘরের ইতিহাস — এমনকি অস্ত্র হাতে তুলে নেবার ইতিহাস — প্রতাপাদিত্য, বুড়িবালাম। নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ যদি শক্তিমানের পায়ে কখনও মাথা লুটিয়ে দিয়েছে ; আবার মাথা তুলে সবার আগে রুখে দাঁড়ানোর এ উত্তরাধিকার, এ পরম্পরা — চিরকালীন — বাংলার —

সেই অন্ধকার রহস্যলোকের আকর্ষণ ছিল অদম্য — কখ্খনও যাবে না ওখানে — যেতে মানা — অমঙ্গল — মা ভয় পেয়েছিলেন। কড়া করে বকে দিয়েছিলেন গ্রামের কোন বয়স্ক লোক। তবু যে ঔৎসুক্য থেকে যায় — মাকে মনে এলে — একসূত্রে গাঁথা হয়ে ফিরে ফিরে আসে সে সময় —

মায়েদের নিবেদিত প্রাণ — গান্ধীজী স্বাধীনতার প্রতীক, গান্ধীজীর অনশন — অনশন হচ্ছে বাড়িতে। বয়কট বিলাতি দ্রব্য — অনেক বর্জনের কথা স্বপ্নেই থাকলো — না খদ্দর পরা হলো না। মা চরকা কেটে সুতো করেছিলেন, ছোট বোনটার জন্মের সময় সেই সুতো বাজারে চলে গেল। আমার হাত ধরে মা প্রভাত ফেরিতে গিয়েছিলেন — এ আমার মার মুখেই শোনা —

দেশভাগ হলে সেই গান্ধীজীর নামে কি বিতৃষ্ণা, কি ধিক্কার — গরিব লোকেরা, নিচুতলার অবুঝ লোকেরা ধরে নিয়েছিল গান্ধীজী আছেন — সব ঠিক থাকবে — দেশ কখনও ভাগ হয় — এ বোধ তাদের ছিল না — ভিত্তিটা গুঁড়িয়ে গেল —

মানুষ তখন অভিশাপ দিচ্ছিল, ফেটে পড়ছিল অসহ্য ক্রোধে ক্ষোভে — সরল মানুষ — সর্বস্ব কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র ছাড়া, ভিখারী করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। যতদিন প্রাণ থাকবে এ প্রতারণা কি কোনদিন ভুলতে পারবে — প্রতিদিনের দুর্বহ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে চিনে কুকুর বিড়ালের মত হাতের সম্বলটুকু নিয়ে আস্তানায় আস্তানায়, ক্ষুধা আর ইজ্জত নিয়ে তাড়া খেয়ে হাঁফিয়ে দাপিয়ে

বেড়ানো — সে কাহিনীই নাটকে সিনেমায় গানে গল্পে দেশ কাঁপিয়ে দিল —। নাটক, সিনেমা ছাড়া সে বীভৎসতা কি আর কোনভাবে দেখা যেতো!

আমরা বসেছিলাম উত্তরা দেবীর ঘরে। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। মৈত্রেয়ী চায়ের ট্রে হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেয়ালা তুলে দিয়েছি উত্তরা দেবীর হাতে। পল্লব উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকলো। গিয়েছিল গরম সিঙাড়া আনতে। গত দু'দিনের ঘন বর্ষার পর আকাশে মেঘ জমেছিল — মরা আলো সারাদিন। মেঘে ঢাকা, মনের মত আড্ডা দেবার দিন —।

খালি আতে ওভাবে ঢুকতে দেখে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম — কি ব্যাপার — কি হয়েছে —

টাকাটা টেবিলে রেখে — ফিরে এসে বলবো, বলে ঘুরে দাঁড়াতে উত্তরাদি শান্ত গলায় বললেন, — দাঁড়া, বলে যা কি হয়েছে —

শুনতেই হবে, পরে শুনলে হতো না — ধরা গলায় আমাদের চমকে দিয়ে পল্লব ঘুরে দাঁড়ালো — মধুশ্রী আত্মহত্যা করেছে — এই মাত্র তাকে এনেছে —

না — কখ্‌খোনো না — আর্তনাদ করে উঠলেন উত্তরা দেবী — পল্লব ওই হারামজাদাটার শাস্তি হবে না — একটা সোনার মেয়েকে শেষ করে দিল — দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়লেন —। আমি বিমূঢ়। বসে বসে তাঁর কান্না দেখছি — কি সান্ত্বনা দেব নিজেই জানি না —

এই মধুশ্রী অভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে — ভালোই বক্স অফিস টানছিল। একটি ভাল ফ্ল্যাট কিনে এ দিকটায় উঠে এসেছিল সম্প্রতি। কেন আত্মহত্যা করলো — কেন? উনি এমন কাঁদছেন — মৃত সন্তানের বুকে পড়ে মানুষ যেমন কাঁদে।

পল্লবের কাছে শুনেছিলাম — শিল্পী জীবনে মেয়েদের চরম নিগ্রহের কথা — কেমন করে সে হয়ে ওঠে টাকা রোজগারের যন্ত্র। সোনার হাঁসটি।

কেন কাঁদেন এদের জন্য উত্তরা দেবী — তিনি যে এদের জানেন। তাঁর চেয়ে বেশি কে জানে — কত দুর্গ্রহ ঘিরে থাকে, স্বপ্নের আকাশ কেমন ভেঙে পড়ে মাথার উপর —

একনাথবাবু আর বিয়ে করলেন না কেন বলতো? এটা পড়ে দেখ। উত্তরা দেবী প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পর এই সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। তিনি বলেছেন স্ত্রীকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন — অন্য কেউ তাঁর মেয়ের মা হয়ে আসবে — এ তিনি সইতে পারবেন না। আর আপনারা সবই তো জানেন, ডিরেক্টর, প্রডিউসারদের সাথে খাতির না রাখলে কি আর বড় অভিনেত্রী হওয়া যায় —

চিরকাল আদর্শ স্বামী বনে থেকে বৌটাকে শুষে নিল সে, আর লোকে বললো এমন পত্নীপ্রাণ স্বামী। অবোধ সন্তান ফেলে যে স্টেজে স্টেজে নেচে কুঁদে বেড়ায় — সে কুলটা ছাড়া কি! — শিল্পকে এই মূল্যেই মাথায় তুলে নিয়ে, আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন — উত্তরাদেবী — কেন কাঁদেন তিনি, মধুশ্রীদের জন্য, কেন রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন — এমন নিষ্করুণ অপচয়ে —।

যে পারে জীবন মন্থনের বিষ কণ্ঠে নিয়ে কঠোর লড়াই লড়তে লড়তে পথের নিশানা খুঁজে যেতে-তারাই 'মাদার কারেজ'-"হিম্মতবাঈ"-

সেনা ছাউনিতে ছাউনিতে সওদা বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে মাদার কারেজ চলেছেন, চলতে চলতে অহঙ্কারী যুদ্ধ একে একে ছিনিয়ে নিচ্ছে তাঁর স্বপ্ন, গ্রাস করছে তাঁর শক্ত সমর্থ বাহুবল-যুদ্ধের বলি হচ্ছে অর্বাচীনরা-যুদ্ধকে যারা রূপকথার চোখে দেখে-। শেষ সঙ্গী তাঁর একটি বোবা মেয়ে-সুশ্রী। কাল-যুদ্ধ তাকেও বাঁচতে দিল না। সে গেল যুদ্ধ শেষের দামামা বাজিয়ে দিয়ে।

একা বয়সের ভাবে জীর্ণ, অভাবের করাল ছাপ সর্বাঙ্গে-এক অন্তহীন প্রান্তর ভেঙে চলেছে, 'মাদার কারেজ' কোন দিগন্তের দিকে-

একজন মানুষও একটা ইতিহাস, ইতিহাসের সঙ্গী। মানুষের কথাই শেষ কথকথা।

[এ কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক]

মৃতেরা কথা কয়ে উঠবে

[জেহানাবাদের লক্ষণ বাথেটোলা গ্রামের হত্যাকাণ্ড স্মরণে লিখিত]

(ঘন অন্ধকার ছিটকে বেরিয়ে এলো মুতুন। অন্ধের মতো ঝোপে জঙ্গলে হাঁচড় পাঁচড় করে লুকোতে লুকোতে লম্বা ঘাসের খেতে এক আড়ায় পড়লো হুমড়ি খেয়ে। চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে ঠাহর করতে পারলো ঠিক দিকেই সরে আসা গেছে। এখন আর একটা নয় মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ ফেটে পড়ছে— আর আর্তনাদ।) রক্ত হিম করা। প্রতিটি গুলির শব্দ, প্রতিটি বুক ফাটা আর্তনাদ, গর্জন, হুঙ্কার, মশালের লাল ধোঁয়া দপদপ করে রাঙিয়ে তুলছে অন্ধকার। নরক যন্ত্রনায় এপাশ-ওপাশ করছে মুতুন। শব্দভেদী বাণ ভীষ্মের শর শয্যায় তাকে গেঁথে ফেলেছে, সব শব্দ আর্তনাদ নিরেট পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসছে। ওরা শিকারে বেরিয়েছে, নরমুণ্ড শিকারীরা, কাপালিকের রাত, নরবলির রাত, অমাবস্যার কাল রাতে ওরা গুহা থেকে বেরিয়েছে। কাঁথার মতো তারা গাঁথা আকাশ। চোখ কান বন্ধ করে মাটিতে বুক চেপে পড়ে আছে তবু এক একটা গুলির শব্দে চোখের ভিতরে এক একটি তারা ছিটকে এসে বিঁধে যাচ্ছে। চারিপাশে দুলে দুলে উঠছে ঘাসের শীষ। বাতাসে পোড়া তেল, তীব্র বারুদের গন্ধ। বুকের নিচের মাটি কেঁপে উঠছে বুট পরা পায়ের দাপে। টগবগ করে ছুটে বেড়াচ্ছে ঘর থেকে ঘর— ওরা খুঁজতে এসেছে ওদের দিকে তাক করা এক একটা আঙুল। বন্ধ চোখের ভিতরেও স্পষ্ট ছবি ভাসছে, হাতের ভর সয় না যে আগল, তার ওপর সজোর বুটের লাথি— সশব্দে ভেঙে পড়ছে ঝুপড়ির পলকা আস্তানা। উঁচানো বন্দুক বুকে ধরে জানতে চাইছে— কোথায় সে। কোথায় তাদের শিকার! সামনে লুটিয়ে পড়া মেয়ে-পুরুষ, অসহায়, হতদরিদ্র। লুঠবার জন্যে প্রাণটুকু ছাড়া কিছুই নেই— প্রাণ— শিশু, মা-বাপ, বোন-ভাই—

শোন নদীর কালো ধারায় ভয়ানক কথা ফিস ফিসিয়ে বলাবলি। কত কালের কত যুগের কথা— প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি। চরাচর নির্বাক হয়ে থাকে।

ওদের পানসিগুলোর গায়ে জলের ঢেউ-এ করতাল বাজছে। কটা পানসি এলো আজ!

প্রথম গুলির শব্দ হতেই গরম রুটিটা উনুনে পড়ে গেল। কেঁপে উঠলো ধানু।

চোখ ঠিকরে চাপা গলায় বলে উঠলো — পালাও। পাগলের মতো ঠেলতে থাকলো — পালাও — গলা বুজে এলো তার। উনুনে রুটি জ্বলে যাচ্ছে, পোড়া গন্ধ, ধোঁয়ায় ঘর ভরেছে। তুই, তুই যা গুড়িয়াকে নিয়ে — ঘুরে দাঁড়ালো মুতুন। কিছু শুনবে না ধানু — বেড়ার ফাঁকটা উঁচু করে ধরে টানতে থাকলো তাকে — তুই থাকলে আমরা থাকবো — তুই না থাকলে কি হবে — কোথাও তখন পায়ের আওয়াজ আসছে — লম্ফটা খপ করে নিভিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল — যা — ভেগে যা — মুতুনের হাতখানা জোর করে ছাড়িয়ে নিল। গুড়িয়াটাকেও চোখের দেখা দেখে আসা হলো না —

এই প্রাণটাই দামী এতো

— জানোয়ারগুলোর মুখের সামনে ফেলে দিয়ে এলি তোর প্রাণের গন্ধরাজ ফুলটি, তোর গুড়িয়া। আর ধানু, সে কে তোর!

বেজন্মার মতো পড়ে আছিস — ছুটে যা — ওঠ, প্রাণ যায়, ওদের পাশেই মরে পড়ে থাক না তুই — সেবার পিতাজী খতম হলো — জানিস না তোর তালাশে ওরা আসে তোকে না পেলে ওরা সব পারে — হায় রাম — নিজেকে খিস্তি দিয়ে টান হয়ে উঠে বসলো — লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে শরীর — সর্বশক্তি দিয়ে পাথুরে মাটিতে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল — মরবে সেও ভালো — না এভাবে সে বাঁচবে না — একা একা বেঁচে — না ধানু না। সে মুতুন আমি নেই, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। কিছু নেই। কালো বলে, পেঁচি বলে যে ঘেন্না করতো, দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে তোকে কি বলবে বল। কোন্ মুখে তোর কাছে মাফ চাইবো — লজ্জায় পারিনি — তুই কি জানিস — আমার জানসে প্যারা তুই — এমন করে প্রাণ হাতে করে লুকিয়ে বসে — এ আমায় দিয়ে হবে না — পারবো না — মুতুনের চোখ ফেটে জল আসছে সে কাঁদছে — দু'হাত কপালে ঠুকছে। কি প্যাঁচে পড়েছি — ধানু। পাঁচজনে কথা হয়েছিল — রেতের বেলা ঘরে থাকা মানা। এমন হবে, ওরা আসবে — সে তো সব্বাই জানি — ধানের জমিতে ওরা মেশিন এনে রাতারাতি ধান কাটবে ঠিক করলো — মোরা যে জেলা অফিসে গেলাম — এইবার খুনোখুনি একটা করবে — ভয় দেখাবে।

কথা হলো — জমি চাই কি না — এগোতে হবে পেছোতে পারবে না — সবাই বললে — চাই।

আলবৎ চাই — মুঠি শক্ত করে মাটিতে ঘুষি মেরেছিল সবাই। তুই জানিস। তুই সব জানিস।

ধানু এ লড়াই-এ নামবো, তেমন মানুষ কি ছিলাম, তুই তো সব জানিস্। লুচ্চা শনিগুলো আমার ইয়ার ছিল। শনিগুলো আমার ইয়ার ছিল ওরাই তো বিষিয়ে দিল আরও, বললে ফের সাদী কর —। মা মানতো না। বলতো ওর বাপ চার কুড়ি টাকা দিয়েছে — রঙ কালো তো কি ছিরি ছাঁদ.আবার কত হবে? তোর মুখই দেখিনি —। সাদীর কথা শুনে ফের রাগ করলো মা — কে আমার রে — ঘাড় ধাক্কা দেব — ঘর ওর বাপের টাকার — তোর নয় —

কিছু হলো না। সে সনে বাইরে কাজে যাবো — দল বাঁধছি —

ধানু — সেই প্রথম দাঙ্গা হয়ে গেল — মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেল — কি নাম — যমুনা — না শোন নদীর চরায় — চিৎকার শুনেছিলি তোরা —

তুই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললি — বাঁচাও বাঁচাও — কেন টেনে নিয়ে যাবে ওরা — কেন — তোর জ্ঞান ছিল না — সেই প্রথম কথা বললি তুই — সেই তোকে দেখলাম — কালো হীরের মতো জ্বলছিল তোর চোখ। পরের জন্যে কাঁদতে দেখলাম কাউকে — সাহস দেখলাম। আর কিছু না — কি যেন হয়ে গেল — আমাদের মধ্যে — যমুনাকে কেড়ে এনেছিলাম আমরা — আমার পায়ে বল্লম বিঁধে গিয়েছিল খুব রক্ত পড়ছিল — গ্রাম ভেঙে এসেছিল — অন্ত্যজ জাতের মেয়ে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে এসেছে — এ কেউ কখনও দেখেনি —

কুমীরকে জলকে নেমেছি বলে জলে নেমে দাঁড়ালে আর ছাড়াছড়ি নেই — কুমীররের দাঁত একবার বসলে আর খোলে না। সেই থেকে এই গাঁয়ে কি না হলো — জানতোও সবাই — মালিক জমিদার শেঠ ঠাকুররা বলছে — মিট্টি মে মিল্লা দো — সাজ সাজ রবে তারা আসতেই থাকলো।

ইজ্জতের লড়াই — মুনাফার লড়াই এর চেয়ে মিঠা হয়। ধানু, ভেড়ুয়া থেকে তুই আমাকে ইমানদার ইনসান বানিয়েছিস। তোর কোলে গুড়িয়া এলো — কি রূপ যে ধরলো তোর চেহারায় — চোখ ফেরে না। জানি তোর অভিমান ছিল, ভুলতে পারিসনি। আমি কি এতো ভালবাসতে পারিনি — যাতে সে ময়লাটুকু মুছে যায় — অথচ আমি ভুলে গেলাম — আজ এই সর্বনাশা মুহূর্তের আগে অকাতরে ভুলে বসে আছি — নিজের গুনাহাগারের কথা।

বাঁ পায়ে এই যে গভীর ক্ষত, সেই প্রথম আঘাত, সেই প্রথম ভয় ভেঙে বেরিয়ে আসা — আর সেই নরপশুরা — কি তাদের বিস্ময়ে ঠিকরে যাওয়া চোখ — চোদ্দপুরুষের নাম নিচ্ছে তখন। শুধু সেই মুখগুলো মনে রেখেই আমি এগিয়ে গেছি —

এই সাংঘাতিক রাত — ওই গুলির আওয়াজ — বুম বুম ছুটে যাচ্ছে —। ওদের বুটের তলায় কত কি ঘটে যাচ্ছে —

এখানে এভাবে পড়ে থাকতে পারছি না — ধানু — তুই কি বাঁচতে পারবি ওদের হাত থেকে, না হাত নয়, জানোয়ারের থাবা থাকে, হাত থাকে না।

দু'হাতে কান চেপে থাকলে কি কান বন্ধ হয়ে যাবে — শব্দ শোনা যাবে না, দাঁতে দাঁত চেপে — শব্দ আর আর্তনাদ — দুন্দুভির কড়া আওয়াজ, মাথায় এসে ধাক্কা মারে, আকাশটা তারা শুদ্ধু খোবলা হয়ে খসে পড়েছে — হ্যাঁ দুনিয়া অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গরম সীসায় বুঁজে যাচ্ছে কান —। দুনিয়াদারির হাতে তাকতের চমকানি। খুন হয়ে যাবে, রক্ত ঝরে যাবে — লাশগুলোই আবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে — ওপরে চালান হয়ে যাবে — হাজার জোড়া চোখ বলবে ওরা খুন হয়েছে — অন্ধ শাসন বলতে থাকবে — ওরাই খুনি।

ধানু কি করে এ জট খুলবে — আমার রোয়া ধান আমি ছুঁয়ে দেখিনি, আমার

গোরুর দুধ আমি পাইনি। আমার সন্তান তার মুখে চুমো খেতে পারিনি, আমার ঘরওয়ালি, আমার ঘর বসত হয়ে ওঠনি—

ধানু, আমার ঘর, আমার জমি, আমি পাগল হয়ে যাব ধানু, আমার ধানু। আমার গুড়িয়া—

কখন শব্দ থেমেছে, কান্না থেমেছে, চরাচরে অসীম স্তব্ধতা নেমে এসেছে। কখন রাত কেটে ভোরের বিরল আলো ফুটে উঠছে—কখন মৃত্যুদূতরা ফিরে গেছে—জলের বুকে সে দাগ মুছে গেছে, শব্দ হারিয়ে গেছে।

আঁধার ফিকে হয়ে আসিছে। চেতনায় ফিরে আসছে মুতুন। কুয়াশায় ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। ভিজে ঘাসের ডগা নুযে পড়ে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল তাকে। সব যেন, ভয়ানক রকম স্তব্ধ। শরীর আড়ষ্ট, হাতে পায়ে খিল ধরেছে—চেষ্টা করেই পাশ ফিরলো—হাত বাড়িয়ে সাবধানে ঘাসের গোছা ফাঁক করে চোখ রাখলো। কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারিদিক। কোথাও কোন চাঞ্চল্য বোঝা যাচ্ছে না। পাখিও ডাকছে না। কষ্টে ভর দিয়ে ধীরে, খুব ধীরে যেন শরশয্যা থেকে উঠে বসল মুতুন। ওদের না পেয়ে শয়তানগুলো এখনও ঘাঁটি গেড়ে বসে নেই তো। তাহলে ওদের ছিপগুলো থাকবে—লুকিয়েও রাখতে পারে—কোথাও খাঁড়িতে ঢুকিয়ে। ঘাসের ডগা ফাঁক করে নজর রাখতে রাখতে গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো সে। এই গভীর নৈঃশব্দ তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। গুলি গোলার শব্দে পাখপাখালি কুকুর-বেড়াল সব পাড়া ছাড়া হতে পারে, তা ঠিক—

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গ্রামের কাছাকাছি এগিয়ে এল—শব্দ শোনার দুরত্বে পৌঁছে গিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলো—না বুড়ো বুড়ির কাশি, না বাচ্চার কান্না—এখনও কি ঘাপটি মেরে বসে আছে বেজন্মাগুলো—! তাহলে সেই জানালা গলানো নিশানা নেই কেন? কারো না কারো জানালায় তো থাকবে—! মাটি ঘেঁষে নিজের বাড়ির দিকে এগোল মুতুন—ধানু ভুল করবে না—নিশানা থাকবেই তার জানালায়—কই নেই তো—খানাটা টপকে ওপার যেতে হবে—লাফ দেবে কি, একবার ভাবলো—তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামলো—ওদিকের কিনারাটা ধরে শরীর ওপরে টেনে তুলে নিতে নরম কিসে পা লাগলো যেন—কি এটা—পা দিয়ে শক্ত করে ঠেলা দিল—দুটো ছোট হাত-পা চেপে ধরেছে, খামছে ধরেছে যেন। ফিস ফিস করে বললো—কে রে! মুখের কাছে মুখ নিয়ে অবাক হয়ে গেল বানোয়ারীর ভাইপো। সারা গা কাঁটায় ছড়ে রক্তাক্ত। ছেলেটার মুখে কথা নেই, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে—হঠাৎ উঠে ছুটে চলে গেল।

মুতুন পায়ে পায়ে বাড়ির পিছন দিক থেকে উঠোনে উঠে এলো। কারো সাড়া নেই। নিচু গলায় ডাকলো, ধানু। পায়ে ঠেকলো ভাতের হাড়িটা উঠোনের মাঝখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে—। দাওয়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি এক করে সে চিৎকার করে উঠলো—অমানুষিক সে চিৎকারের কোন প্রতিধ্বনি হলো না—

দরজার কোলে কালো আঠার মতো ধারা—আছাড় খেয়ে পড়লো—গুড়িয়া—মেরা

গুড়িয়া — চার হাত পায়ে উঠে ঘরে ঢুকলো — সামনেই ওঃ ওঃ বমি তুলতে তুলতে বারান্দায় এসে বুক চেপে বসে পড়লো — বাসি রক্তের আঁশটে গন্ধে ঘরের বাতাস ঘোলাটে হয়ে রয়েছে —

গুড়িয়ার ছিন্নভিন্ন শরীর — মাটির পুতুলটা যেন হাত-পা ভেঙে রেখে গেছে কোন দুর্বৃত্ত। নির্লজ্জের মতো ক্ষতবিক্ষত করেছে ধানুকে বোধকরি তার খোঁজ চেয়ে বিফল হবে —

হিংস্র চিৎকারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাফিয়ে উঠোনে নামলো মুতুন — উঠোনেই ভাতের হাঁড়ি থেকে তখন মুঠো ভরে ভাত খাচ্ছে সেই ছেলেটা — রাজু

চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো — খুন, খুন, হত্যায়েরা সেনা —। তখনও কোথাও জনপ্রাণী নেই। কোথাও কাকপক্ষী নেই, কুকুর বেড়াল নেই — রাত্রির রাইফেল দূর-দূরান্তে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তাদের।

ভয়ের রাজ্য ত্যাগ করে গেছে তারা।

রাজুও ছুটছে, পোষা কুকুর ছানার মতো তারই পিছনে পিছনে — ভয় চকিত, ফ্যাল ফ্যালে মুখ। মুখে শব্দ নেই চোখে জলও নেই—

দূরে থমকে যাচ্ছে মানুষ। দু'একজন করে এসে দাঁড়াচ্ছে, সরে থাকা ঘরের মানুষ ফিরে আসছে, নিস্পলক তাকিয়ে আছে — কঠিন মুখ, লৌহ কঠিন পেশি, ফেটে যাচ্ছে বুক, উষ্ণ অশ্রু চোখেই শুকিয়ে যাচ্ছে —

শুধু রক্ত, ঘরের মেঝেয়, উনুনের পাশে, খাবারের থালায়, খাটিয়ায়, — শিশুর দোলনায়। যে যেখানে ছিল, সেখানেই ঢলে পড়েছে, পরস্পরকে জড়িয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে, গড়িয়ে গেছে রক্তের ধারা, ধারার সাথে ধারা মিলেছে, রক্তের হ্রদ নদী হয়েছে, আর ভয়ঙ্কর চোখ জোড়ায় জোড়ায় নিঃশব্দ অভিশাপে জ্বলন্ত অঙ্গার —

মুতুনের স্বর ভেঙে অদ্ভুত রকম জান্তব হয়ে গেছে, থামতে ভুলে গেছে সে — ভোরের আকাশ কুয়াশা কাটিয়ে লজ্জায় মুখ বার করতে পারছে না, পাখিরা ফিরে আসার পথ ভুলে গেল। শোন নদীর জল রক্তের ধারার মতো কালচে লাল,নিচু সুরে একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। গাছপালা স্থির, একটি পাতাও নড়ছে না।

কোলের শিশুটির মুখে শেষবার চুমু খাওয়া হলো না, প্রিয়তম নারীটি হারিয়ে গেল জীবনের মতো, অথর্ব বৃদ্ধ হুঁকো হাতে কাত হয়ে শেষবারের মতো পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে আছে — রক্ত দিতে পারি — আমাদের জোর আমাদের রক্তে —

মুতুনকে কে আটকে রাখবে — এই মুহূর্তে মুতুন সেই চারণ — তার জিভ ঝুলে এসেছে, ঠোঁটের দুকোণে ফেনা, গলায় বাজ ডাকছে, লাল করমচার মতো চোখ — দুই হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ছে — আর তার কোমর ধরে লেপটে আছে রাজু, সেই কুকুরছানার মতো ছেলেটা —

আঁধার কাটছে, কুয়াশা ভেঙে তারা আসছে — কালকের রাত যাদের দু'চোখ নিদ্রাহীন। যাদের বুকের মধ্যে গোলা বারুদের বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত, যারা দেখতে

চায় বিপদের কদাকার বীভৎস মুখ সামনা-সামনি, যারা ভয়ে ভয়ে আঙুলের ডগায় তুলে নেবে, বড় আপনজনের রক্ত।

আস্তে আস্তে মানুষের পায়ের চাপে নড়ে উঠছে মাটি। ওরা ঘিরে দাঁড়ালে মৃতদেহগুলি কথা ক'য়ে উঠবে, তাদের চোখ অট্টহাসি হাসবে—

বিঃদ্রঃ—গল্পটি 'নৈশব্দের প্রহার' নামে গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়। লেখকের নামকরণ অনুসারে এই নাম পরিবর্তন।

আয়না

স্নেহশীলা পঞ্চমুখে লতার সুখ্যাতি করেন। তাঁর পরিচিত জনেরা অবশ্য আড়ালে নাক কুঁচকে বলে—"আদিখ্যেতা—দুটো দিন যাক না—"

লতা স্নেহশীলার পুত্রবধূ। একমাত্র ছেলে প্রসাদ। অনেক সুখে-দুঃখে মানুষ করেছেন তাকে। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই।—ভাল চাকুরে এখন। সমবয়সী, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে শুনে শুনে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন তিনি—টাকার গুমোর আছে এমন ঘরে কখনই সম্বন্ধ করবেন না, রূপের চাকচিক্য নিয়েও মাথা ঘামাবেন না।

ছেলের ওপরেও অগাধ বিশ্বাস ছিল—যেমন মেয়ে এনে দেবেন, তাকেই সে চোখ বুঁজে বিয়ে করে আসবে। পড়ার বই-এর বাইরের যে জগৎ সেখানে তার মায়ের আঁচলের আড়ালই ভরসা। সেই ছেলের বিয়েতে তিনবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, ঘটকও যাতায়াত করল। বাজিয়ে দেখতে গিয়ে কোনটা আর মনে ধরে না। অনেক পছন্দ হবার মত মেয়েও বাতিল করে দিলেন। শেষে এই সম্বন্ধটা এল। এলাহাবাদ থেকে এক আত্মীয়া জানালেন—'তেমন রূপের জলুস যদি না চাও তবে পছন্দ হবার মত মেয়ের সন্ধান দিতে পারি—টাকা পয়সাও নিরেস—'

স্নেহশীলা সে মেয়ে দেখলেন। খাঁদা-বোঁচা মুখের মাঝে বড় বড় দুটি চোখ শান্ত দীঘির মত। গোলগাল চেহারার সঙ্গে মানানসই পুরু ঠোঁটে হাসির ভঙ্গিমাটি ততোধিক লাজুক। এ মেয়ে বি-এ পড়েছে অনার্স নিয়ে ভাবাই যায় না। সবচেয়ে মনে ধরল ঘরময় শুচিস্নিগ্ধতা। ঘরে ওদের নিত্য দেবসেবা।

কপালে ঠাকুরের চন্দন, চুলের গোছায় আশীর্বাদী ধান-দুর্বো, পায়ে চওড়া করে আলতা, এনে যখন বসিয়ে দিল—সালঙ্কারা কন্যা নয়, পুজারিণী। স্বামী বা ছেলে কাউকেই নিয়ে যাননি, তবু সঙ্গে সঙ্গে কথা দিয়ে এলেন। দেনা-পাওনায় চাপ ছিল না—হাসিমুখে পুত্রবধূ ঘরে তুললেন। সব দিক দিয়েই লতা মনের মত হয়েছিল—তাঁর হাসি সে ম্লান করেনি।

বিয়ের পর স্নেহশীলা ঠাকুরের আসন পাতলেন। আগে এসব ছিল না, কিন্তু লতার আজন্মের অভ্যাস—ঠাকুরকে ফলজল না দিয়ে কিছু খায় না। ইদানীং স্নেহশীলা দীক্ষাও নিয়েছেন—একটু-আধটু উপোস-টুপোস করেন। তবে লতার মত

পাঁজিপুঁথি মেনে চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। প্রথম দিকে বেশ খানিকটা উৎসাহ বোধ করতেন — এখন ভিতরে একটু বিরক্ত হন। ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি থাক তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু মীরাবাঈ তো চাননি।

আবার বলবেনই বা কি? দুই হাতে লতা দশভুজা। সংসারের কাজেও একচুল এদিক-ওদিক নেই। ঘরদোর আয়নার মত, সাজানো-গোছানো। যে আসে সেই লতার চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে বলে — "একেবারে লক্ষ্মী এনেছে গো-ঘর — দোরের চেহারা পাল্টে দিয়েছে — বনেদী ঘরের সহবতই আলাদা —"

স্নেহশীলা এখানেই তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করেন। তিনি কোনদিনই গোছানি নন। ঘর-দোর দূরে থাক, গুছিয়ে রান্না-বান্নাটাও তাঁর ধাতে নেই। তারপর বংশপরিচয় ধরে টান! ওদিকে নিজের ছেলেই বলে — "অফিসের কেউ এলে এখন আর লজ্জা পেতে হয় না —" অসহ্য লাগে স্নেহশীলার, ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন — "কখন করব — তোকে ইস্কুলে দেওয়া-নেওয়া, অফিসের ভাত — একা হাতে কচিকাচার সংসার — নিপুণ করে ঘরে গোছাব, না সূচীশিল্প, লেসশিল্প চর্চা করব —"

মনে মনে সেইসব চিন্তাধারার মুণ্ডপাত করেন — হেন-তেন জানা মেয়ে খোঁজা — কত বড় আহাম্মক। বলেন — "আসুক না কোলে-কাঁখে বাচ্চা — দেখব কাঁথা কাচবে, না ঘর সাজাবে —"

স্বামী শশধর বিগলিত হয়ে বলেন — "তখন একটা লোক রেখে দেব — তাছাড়া তুমিও তো আছ — কি কাজ তোমার?"

স্নেহশীলা উঠে পড়েন। এখন মুখের মত জবাব যেটা তা হলো এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করলেন তিনি — তখন এই দরদ কোথায় ছিল?

বিয়ের আগে থেকেই প্রসাদ অফিসে একটা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। পাস করলে প্রোমোশন। বাড়িতে তার রাত পর্যন্ত পড়াশোনা, আবার অফিসের পর লাইব্রেরি, একজন অধ্যাপকের বাড়িতে যাতায়াত। ঘরে মন বসাবার গরজ বা অবকাশ তার কমই ছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল লতার আচরণ — তার দিক থেকেও যেন তেমন উদ্বেগ নেই স্বামীর মন জয় করার। ঠাকুর নিয়ে নাড়াচাড়াতেই মগ্ন।

স্নেহশীলা একে মন্দের ভাল ভেবেই নিশ্চিন্ত। দিনরাত গুজগুজ-ফুসফুস করে কান ভাঙ্গান বড় নোংরা অভ্যাস।

অবশ্য সন্ধ্যার পরে যখন পাটভাঙ্গা শাড়ি পরে ভিজে চুলে এলোখোঁপা শেডের আলোয় বই কিম্বা সেলাই নিয়ে বসে লতা, কপালে তার বড় সিঁদুরের টিপটি দপদপ করে জ্বলে। লতার এই নিবিষ্ট চেহারাটি স্নেহশীলার মন্দ লাগে না। অবশ্য সম্প্রতি ছেলের একটি মন্তব্যে তাঁর দেখার ভাবে একটা পরিবর্তন এসেছে।

সেদিন প্রসাদ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এল। চা-জলখাবার পৌঁছে লতা এসে যথারীতি বসেছিল ঠাকুর সেবায়। তিথি-নক্ষত্রের সেদিন ছিল অপূর্ব যোগাযোগ — তাই আয়োজনও ছিল বিশেষ। আশপাশের বাড়ি থেকে দু'চারজন

বয়স্কা মহিলা এসেছেন। ধূপধুনো, ফুলচন্দনের গন্ধে ঘরের মধ্যে কেমন একটা অনৈসর্গিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পারিপার্শ্বিকতা ভুলে মনের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা নিবেদনের ভাব। স্নেহশীলাও অভিভূত। লতা সন্ধ্যারতি দিচ্ছে — লতার সঙ্গে মৃদু গলায় ভজন কীর্তন গাইছেন সবাই।

এমনি মুহূর্তে প্রসাদ ঝনাৎ করে দরজা খুলে বিরক্ত হয়ে বলে — এমন — "আর কতক্ষণ চলবে তোমাদের —" তারপর চারদিক চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসেছিল, বলেছিল — "বাঃ, এ যে দেখছি হিন্দী সিনেমা — এসব কবে আমদানি হলো — জানিনে তো ?"

স্নেহশীলার খেয়াল হলো, লতার চুলে ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ছাপ, আলতা রাঙ্গানো পা, চোখে বিহ্বলতা। হঠাৎই যেন মোহের ঘোর কেটে গেল। বাস্তব জগতে ফিরে এলেন তিনি। একটা কোন সাদৃশ্য তিনিও খুঁজে পেলেন সিনেমার দৃশ্যপটের সঙ্গে।

"থাক্, বৌমা খোকা এসে বসে রয়েছে — আমি বরং ঠাকুর শুইয়ে দিচ্ছি।" লতার মুখে কেমন যেন ছন্দপতনের বিরাগ লক্ষ্য করে অবাক হলেন। তবে লতা বাধ্য মেয়ের মতই উঠে চলে গেল। এতগুলি বাইরের লোকের সামনে ছেলের ব্যবহার — মরমে মরে যাওয়াই উচিত ছিল তাঁর — কিন্তু আশ্চর্য যেন কোন গুরু দায়ভার থেকে মুক্তি মেলার মত এক অখণ্ড প্রশান্তি অনুভব করলেন স্নেহশীলা।

বেরিয়ে এসে দেখলেন রোজকার মত নত মুখে লতা সেলাই করছে — পাশে খোকা। রেকর্ডে একটা বাজনা বাজছে। মাঝে মাঝে নিচু গলায় হয়ত কিছু কথাও বলছে দু'জনে। আগের সেই বিতৃষ্ণার চিহ্নমাত্র নেই। স্নেহশীলা এখন নিজেকে বোঝাতে চান — যে বাড়ি থেকে লতাকে এনেছেন তাদের সন্ধ্যা তো এমনি ভজন-কীর্তন করেই কাটে। বোধহয় ওখানের পরিবেশে এটা তাঁর চমৎকার লেগেছিল। এখন কেমন সুর কেটে গেল। শশধর তো গোড়া থেকেই বলে এসেছেন — শাশুড়ি-বৌয়ে জমিয়ে পুতুল খেলা শুরু করলে দেখি ?" তখন তো গা করেননি তেমন।

একদিন লতা সকাল সকাল গা ধুয়ে এসে বলল — "মা আজ কিন্তু সিনেমায় যাব আমরা — ও টিকিট কিনে আনবে —"

স্নেহশীলা বললেন — "ওমা তাই — আমাকে তো কিছু বলেনি — বেশ তো — আমি এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি —"

লতা ঘাবড়ে গেল। তার একবারও মনে হয়নি শাশুড়ি সিনেমায় যেতে চাইবেন। ইতিমধ্যে প্রসাদ এসে পড়ল। বিব্রত মুখে লতা বলল — "মা যাবেন বলছেন — আমরা না গেলাম, বাবা মাকে পাঠিয়ে দাও — "

"মা পরে যাবে — আমি কালকেই টিকিট এনে দেব — ঝামেলা রাখ তো, তৈরি হয়ে নাও" — ঘর থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল — "তোমরা কাল যেও মা — আমি তো মোটে দুটো টিকিট এনেছি" — চুপি চুপি লতাকে বলল — "বইটা ঠিক মার সঙ্গে বসে দেখার মতো না — "

"এঃ বাজে বই—তাহলে আমিও দেখব না"—লতা আলমারীর ডালাটা ঝপ্ ক'রে বন্ধ করে দিল।

রাগে প্রসাদের আপাদমস্তক জলে গেল। "যত্ত ন্যাকামি, হিন্দি ছবি জীবনে দেখনি না?" ইচ্ছে হলো গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়—নিতান্তই রুচি আর শিক্ষায় বাধে তাই—।

"আমাদের বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার ছবি ছাড়া কেউ দেখে না—"

"হিন্দি সিনেমা মাত্রেই ঠাকুর-দেবতার ছবি—কোন্‌টায় নেই বলতে পার?"

আলাপ সবটাই শুনেছিলেন স্নেহশীলা। লতা ডগডগে সিঁদুরের টিপ পরে সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর কাঁধে রেশমী শাড়ির আঁচল ছড়িয়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মুখে স্নেহশীলার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রসাদ নামতে নামতে ওর হাতে ধরে টান দিল—"আমরা যাচ্ছি মা—"

স্নেহশীলা হাঁফাতে হাঁফাতে দোতলায় উঠে এলেন। জানলায় চোখ রেখে ছেলে বৌ-এর যাওয়া দেখতে দেখতে কটুকণ্ঠে বলে উঠলেন—"সবেতেই নাটক—"

"হলো কি"—শশধর চোখ কুঁচকে তাকালেন।

"এই তোমার ছেলে বৌ নিয়ে সিনেমায় গেলেন—" খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ডিবে থেকে একটা পান মুখে পুরলেন—ভাল ক'রে চিবিয়ে একমুখ পিক ফেলে বললেন—"বুঝলে তোমার ছেলে এতদিনে লায়েক হয়েছে—বৌকে এমন ছবি দেখতে নিয়ে গেলেন—যা নাকি মার সাথে বসে দেখা যায় না—" "সে তো বটে—" কিছু না ভেবেই বললেন শশধর।

"আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না পর্যন্ত। আজ তেনার ঠাকুর সেবা কে করবে—"

"অ্যাঁ, তোমার আঁচল কেটে ছেলে বৌ-এর আঁচলে উঠেছে—" নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠলেন শশধর।

ভ্রুকুটি কুটিল হ'ল স্নেহশীলার মুখ। মনে মনে ভাবেন লক্ষ্মীর মত যে মেয়েটিকে এনেছিলেন—সে সত্যি সত্যিই মীরাবাঈ নয়—

পরের সপ্তাহে অবশ্য দু'খানা টিকিট এনে বাবা-মাকে প্রসাদ নিজে হলে পৌঁছে দিয়ে এল। সঙ্গে লতাও এসেছিল—এখানে থেকে মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাবে ওরা। প্রসাদ বলেছিল—"ও তো কলকাতা দেখেনি—একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে নিয়ে যাই।"

স্নেহশীলা সিনেমায় আসতে চাননি। সাদামাটা মেয়েটা নাটুকেপনা দেখিয়ে তাঁর আত্মভোলা ছেলেটার মনে যে জায়গা করে নিয়েছে—এতেই বিস্বাদ হয়ে গেছে সব!

প্রসাদ উৎফুল্ল। প্রমোশন পেয়েছে। বাবাকে এসে বলল—কোয়ার্টারও পাবার কথা। সবাই একবাক্যে বলল—লতা বড় পয়মন্ত। লতার বাবাও চিঠি লিখে জানালেন লতার কুষ্ঠির অনুকূল ফলাফলের কথা। স্নেহশীলা মনে মনে গজরাতে লাগলেন। ছেলে তাঁর লেখাপড়ায় কোনদিনই খারাপ নয়। এতকাল পাস করল তবে

কার ভাগ্যে! দু'দিনেই ভাগ্যের ভাগীদাব পাল্টে গেল। যত্ত সব. কু-সংস্কার। লেখাপড়া জানা ঘরে এতো কুসংস্কাব থাকে কি কবে? কিন্তু ব্যাপারটা শশধর বা প্রসাদকে শোনাতে পারলেন না, কেননা দু'জনেই লতার কথায় ওঠে-বসে।

প্রসাদ বাবাকে এসে বলল—"দেখে আসবে চল-নতুন ফ্ল্যাট—চমৎকার খোলা-মেলা—"

শশধর রাজি হলেন না—"বড্ড দূব—এই বযসে এতো টানাপড়েন সহ্য হবে না। তুই বরং বাড়ি ভাড়াটা নে—"

প্রসাদ নাক কুঁচকে বলল—"দূব, এ বাড়িব ভাড়া—সে বিল কাউকে দেখানো যায় নাকি? কারুর ভাড়াব বিল পাঁচশ-সাতশব নিচে না—"

বাধা দিযে শশধর বলেন—"তাবা নতুন ভাড়াটে—আমরা ছেড়ে দিলেই এ-বাড়ি এখন"—

"সে হলো ফ্ল্যাট"—প্রসাদ বিবক্ত হযে বলল—"এমন বাবোযাবি, ক্ষযা, সাতপুবু স্যাঁতলাপড়া নয—"

স্নেহশীলা ঝামবে উঠলেন—বৌ নিযে আলাদা হবি-চলে যা না—" স্বামীকে বলেন—"ওসব কাযদা কৌশল আমাব খুব জানা—"

এপ্রসঙ্গ এখানেই চাপা পড়ে গেল। নিদারুণ অভিমানে প্রসাদ আব কোনদিন এ নিয়ে একটি কথাও তুলল না।

ছোটখাট বেসুর বেতাল সত্ত্বেও সুন্দর চলছিল সংসাব। চোখেব ওপরে ছেলেব আসকাবায় লতাব ডানা গজানো নজবে বেখেছেন স্নেহশীলা। তবে সংঘাত বাধেনি। পাড়ার লোকেব মুখে লতার প্রশংসায ডালপালা গজাচ্ছে। স্নেহশীলা হুঁ-হুঁ দিযে সেবে দেন। নিজের থুতু তো নিজে গেলা যায় না। আব বলাব আছেই বা কি?

ছুটিব দিন। খাওযা-দাওযা সাবা। শশধব ওষুধপত্র গুছিযে বসে সবে গলায জল ঢেলেছেন এমন সময দবজায সাইকেলেব ঘন ঘন ঘন্টি, গ্লাসেব জল চলকে গেঞ্জিতে পড়লো। চটি গলাতে গিযে তাড়াহুড়ায স্ট্র্যাপ ছিঁড়ল। বেসামাল অবস্থায দবজা খুললেন। তাঁর আশঙ্কাই ঠিক—টেলিগ্রাম। স্নেহশীলা ঘবে এসে দেখলেন শশধব শুযে আছেন। ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

"কে এল এখন—"

শশধব চোখ না ফিরিযে জবাব দিলেন—"টেলিগ্রাম"—

"টেলিগ্রাম, সে কি—কে করল—" উদ্বেগে গলাব স্বব বুঁজে এল।

"তোমার ছোট মেযে—"

এবার স্নেহশীলার বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল—"কি বললে—"

"কি আব বলব—" পাশ ফিরে শুযে বললেন—"যাকগে এখন বিশ্রাম নাও—খোকা আসুক—"

শশধর খোলসা করে বললেন না মেয়ে লিখেছে—"ভীষণ বিপদ, এখুনি এস—"

যাক, বললেই যায় না — উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় কাটল সেদিন। পরদিন সকালেই শশধর রওয়ানা হয়ে গেলেন — মেয়ের কাছে।

প্রসাদ সবে অফিসে বেরিয়েছে — স্নেহশীলা রান্নাঘরে, লতা বাথরুমে কাপড়চোপড়ে সাবান মাখাচ্ছে — দরজায় ডাক শোনা গেল — "মা" — রান্না উনুনে রেখেই স্নেহশীলা ছুটলেন — হাতের খুন্তি হাতেই রইল। বেরিয়ে এল লতাও। লতার ছোট ননদ বাসন্তী ঘরে ঢুকেই আছড়ে পড়ল — "আমার কি হলো মাগো — আমার কী সর্বনাশ হলো —"

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে স্নেহশীলা একটু একটু কাঁপছেন — লতা তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। অশ্রুভেজা ভাঙ্গা গলায় ঘড় ঘড় করে বললেন — "কী সব্বোনাশ হলো —"

লতা দেখতে পেল — দরজার বাইরে দুটি শিশু একটি সুটকেশ, কয়েকটি পোঁটলা টানাটানি করে আনার চেষ্টা করছে। সে গিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের ঘরে নিয়ে এল। দূরে এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল তারা। কচি মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

স্নেহশীলা প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছেন। বাসন্তী এখনও তীব্র সুরে চীৎকার করছে — "কেন এমন ঘরে দিলে — আমার এমন সব্বোনাশ করলে কেন? এখন আমি কি করি — গলায় দড়ি দিয়েও যে শান্তি নেই — পেটের শত্তুর আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে" — ক্রমে তার প্রলাপ অসংলগ্ন অর্থহীন হয়ে উঠছে — স্বরভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে —

স্নেহশীলা লতাকে বললেন — হাঁ ক'রে দেখছ কি — তাড়াতাড়ি যাও — তরকারি বোধহয় ধরে গেল" -- লতা বেরিয়ে যেতে আবার ডেকে বললেন—"এদের দুটো খেতে দিয়ে দাও।"

বাচ্চাদের স্নান করিয়ে খেতে বসিয়ে দিল লতা। ভিতরে তখন চিৎকার কমে এসেছে। বুকভাঙ্গা গুমরানো কান্নায় দুপুররে শুকনো বাতাস ভারী। ছেলেমেয়ে দুটির ভয় জড়ানো ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে লতা এক সময় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল —

"কি হয়েছে রে?"

"বাবা বিয়ে করেছে —" আধ আধ গলায় জবাব দিল বাসন্তীর ছোট ছেলেটি।

"সে কি —" বলেই নিজেকে সংযত করল লতা। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে বলল —"আয় ও-ঘরে শুবি।"

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার খুবই দেরী হল। অবিরাম কেঁদে চলেছে বাসন্তী। স্নেহশীলা কি সান্ত্বনাই বা দেবেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি বিমূঢ়। আর লতা কুঁকড়ে গেছে একেবারে।

স্নেহশীলা প্রথমটায় জামাইয়ের মৃত্যু সংবাদ আশংকা করেছিলেন — পরে সেটা অমূলক দেখে অনেকটা ধাতস্থ হন। তবে দ্বিতীয়বার বিয়ের সংবাদে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন — "হারামজাদাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা পণ আর পাঁচ ভরি সোনা

দিয়েছি — আবার বিয়ে বললেই হল — ছেলের হাতের মোয়া না ?"

"দুবার বিয়ে করার আইনই নেই — বিয়ে করলেই হ'ল ! আমিও দেখে নেব কেমন সংসার করে — আমার ঘরে যে আগুন দিয়েছে তাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব না" — বাসন্তী বড়াই করে বলে — "একদানা চালও রেখে আসিনি — ব্যাঙ্কের কাগজপত্রও নিয়ে এসেছি — ঘর তালা বন্ধ — এসো — সংসার কর — কেমন দেখি —"

সেদিন রাতে প্রসাদ ফিরে বাসন্তীকে দেখে হকচকিয়ে গেল — "সে কি ! বাবাকে যে পাঠালাম — কি হবে বুড়ো মানুষটার — থাকবে কোথায়, খাবে কি ? — কথাটা অন্য কারো মনে হয়নি এমন নয় — কিন্তু জিজ্ঞেস করার অবস্থা ছিল না। এসে থেকে বাসন্তী যে রকম পাগলের মত উথাল-পাথাল করছে। শ্রান্ত স্নেহশীলা বললেন—"সেই তো, ডাকব নাকি বাসন্তীকে—"

বাসন্তী নিজেই এসে কেঁদে পড়ল — "কি হবে দাদা আমার —" বলল — "বাবার কোন অসুবিধা হবে না—পাশের বাড়ি চাবি আছে।" কাজের মেয়েটিকেও বলে এসেছি একবার করে খোঁজ নিতে যদি মনোজ আসে।

প্রসাদ জানতে চাইল — "মনোজ বাড়ি থাকে না —"

"থাকে তো — ক'দিন আগে স্কুলের কাজে শহরে যাচ্ছি বলে গেল — তারপরই একজনের কাছে শুনলাম — বিয়ে করেছে —"

"একেবারে বিয়ে করে ফেলল — সত্যি খবর তো ?"

"হ্যাঁ সত্যি —"

"তুই কিছু জানতিস না —" বাসন্তী মাথা নিচু করে থাকে। তার চোখ এখন শুকনো, মুখ কালিমাথা। স্নেহশীলাই বলেন — "জানতে কি কিছু বাকি থাকে — বাঁদরটা মেয়েদের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি একটু করতই — তা বলে বিয়ে করে ফেলবে — দু'দুটো ছেলেমেয়ের বাপ — "

বাসন্তী সহসা ভেঙ্গে পড়ল — আমি কেস করব দাদা — ওকে পথে বসিয়ে ছাড়ব" — বলেই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল — "এর চেয়ে যে বিধবা হওয়াও ভাল....."

স্নেহশীলা তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরতে গেলেন। ছিটকে সরে গেল বাসন্তী। চেঁচিয়ে বলল — "একশবার বিধবা হওয়া ভাল-লোকে বলবে নিয়তি, কিন্তু এখন" — আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে।

প্রসাদ এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাতে রাখল।

"দূর এ তো হামেশাই হচ্ছে — আয় বোস, মাথা খারাপ করিস না — শোন, অবস্থাটা বুঝতে হবে তো — ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক নয়। কেস করবি যে বলছিস — বাচ্চা দুটো রয়েছে না — তাদের ভবিষ্যৎ —"

"যে বাপ আবার বিয়ে করে সে দেখবে ছেলেমেয়ে ? —"

প্রসাদের চোখ সহসা আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লতার মুখ ঘুরে এল। তার নিষ্প্রাণ মুখ প্রসাদকে চমকে দিল।

বোনের মাথায় হাত রেখে একটু ইতস্তত করে বলল—"ঠিক আছে তুই ভাবিস না, ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে"—

লতাকে বলল—"সে দুটো গেল কোথায়—"

"ঘুমিয়েছে—" হালকা ক'রে বলল লতা।

"বাঃ এত তাড়াতাড়ি!"

"কি আর করবে"—স্নেহশীলা বললেন—"ওরাও তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে—"

"দাদা—" বাসন্তী ঝাঁঝাল গলায় বলল—"তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস—দিব্যি মোলায়েম করে শুরু করেছিলি—"

প্রসাদ চমকে যায়—সেই আদুরে ছোট্ট বোনটির বদলে একজন পরিণত মনের মানুষকে দেখতে থাকে। আঘাত মানুষকে কি এমনি করেই জীবনের পাঠে দ্রুত শিক্ষিত করে তোলে!

"তুই ভয় পেয়ে গেছিস—" শক্ত হয়ে উঠেছে বাসন্তীর চোয়াল।

"পেলে আর দোষ কি—আমাদের যে উভয় সঙ্কট—"

"তা নয়, তুইও পুরুষ মানুষ কিনা—তাই নিজেদের দিকে ঝোল টানছিস—" ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল তার গলায়।

প্রসাদ আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলল—"বেশ তাই না হয় হ'ল কিন্তু তুই যে আমার বোন—তোর ভাল-মন্দও তো আমাকে দেখতে হবে—"

আমি কি—ওর জেল হোক—ফাঁসি হোক—আমার কিসের কি—" বলতে বলতে ওর গলা ভারী হয়ে এল—

"চাকরি যাবে যে—সে তো জেল ফাঁসির বাড়া—বাচ্চা দুটো নিয়ে তোর অবস্থা কি দাঁড়াবে—"

বাসন্তী মুখ ঘুরিযে চলে যেতে যেতে বলে—"অন্তত তোর অন্ন ধ্বংস করব না—আমি চাকরি করব—"

প্রসাদ রাগ সামলে নিল। লতা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত দুর্বোধ্য সে ভাষা।

বাসন্তী অবুঝ। সে রাতে রাগ করে খেতে এল না। লতা, স্নেহশীলা এমন কি প্রসাদের ডাকেও সে সাড়া দিল না।

পরদিন সকালে কাগজ দেখে লাফিয়ে উঠল প্রসাদ। "মা, মনোজকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে—"

স্নেহশীলা বললেন—"বেশ করেছে—"

"বাসন্তী তো বলেনি—ও থানায় ডায়েরি করে এসেছে—এখনকি করি—" প্রসাদ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে—

"মরুক পচে, কিছু করতে হবে না—" ঝাঁঝিয়ে ওঠেন স্নেহশীলা।

"মনোজের দাদারা কি—"

"থাম তো—তুই দেখি মনোজের জন্যে হেদিয়ে যাচ্ছিস—"

"হবে না পুরুষ মানুষ তো—" বাসন্তী এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রসাদ কথা বাড়ায় না।

স্নেহশীলা ভেবেছিলেন মেয়েকে না পেয়ে পরের দিনই হয়ত শশধর ফিরে আসবেন। কিন্তু একটা একটা করে দিন পার হয়ে যাচ্ছে—মানুষটার দেখা নেই। ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছেন তিনি।

জামাইয়ের ওপরে প্রথমটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও বাস্তববোধ তাঁর একেবারে হারিয়ে যায়নি। তিনিও বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাচ্চা নিয়ে অল্পবয়সী বাসন্তীর সারাটা জীবনের ছবি মনের কোনে উদ্বেগের ঘন মেঘ জমিয়ে তুলছিল। তিনিও জানেন চাকরি বললেই চাকরি হয় না। তার ওপরে মেয়েকে তো তাঁরা চাকরির উপযোগী করে গড়ে তোলেননি। কেবল উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছিল—কলেজে ভর্তি করাও হয়নি। কি কাজ পাবে ও!

বাসন্তীকে সেকথা বলতে গিয়ে মুখঝামটা খেলেন।

বাড়ির পুরানো ছন্দ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। পুজোপাট শুধুই নিয়মমাফিক—সময় কম। স্থানাভাবও একটা কারণ। এক ঘরের মধ্যেই এখন বাসন্তী আর তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্নেহশীলা থাকেন। ঠাকুরের সিংহাসন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ঠেসে-ঠুসে খাটের নিচে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কোনমতে একটুখানি আসন বিছিয়ে জপ করেন স্নেহশীলা, ফল-জল পৌঁছে দেয় লতা। তার হাতেই এখন বাচ্চাদের ভার। বাসন্তী সারাদিন উদভ্রান্তের মতই কাটায়। সবেতেই তার বিরক্তি, রাগ, একটুতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। বাচ্চাদের নিয়ে সময় কাটাতে লতা বসেছিল লুডো নিয়ে। অজানা আতঙ্কে গুটিয়ে থাকা ওদের মনটাকে উৎফুল্ল করে তুলতেই চেয়েছিল। বাসন্তী ছুটে এসে লুডোর বোর্ড উল্টে ছেলেমেয়ে দুটোকে এলোপাথাড়ি মারতে মারতে নিয়ে গেল—"পড়তে বসো গে—যমের অরুচি—মামার ভাতে চিরকাল পেট ভরবে না—বাপে না দেখলে কেউ দেখবে না—"

লতাকে শুনিয়ে বলে—"এতই যদি দরদ, নিজে তে লেখাপড়া জানে—ওদের নিয়ে একটু বসলেই পারে—ওদের যে ইহকাল পরকাল দুই গেল—"

ওর কাণ্ড দেখে স্নেহশীলাও ক্ষুব্ধ হন। দুধের বাচ্চা দুটোর ওপর দিয়েই যেন শোধ তুলছে বাসন্তী। সর্বদা আতঙ্কে আড়ষ্ট করে রেখে এক নিষ্ঠুর তৃপ্তি।

পাঁচ-ছয় দিনের মাথায় ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন শশধর। স্নেহলতা নিঃশব্দে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রসাদকে। লতা চা দিতে এসে শ্বশুরের চেহারা দেখে চমকে গেল। চোখ-মুখ একেবারে বসে গেছে, রুক্ষ চুল, ময়লা জামা-কাপড়, কে যেন একপোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে গায়ে। খুব একটা দুঃসময়ের মধ্যে কেটেছে

বোঝা যায়। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে লতার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন। বুকভাঙ্গা আর্তনাদের মত সেই বিপন্ন হাসিতে লতা যেন নিজের বাবাকেই দেখতে পেল।

ঝাপসা গলায় স্নেহশীলাকে বললেন — "আমাদের ভাগ্য, কেঁদে আর কি করবে —"

শশধর পৌঁছেই জানতে পারলেন মনোজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। থানা-পুলিশ করে উকিল ধরে জামাইকে পরদিনই জামিনের ব্যবস্থা করলেন। মনোজ কিন্তু তাঁকে দেখে সেই যে গা ঢাকা দিল আর দেখা হয়নি।

মনোজের গ্রেপ্তারের খবর রটে যেতে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি জরুরী সভা ডেকে তাকে সাসপেন্ড করেছে। মেয়েটি ওই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্রী। তার বাড়ি থেকেও একটা কেস করেছে। শশধর স্কুলের হেড ·মাস্টার, সেক্রেটারি, স্থানীয় দু'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গেও দেখা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে শাস্তি হয়ে গেলে মনোজের চাকরি থাকা মুশকিল। আর কেস যতদিন চলবে — ততদিন সে সাসপেন্ডও থাকবে। মনোজের সঙ্গে দেখা করার নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, সফল হননি। তবে একজনের মারফত তিনি কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। মেয়েটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। দু'জনে যা হোক করে চালিয়ে নেবে। মরবে তাঁদের মেয়েটি। দুটো বাচ্চা নিয়ে স্বামীর উপার্জনে বঞ্চিত হয়ে বাকি জীবন কি করে কাটবে? একটা বুক চাপা অস্বস্তিতে একে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে সবাই। একসময়ে গুমোট ভেঙ্গে শশধর বলেন — "দেখি, গামছা-টামছা দাও তো মা — স্নান সেরে আমি আর এককাপ গরম চা খাব কিন্তু —"

প্রসাদও উঠল। স্নেহশীলা বলে উঠলেন — "কোথায় যাচ্ছিস —"

"যাই, অফিসের কাগজপত্র সেরে রাখি —"

"আমার তো পা বাড়াবার পথ নেই — জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে একাই বসে থাকতে হবে! এ আগুনের ফুলকি মেয়েকে আমি কোন্ মুখে বলব — তোর শূন্যি ঘরে ফিরে যা —" ডুকরে ওঠেন স্নেহশীলা

প্রসাদ পাথরের মত ঠাণ্ডা গলায় বলে, "ভেবে তো কাজ করতে হবে মা —"

শশধরকে দেখে আরও গুম মেরে গেল বাসন্তী। বাবাকে একবার বলেছিল — "দেখে এলে পটের বিবিকে —"

শশধর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন — "রাগ-দ্বেষ দমন করতে শেখ মা — সুখ কারো চিরকাল থাকে না —"

ছিটকে সরে যায় বাসন্তী — "এটুকু সুখ কার না থাকে বাবা — আমারই বা থাকবে না কেন"?

স্নেহশীলাও বোঝাতে চান — "একটু ধৈর্য ধর — ঠাকুরকে ডাক-তিনিই তোকে বল-ভরসা যোগাবেন।" শেষের কথাগুলো কেমন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। নিজেই যেন তেমন জোর পান।

ঠোঁট উল্টে বাসন্তী বলে—"অমন ছেঁদো কথা সবাই বলে—ঠাকুর আগে দেখলেন না কেন—কে মানা করেছিল—"

স্নেহশীলা গৃহের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য অষ্টপ্রহর করতে চান। গুরু পরামর্শ দিয়েছেন। বাসন্তী বেঁকে বসল। "ঠাকুর-দেবতার হাতের বার মা—মিছিমিছি পয়সা নষ্ট।"

স্নেহশীলা মেয়ের কথায় রুষ্ট হন। আবার কি এক অনিশ্চয়তার চাপে অসহায় বোধ করেন। কি করবেন তিনি এই কোলপোঁছা মেয়েটিকে স্বস্তি দিতে? কি করতে পারেন!

প্রসাদ বাসন্তীর সঙ্গে কেস-পত্তর নিয়ে আলোচনা করে—"যে দেশে জন্মেছিস—তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো! ছেলেমেয়ের ভার নেবার মত উপার্জন যদি তোর থাকতো, স্বাধীন থাকতে বাধা কোথায় ছিল বল! বেকার মা তো সন্তান কাছেই রাখতে পারে না, পারে তার চাকুরে বাবা। শতকরা নব্বুই জন মেয়েই তো সন্তান কাছছাড়া করার ভয়ে কোর্টেই যায় না! ছেলেদেরই চাকরি নেই মেয়েরা আর কাজ পাবে কোথায়?"

তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে বাসন্তী—যেন সে জরীপ করছে দাদার কথাগুলো। ভিতরে ভিতরে স্নায়ুতে টান পড়ে প্রসাদের। তবু মুখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে বলে যায়, "চাকরি-বাকরি কবে কোথায় মিলবে সবই অনিশ্চিত—তুই বরং একটা কোন ট্রেনিং-এ ঢুকে যা।"

শেষে হোঁচট খেতে হ'ল ছেলেমেয়ের প্রশ্নে এসে। বাসন্তী ক্ষেপে গিয়ে বলল—"ওরা কি সৎমার ঘরে চাকর খাটতে যাবে—"

"এখানেই তো আছে—"

"এখানে দু'দিন বাদে তোদের চক্ষু-শূল হয়ে উঠবে না? তোর ঘরেও বাচ্চা আসবে তো—"

শশধর ভিজে ভিজে নরম গলায় বলেন—"একটা মিটমাট করে ফেলি কি বলিস। মনোজকে জানিয়ে দি, তুই তোর বাড়িতে যেমন ছিলি তেমনি থাকবি—"

শুনে বাসন্তী উন্মাদের মত দাপাদাপি কান্নাকাটি জুড়ে দিল। প্রচণ্ড আক্রোশে সাপিনীর মত বিষাক্ত দংশন করে বসল, "আমরা বড্ড বেশি খাচ্ছি সেটাই খোলাখুলি বল না—"

মনের কষ্টে শশধর অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। মুখে হাসি নেই, কথাও তেমন বলেন না। সারাদিন অন্যমনস্ক— কোথায় কোথায় ঘোরেন—বাড়ির মধ্যে হাঁফিয়ে ওঠেন যেন। পার্টটাইম কাজ খুঁজছেন, মেয়ের খরচ চালাতে। দারুণ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে তাঁর অফিসের বন্ধুরা একদিন পৌঁছে দিয়ে গেল। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিলেন। গুরুতর কিছু তেমন ধরা না পড়লেও মানসিক উদ্বেগ উপশমের চেষ্টা করতে বললেন।

বাড়িতে সবচেয়ে অসুবিধা দেখা দিল শোবার জায়গার। বাচ্চা দুটোকে লতার

ঘরের মেঝেয় বিছানা করে দেওয়া হ'ল। বাসন্তী খিচ্‌খিচ্‌ করে, ওদের তো মেঝেয় শোয়ার অভ্যাস নেই, নিমুনিয়া না ধরলে বাঁচি—

স্নেহশীলা প্রসাদকে ডেকে চুপি চুপি বলেন, "তোর সে ফ্ল্যাটের কি হ'ল—" খুবই কুণ্ঠিত তিনি।

"কেন?" বিস্মিত হয় প্রসাদ।

"তোরা না হয় গিয়ে থাকতিস—"

"সামলাতে পারতে তুমি? মুহূর্ত থেমে প্রসাদ বলল,—তাছাড়া সে তো আমি তখনই ছেড়ে দিয়েছি—"

স্নেহশীলা চুপ করে গেলেন—ভাঙ্গাচোরা জবুথবু—বাজে পোড়া গাছ যেন।

প্রসাদ মার মনের ভাব বুঝতে বলে—"আমার এক উকিল বন্ধু বলেছিল—স্বামী-স্ত্রী যদি টানা দু'বছর একসঙ্গে বাস না করে—তা হলে নাকি এমনিই ডিভোর্স হয়ে যায়—"

স্নেহশীলা চোখ বড় বড় করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "মনোজের তো একটা বাড়ি আছে, এভাবে ডিভোর্স হ'লে—তাতেও ওর কোন অধিকার থাকবে না—"

স্নেহশীলার গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। শরীর এলিয়ে পড়ল মেঝেয়—"ওরে শত্তুর, কেন তোকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলিনি, আমায় আর দগ্ধে মারিস নে তোরা, একেবারে মেরে ফেল—"

প্রসাদ কয়েক মুহূর্তে কালো মুখে মায়ের কান্না দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর সরে আসে।

স্নেহশীলা নতুন করে মেয়েকে শুনিয়ে বলেন—"কেস করে কি হবে?

মেয়েছেলের শেষ আশ্রয় স্বামীর ঘর, স্বামী ত্যাগ করবি, নিজের ঘর পরের হাতে তুলে দিবি?"

বাসন্তী হাসে—"আমি দেবার কে? সংসারে মেয়েদের যেন কত অধিকার?" লতার কাছে গল্প করে—"আগের দিন রাতেও ছেলেমেয়েদের সাতে কি হুল্লোড়—তুই যদি দেখতিস—ভীষণ হৈ-হল্লা ভালবাসে—এক মিনিট তুই ওর সামনে মুখভার করে থাকতে পারবি না।—বসে বসে শহর থেকে কার জন্যে কি আনবে তার ফর্দ করল—আমাকেও বলল—"

বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলল, "তখনও ঘুণাক্ষরেও জানি না"—ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—"মানুষটাকে চেনা যায় না রে, যেখানে যেমন সেখানে তেমন—"

স্তব্ধ হ'য়ে গেছে লতা। গুরুতর ওলট-পালট চলছে তার ভিতরে। "নিরপরাধের শাস্তি, মেয়ে হয়ে জন্মানোর এই জ্বালা—" মার চিঠি এসেছে। বাবা লিখেছেন—"ভগবানের কাজের বিচার করবে কি মানুষ! তাঁর দেওয়া দুঃখ মাথা পেতে নিতে হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাঁর বিরুদ্ধে নশ্বর ক্ষুদ্র মানুষের কি লড়াই চলে?" তবে কি অন্যায়ের বিচার নেই!

লতা জানতে চেয়েছিল—"আমারও যদি এ অবস্থা হ'ত, তাঁরা কি তখনও নতমস্তকে মেনে নিতেন, কোন প্রতিবাদই করতেন না?" জবাব এসেছে—"ছিঃ মা, ওকথা মুখে আনাও পাপ—কত পুরুষ ধরে ঠাকুরের সেবা করে আসছি—" লতার চোখে ভেসে উঠেছে সেই পিসির মুখ—যে গায়ে আগুন ঢেলে আত্মহত্যা করেছিল। কি বলেছিলেন তখন তার বাবা সে তার মনে থাকার কথা নয় এখন।

উত্তপ্ত ক্ষুব্ধ মনকে বারবার সংযত করতে ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতে চেয়েছে সে। বাসন্তীর তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে—"তোরা সেবায়েত বংশ, ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ বাঁধা, তবে দিনে দিনে দুর্দশায় ডুবছিস কেন? তাকিয়ে দেখেছিস কখনও কাদের আজকাল রমরমা। তারা সব নিষ্পাপ যীশু না?"

ঠাকুরকে স্নান করাবে, শোয়াবে কি—বাসন্তী বুকের মধ্যে বলতে থাকে—"ও তো পাথর—ওতে কি চেতনা আছে?" ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঐশ্বরিক শক্তির বিরুদ্ধে তার এ জেহাদ—চরম আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া! উত্তেজনায় হাত কাঁপে লতার—"সত্যিই পাথর, কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই! ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতাও নেই। পাপপুণ্যের বিচার নেই! প্রসাদ ওকে বলেছিল—"সারা পৃথিবীতে নানান মানুষের নানান চেহাবার ভগবান। কিন্তু দুঃখের চেহারা সব জায়গায় এক—"

লতার ত্রস্ত সংকুচিত ভঙ্গী, বিবর্ণ নিষ্প্রভ দুটি চোখ প্রসাদকে বিব্রত করে। একদিন জোব করে কাছে টেনে নিয়ে বলে, "আমি তো বিয়ে করিনি। তুমি এমন মুখ কালো করে থাক কেন?"

লতা দেখছিল জানলায় একটা ছায়া স'রে যেতে। বলল, "ওকথা বলো না। ছোড়দি শুনলে কষ্ট পাবে—" নিজেকে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়ে নিয়েছিল—"কেউই তো আমরা হাসছি না, আয়নায় দেখেছ নিজের মুখ—"

প্রসাদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লতাও ভাবছে!

কলকাতায় কেসটা সরিয়ে আনা হয়েছিল। মনোজ একবার প্রসাদের অফিসে এসেছিল মিটমাটের আশায়। বলেছিল, "বাচ্চা দুটোকে না দেখে সে থাকতে পারছে না।" শুনে বাসন্তী কদর্য ভাষায় গালাগালি করেছে।

এদিকে উকিল ভদ্রলোকও বাসন্তীকে বললেন,—"শুধু পয়সা নষ্ট মা, কাজটা বেআইনী ঠিকই। জিতে গেলেও লাভ কি—স্বামীকে তো ফেরাতে পারছ না—তুমি আমার মেয়ের মত—আমি বলি কি—"

বাসন্তীর পাথুরে মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক গলা পরিষ্কার করে নেন—"মানে, আমি এই পরামর্শই দেব-উনি যখন এগিয়েছেন—"

বাসন্তী সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়, "সে তো টাকার টানাটানির জন্যে। ব্যাঙ্কের বইটই তো আমার কাছে—"

ভদ্রলোক শশধরের দিক তাকিয়ে কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ করেন, "একটা মিটমাট করে ফেলুন—"

বাসন্তী ঝট্‌ করে দাঁড়িয়ে পড়ে—"বাবা" কেউ যেন তার মুখের উপর চাবুক মেরেছে—এমনি নীল হয়ে গেছে সে।

সেদিন শশধর ওকে নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে আসেন।

প্রচণ্ড আত্মসম্মানে লেগেছে বাসন্তীর। দু'চোখে আগুন জ্বেলে লতাকে বলে—"বল, একি মেনে নেওয়া যায়? আমি ওদের নিয়ে বিষ খেয়ে মরব, তবু—"

লতা দেখেছিল, ছলছল চোখের তলায় তার ঋজু মেরুদণ্ড, তার অনড় আত্মপ্রত্যয়। এই পরাজয়ের লজ্জা সে কখনও মাথা পেতে নেবে না। এ প্রস্তাব তো মনোজ প্রথম দিনই পাঠিয়েছিল।

চুম্বকের মতই লতাকে আকৃষ্ট করে বাসন্তীর বলিষ্ঠতা। তার হিংস্র মতামত তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেঁধে ঠিকই, অথচ তার মধ্যেই সে অকূল সমুদ্রে একবোরে নিরেট মাটির গন্ধ পায়। যেন নরকের আগুন মুক্তি পেতে দেখে, পালাতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই উত্তাপ উগ্র আরকের মত ধমনীতে সঞ্চারিত করে, সেও একখণ্ড কুলিশ পাথরে রূপান্তরিত হতে চায়।

স্নেহশীলা মেয়েকে বোঝান, "নিজের সংসারে জাঁকিয়ে বসে থাক। কে ঢুকবে, ঢুকুক দেখি! তাছাড়া বাড়ি তো তোর, তোর ছেলেমেয়ের, তাদের খোরপোশ—"

বাসন্তী উঠে চলে যায়। জবাবই দেয় না।

অথচ প্রতিরোধের দেওয়ালটা ভিতর থেকেই ক্ষয়ে আসে—অলক্ষ্যে। অথবা জীবনের কঠিন বাস্তবতা তাকে পিষে ফেলতে থাকে। বাসন্তী ধীরে ধীরে নিবে আসে। নিস্তেজ নির্বিষ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। শশধর ওকে শক্তি দেন, সাহস জোগান, 'ভাবনা কি তোর—আমি তো একটা কাজ পেয়েছি। স্বচ্ছন্দে চলে যাবে তোর। বাচ্চা দুটোর পড়া নষ্ট হচ্ছে—"

একদিন ক্লান্ত, মর্মাহত, হতশ্রী বাসন্তী নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়। যাবার আগে লতাকে জড়িয়ে ধরে বলে—"ঘেন্না, ঠিউশানী করব, জামা-কাপড় সেলাই করব, না হলে লোকের বাড়ি গতর খাটাব, তবু ওর পয়সা ছোঁব না। তুই দেখে নিস আমার বাড়িতে পা দিতে দেব না—"

বাসন্তী চলে যেতে লতাও বাপের বাড়ি গেল। প্রচণ্ড মানসিক টানাপড়েনে সে দিশেহারা। শশধর দারুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ কর্ম করছেন। কিন্তু ঘরে ফিরেই ঝিমিয়ে পড়েন। গভীর অবসাদে ডুবে যান। স্নেহশীলার মধ্যে কেমন বৈকল্য দেখা দিয়েছে। কাজ করছেন তো করছেন। বসে আছেন তো আছেন। ডাকতে হয়, বলতে হয়। একদিন লুচি ভাজতে বসেছেন, ভেজেই যাচ্ছেন। প্রসাদ অফিস থেকে ফিরে বলে—"এ কি করেছ? কে খাবে?

"কেন তোরা বসে যা। গরম গরম, দ্যাখ কেমন ফুলছে?"

তাঁকে এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখছেন ডাক্তাররা।

লতাকে আনিয়ে নিতে হ'ল। জীবনের চিরাচরিত ছন্দ হাঁরিয়ে সে এখন সচল কলের পুতুল। আগের মত ঠাকুর সেবায় আর প্রশান্তি নেই। বাসন্তীর কথাগুলো

ঝাঁঝর হয়ে এখনও ঝনঝন করে বাজে। শিরদাঁড়া বেয়ে অজনা শঙ্কা শিরশিরিয়ে ওঠে-নামে। সন্দেহের বীজ মস্তিষ্কের কোটরে বংশবৃদ্ধি করে। হাতের প্রদীপ থেমে থাকে, স্তোত্র-শ্লোক ভুল হয়ে যায়। আনমনা লতা প্রাণহীন খড়ের পুতুল।

মেয়ে জন্মের সার্থকতা স্বামীর ঘর-আজন্মের সংস্কার ঘেরা স্বপ্নের সেই মনটা শুকিয়ে আসছে। কেউ যেন শিকড়টা টেনে উপড়ে দিচ্ছে। মা-ঠাকুরমার সেই শিক্ষা, সকলের সাথে মিলে-মিশে সুখে দুঃখে মাটির মত বুক পেতে রাখা, কোথায় পাওয়া যাবে সে ঘর!

বাসন্তী এসে বারবার সাবধান করে গেছে—"একফোঁটা বিশ্বাস করবি না। খবরদার, আঁচলের গেরোটা ফসকালেই সোনা কাচ—"

লতা মনে মনে হাসে, "গেরো দিয়ে কি কিছু রাখা যায়? মন কি বেঁধে রাখার?"

কিছুদিন ধরে স্নেহশীলা খানিকটা সুস্থ। সংসারের দৈনন্দিন চাকাটা মসৃণ হয়ে এসেছে। সকালবেলার তোড়জোড় শেষ। প্রসাদ বেরিয়ে গেছে। শশধর তৈরি হচ্ছেন। লতা নিজের ঘরে। স্নেহশীলা বারান্দায় মশলাপাতি ঝাড়াবাছা করছেন।

বেরুবার মুখে শশধর ডাকলেন—"বৌমা—তোমার চিঠি—"

লতার হাতে চিঠিটা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একঝলক হেসে লতা বলল—"বি টি'তে ভর্তির জন্য বাবা—"

"সে কি পেটে বাচ্চা নিয়ে—" বলতে বলতে স্নেহশীলা থেমে গেলেন—বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

"তা হোক", রুদ্ধ অস্পষ্ট গলায় বললেন শশধর, "একটু কষ্ট হবে, তা হোক"।

ইয়াদ

ঘরের ভিতরে অন্ধকার। ভর দুপুরের রোদ মাথায় করে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একটু সয়ে আসতে কাঁথায় কাপড়ে পড়ে থাকা চিমসে দেহটা নজরে পড়ল। ঘরে একটা চাপা বোটকা গন্ধ দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে গেল খাদেজা। ঘরেরই বা কি হাল। যে ঘর ছেড়ে সে একদিন পথ ধরেছিল—তার আর কিছুই নেই। ইটের গাঁথনিতে তখন পলেস্তারার জলুস ছিল। বছর বছর রঙ ফেরান হত। দেওয়াল জোড়া মস্ত নক্‌শা কাটা খাট। ঝকঝকে পিরিচ পেয়ালা ছিলেকাটা কাঁচের গ্লাস, জয়পুরী আতরদান, কাঁচের আলমারী সাজানো। ঘরের বাতাস ভরে থাকত আতর গোলাপের খুশবু।

দোর ঘেঁষে বসল খাদিজা। যেমন বসেছিল প্রথম দিন এ বাড়িতে এসে। অনেকটা পথ আসতে হয়েছে, নাস্তা সারা হয়নি। আর দাঁড়াতে পারছে না। নাসেরেরও দেখা নেই—তাকে রেখে সে যে সেই বেরিয়ে গেল। এক ঘটি পানি দিতেও কেউ নেই।

রাতে নাসের খাবার পাতে জানাল—কাল ভোর ভোর যাব।

খাদিজা ছেলের মুখে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, বাপকে ইয়াদ হয় তোর—ছেলে তখন তখনই কোন কথা বলেনি। খানিক পরে বলল—কি ইয়াদ থাকবে—একরাম চাচা বলল, যা দেখে আয়, ততক্ষণে পাত ছেড়ে উঠে পড়েছে সে।

ছেলের পাতেই দুমুঠো ভাত নিয়ে বসল খাদিজা। একটা জীবনে কত স্মৃতি, সব বুকের উপর জুড়ে থাকলে মানুষ কবেই মরা নদী হয়ে যেত। স্মৃতি তলিয়ে থাকে। নাড়াচাড়া পেলেই ভেসে ওঠে। নাসেরের বাপকে ইয়াদ করতে গিয়ে দু-দুটো সন্তানের রোগ কাতর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। মরণের আগে মাকে আঁকড়ে সেই করুণ গোঙানি শুনতে থাকল। তার বুকের মধ্যে একটু একটু করে হিম হয়ে নীল হয়ে যাচ্ছে কচিটা। আনচান করে উঠলো শরীর। ভাত আর মুখে তোলা হল না। অনেকদিন পর আবার সে তাদের জন্য কাঁদতে বসল।

এই ঘর এই দুয়ার—একগলা সুখের মাঝেই তাকে এনেছিল হায়দার মিঞা। জনমুজর বাপের কচি মেয়ে জোয়ান রাজমিস্ত্রির চোখে ধরে গেল। লোকটাকে এনে নাপ ডাকত, খাদু বদনা দিয়ে যা। কোথায় খাদিজা! মা বাপের দোমনা—সে আর

টিকল কই। গরিব ঘরের কাঁচা বয়সের কন্যে চেরাগ বাতি। মালিকের খুশমর্জির আলো। আজ কুলুঙ্গিতে কাল আস্তাকুড়ে।

যেদিন এল এ বাড়িতে অবোধ ব্যাকুল মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা। অসহায় চোখে যেদিকেই চায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। এতটুকু মমতার ছোঁওয়া কোথাও নেই। কখন অন্ধকার নেমেছে। লোহার থাবায় জোয়ান হায়দার তার কিশোরী দেহটাকে ঘরের ভিতরে টানছে, আর প্রাণপণে দরজার কবাট আঁকড়ে আছে সে। ঘরের ভিতরে বাতিদানে বাতি জ্বলছে, খাটের মোটা বাঘনখ পায়া, রঙচঙে চাদর, বলিশের ঝালর — আর সব জুড়ে কটু পুরুষ গন্ধ ছড়িয়ে একটা দানোর মত দাঁড়িয়ে আছে হায়দার। ভয়ানক ভাবে কেঁপে উঠে খাদিজা। নিজেকে কপাটের গায়ে প্রাণপণ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে উঠেছিল, সামলে নিয়ে ঠিক হয়ে বসল।

ঘুঁটে কুড়েনীর মেয়েকে পয়সার মুখ দেখিয়েছে। আবেগে আহ্লাদে গলে গিয়ে মেয়েটা আপনি এসে গড়িয়ে পড়বে ভেবেছিল হায়দার — বেয়াদপ মেয়েটা যে বেঁকে দাঁড়াবে এ তার ধারণার অতীত। জান্তব রাগে, বিতৃষ্ণায় খাদেজাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দরজা এঁটে দিল। সেখানেই ঘুমিয়েছে সে, বারান্দায়, আর সকাল হতে ফুলে ফুলে কেঁদেছে — মার কাছে নে চলেন, মার কাছে —

কোনদিন আর মার কাছে যায়নি খাদিজা। চাষী ঘরের মেয়ে সে — শাকপাতা চুনো-চানাই অমৃত করে খেয়েছে — গোস্ত কাবাবে তার তৃপ্তি দেয় না। এ হ'ল গঞ্জ জায়গা। এদের ঘর সংসারের আদল-খাওয়া পরার আদল, ভাবসাবের আদল সব আলাদা। যে কথা অনায়াসে মুখে আনে, শুনে খাদিজার বুকে শেল বেঁধে — শত্রুকেও বলা যায় না। আর তারা তাকে সহবত শেখায় —

সবচেয়ে যাতনা চলাফেরার বাঁধাবাঁধি। গ্রামের মেয়ে, এ পাড়া সে পাড়া যেত আসত। এখানে এ ঘর, ও ঘর যেতেও বাধা। ভাড়ার ঘর, সব অনাত্মীয় মেয়ে-পুরুষ। তা বাদে নতুন পেয়েছে বোরখা। এখানে পথেঘাটে বোরখার চল। আষ্টেপৃষ্টে ঘেরা বাঁধায় কাতর মেয়েটি গ্রামের খোলামেলা পথ-ঘাট, বন জঙ্গলের মায়ায় উতলা হয়ে থাকে। তার দিনযাপন বিস্বাদ হয়ে যায়।

বিকেল হলে ঘরের বিবিজানরা নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়, ভাল কাপড় পরে, অপেক্ষায় থাকে — কাজ শেষে ঘরের মরদটি কখন ফেরে — আর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে খাদিজা। মানুষটা দরজায় এসে দাঁড়ালে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে যায়। খাদিজাকে বোঝে না হায়দার। পোড়া মাটিতে যার কারবার, কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধ সে চিনবে কি করে।

ডাব হাতে নাসের এল। বলল খেয়ে-দেয়ে ব'স — কখন ফিরি —

এক নিঃশ্বাসে খেল খাদিজা। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। এবার ধাতস্থ হল। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল — বিবি বাচ্চারা কোথায় —

নাসের মায়ের মুখে তাকিয়ে দেখল — বলল, আছে কাজে কর্মে — আমি কি জানি —

দেখবার কেউ নেই—

নাসের আর দাঁড়াল না।

খাদিজা বসেই আছে। বাইরের রোদ ঝম্‌ঝম্‌ উঠোনে একটা হাড় জির জিরে বেড়াল ঘুর ঘুর করছে। তার কালো ছায়া বড় হয়ে যাচ্ছে। উঠোনখানা চৌচাকলা। —এখানে ওখানে আবর্জনা। এই উঠোনটুকু নিয়েই কম বাহানা ছিল মিঞার। ফরাসপাতার মত ধুয়ে-মুছে চকচকে করে রাখতে হ'ত। ফুলকাটা টালি বসিয়েছিল মিস্ত্রী। পাটি পেতে খাওয়া, শোওয়া, বসা, নাসেরের হামা কাটা অনেক মানিয়ে নিয়েছে খাদিজা—টালি বাধান উঠোনটুকু মত আস্তে আস্তে শক্ত হয়েছে তার অবুঝ গেঁয়ো মন। নিচের থেকে ঘাসের একটা ডগাও ফুটে উঠতে পারেনি। রোজকার জীবন তখন চাকা ঘোরানোর মত আপনা থেকে ঘুরেই চলেছে। খাদিজা একে এক তিন সন্তানের মা হ'ল। সেই যে মানুষটির সাথে জোড় বাঁধল না—তা আর—অদল-বদল হ'ল না।

এই কখানা হাড়-গোড়ের মধ্যে সেই রোখ, সেই রোয়াব কিছুই নেই। সেই সব হিংস্র রাত, যন্ত্রণার রাত, তাকে আর তাড়না করে না কতকাল।

নিঝুম পুরীতে বসে বসে ঝিমুনী এসে যায় খাদেজার। সহসা মনে হয় খাট থেকে ভীষণ চোখে তাকে দেখছে হায়দার—সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে বসল। না, না কোথায় কি, সে তো পড়ে আছে কাঠের মত।

এতক্ষণে খাটিয়ার পাশে এসে কে যেন দাঁড়াল। দুধের বোতলের মতন কিছু ধরিয়ে দিল মানুষটার মুখে। খেতে পারছে কিনা কে জানে, মুখটা যেন সরিয়ে নেবার চেষ্টাতেই খিচুনী উঠেছে শরীর জুড়ে। দুটো মানুষের মরীয়া টানা-হেচড়ার মত শব্দ। কে এসেছে চোখ সওয়া অন্ধকারে বোঝাও গেল না—সে রাবেয়া কিনা। কিছু বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে—সে চলে গেল। এ ঘরে আরও কেউ একজন আছে—যেন তার চোখেই পড়ল না।

এ কি সেই রাবেয়া—ঝলমলে সালোয়ার কামিজ ওড়নায় চোখ ধাঁধানো সেই মেয়ে! নাকি টানা নাকছাবি, কানে বড় বড় ঝুমকো, চুড়ো করে বাঁধা চুল—জুতো পায়ে খটখটিয়ে ঘরে ঢুকে এসেছিল। চামড়া তার বেশ ফিকে।

নাসের ইস্কুল থেকে ফিরে খেতে বসেছে বারান্দায়—বাপ এসে সদর দরজায় হাঁক পাড়ল—নাসের—

খাচ্ছি—বা'জান।

হায়দারের সবুর সয়নি, মেজাজও চড়া। তখুনি ড্যানা ধরে তুলে নিয়ে গেল। আনকোরা নতুন ট্রাঙ্ক নাসেরের মাথায় তুলে দিয়ে অন্য সব খুচরো মালপত্র হাতে নিয়ে ভিতরে এল। ছেলে ফুঁসছিল—খেয়ে গে আনতাম, চোরে নিতনি তোমার বাক্‌সো।

একলা নামাতে গিয়ে টাল খেয়ে গেল ট্রাঙ্ক। তখনই দরজায় দাঁড়ান রাবেয়া ফুঁসে উঠল—হাঁ করে দেখ—বেতমিজ লেড়কা—টেরাংকটা ছুড়ে ফেলে দিল—

নাসের দৌড়ে এসে খেতে বসতে যাবে — বাপের হাতের থাবড়া খেয়ে ঘুরে পড়ল পাতের ওপর। ছেলে-মেয়েরা কেঁদে উঠল — খাদিজা যেন সংবিত হারিয়ে ফেলেছে — পাথর হয়ে গিয়েছে।

জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে উঠোন পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রাবেয়া — চাঁছা গলায় জিজ্ঞাসা করল — কোন্ ঘর আমার —

হায়দার হাত তুলে ঘরটা দেখিয়ে দিল। গায়ের মুখে ভাত মাখা নাসের ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল — আমাদের ঘর —

উঠোনে একজন দু'জন করে লোক জমছে। রাবেয়া সকলের সামনেই নাসেরের ছোট্ট দুটি হাতের বাধা ঠেলে ঘরে ঢুকল। তারপর একটা একটা করে জিনিস ছুড়ে ফেলতে থাকল।

নাসের ছুটে গেল — বাপজান —

হায়দারের বড় খালাম্মা এগিয়ে এসে বললেন — ই কেমুন ব্যাভার — রাবেয়া রূপের ঝলক তুলে বেরিয়ে এল, মুঝে পুছেন মিস্ত্রী সাদীর বাত করতে এসে কি কবুল খেয়েছে — রূপেয়া দিয়ে রাবেয়াকে নোকরানী বানানো যায় না —

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কারো কিছুই জানার নেই। একি একটা শুধোবার কথা। খাদিজার নসীব, ছেলেপুলেগুলোর নসীব! এ আর নতুন কি। পাড়া খুঁজলে কার ঘরে এমন হয়না। তবে শরিয়ত মেনে — অন্ততঃ ঘরে পা দিয়েই অমনি অপর জনকে দূর করে দেওয়া — কি বলবে — যা হবার তা তো হবে — বাইরের লোকেরা বাইরেই রয়ে গেল।

নাসের কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল মায়ের কাছে — আম্মা সব ফেলে দিচ্ছে — ছুটে ছুটে কুড়িয়ে আনছে আর কাঁদছে। সে দিনটা কি খাদিজা কখনও ভুলতে পারে। নতুন কনট্রাক্টের কাজ নিয়ে ক'দিন আসতে পারবে না বলে বেরিয়েছিল হায়দার। এই সে ফিরল।

আঞ্জু আর কায়সারকে বুকে নিয়ে রসুই ঘরে শুয়ে রইল খাদিজা। নাসের একপাশে ঢুলছে। রাত বাড়ছে। ও ঘর থেকে কাবাবের খুশবু দুটি নারী পুরুষের মাতামাতির শব্দ মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে। খাদিজা চোখের জল ফেলবে কি, অবোধ ছেলে-মেয়েকে বুকে জড়িয়ে খোদাকে ডাকতেও সাহস হচ্ছে না। তরাসে তার বুক কাঁপছে।

ভোর রাতে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল খাদিজা। কোথায় যাবে — ভাবতে বসেনি। নাসেরকে বলেছিল — দু'ভাই তোরা থাক — কারো ঘরে কাম নেব — আমার চলে যাবে —

সেই গরবিনী রাবেয়া কি এই — এমন নিঃস্ব-হতশ্রী। খালাম্মা খবর করেছিল — তালাক কবুল তো করেনি — বেইমানী করা না — ঘরে এসে থাক —

নাসের এখন বড় কষ্টে পড়েছে। এক বাড়িতে বাগাল — বড় মারধোর করে, পেট পুরে খেতেও দেয় না। আঞ্জু যায় যায় — জন্মেছে দুর্বল — দুধের অভাবে শরীরে আর

বলই হল না কাযসারকে রেখেছে একজনবা — ফাইফরমাস খাটে — একেবারে ফুরসুৎ পায না। সেও কেমন নির্জীব হয়ে আসছে। নাসের কিছুতে যাবে না। কায়সার ফ্যাকাসে মুখে করুণ চোখে চেযে থাকে। খাদিজার বুক পুড়ে যায়। কার জন্যে তবে এত সওযা। ছেলে-মেযের মুখ চেযে তো! ফিবে এল।

সেই রসুই ঘবে ঠাঁই হল তাদের। সে বাঁধে ডেচকি ধরে ঘবে নিযে যায রাবেযা। কেওড়ার, কেশবের খুশবুতে মাত হযে থাকে। দিনরাত কেমন কবে পাব হযে যায। আঞ্জু দুর্বল, কাযসাব অসুস্থ, নাসেবও আর ইস্কুল যায না। ভাইবোনকে দেখাশোনা যাটুকু সেই কবে। সেই চেযে-চিন্তে কোনদিন এক ছটাক দুধ, এক পুবিযা ওষুধ নিযে আসে —

লুকিযে বাপেব কাজে গিযে আর্জি জানায — ভাই কাঁদে — ডাক্তাব দেখাও

ট্যাকা যে দিই — ডাক্তার দেখাস না, ফুর্তি করিস, হ্যাঁ — বিষম মুখ খিচুনী খেযে এসেছে নাসেব। দুই টাকা এক টাকায যেন হয — লাগবে না টাকা আমি কাজ নিব — ভাইবে ডাক্তার দেখাব —

ডাক্তার ওষুধ কিছুই লাগেনি আর। দুপুবের কাজ সেরে বোগা ছেলেকে খাওযাতে এসে খাদিজা দেখে, মরে কাঠ হযে আছে কাযসাব। নতুন কাপড় জুটল তার। যত্নে মুড়ে বুকে কবে কববখানায নিযে গেল নাসের।

অস্ফুট কান্নায ফুঁপিয়ে ওঠে খাদিজা। কাকে দেখতে সে এখানে এসেছে কায়সার, আঞ্জু তাব বুকের ধন, এখানেই মাটি নিযেছে তারা। তাদের ছাড়া আব কার মুখ সে দেখবে —

মাযে ছেলেতে ফিরে চলেছে। এন্তেকাল হযেছে হাযদারের। হাত পা দাপিযে চীৎকার কবে গাল দিচ্ছে রাবেযা। তার গলা চিরে গেছে। কোটোরে শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে বাঘিনীর মত। পাড়ার লোক এসে গেছে। আর কি। অশান্ত রাবেয়াকে দেখে তার চোখে জল এসেছিল। নাসের আর অপেক্ষা করেনি।

ব্যাসস্ট্যান্ডেব ওদিকে আলো ঝলমল বিজলী বাতির ছড়াছড়ি। বাসের রাস্তা ছেড়ে এই ভিতর দিযে গাঁযের পথ অন্ধকার। গাছ-পালায় লতাপাতায় পথের দুধার জমাট কালো। দুরের কোন কোন বাড়ির বিজলী আলো এসে পড়ছে কাঁচা পথের পরে সেটুকুই আলোকিত। বারে বারে এক অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরছে তারা। আবার অন্ধকার — আবার আলোয় ফেরা।

খাদিজা ম্লান গলায় ডাকল — নাসের বাপ

নাসের মায়ের পাশ ঘেঁষে এল — সামনে অন্ধকারের ঘন পুঞ্জ, বড় বড় গাছের ঝাঁকালো মাথা বাতাসে নড়ে উঠছে। ডর লাগছে — হাত ধরল সে মায়ের।

কচিটা দেখায় ঠিক কায়সারের মতন নারে — খাদিজার গলা ভারী, একই বাপের ছাওয়াল তো —

নাসের চুপ করে থাকে।

ও কি আর বাঁচবে — ঘরে খাওয়া নেই — খাদিজার বুক মুচড়ে কান্না এসে পড়ে — নিজের মুঠোর মধ্যে মায়ের হাতখানা জোরে চেপে ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটে নাসের। তার বুকের ভিতরেও যে ওই মুখখানাই দুটি জল ভরা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দুখানা শুকনো হাতে সাঁড়াশির মত গলা জড়িয়ে বুকের সাথে মিশে আছে। ভাইটার বড্ড খিদে — করুণ সে কান্না যে এখনও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়

শান্তিপর্ব

ছবির হাতে খবরের কাগজ। কাগজখানা রোজ দেখতে হয়। লেখাপড়া তেমন সড়গড় হয়নি। বড় বড় লেখা বানান করে পড়তে বলে দিয়েছেন — বামুনদিদি। পঞ্চায়েতে নাম গেল যখন, বামুনদিদি বললেন — পড়াশোনাটা শিখে নিবি, কি পারবিনে! -হাঁ করে বামুনদিদির মুখে তাকিয়েছিল সে — কথা বলতে পারেনি।

নাম ? কি বিপদ। কি নাম তার ? ছোটবেলা থেকে শুনেছে — মরাডা, মরুনি। সে কেউ ডাকেও না আর। বলে, লোটার মা। বামুনদিদি নাম দিল ছবি। দরজায় কাঠে লেখা টাঙিয়ে রেখেছে ছবিবালা দাসী, প্রতিনিধি।

ঘর বলতে ঝুপড়ি। খেতমজুর, তায় মালিকের আঁতের লোক নয়। কেমন হবে তার ঘর বসত। না, দাওয়া, না উঠোন। ঝোপ জঙ্গলের মাঝে একটুখানি ফাঁকায় ওঠা বসা। উনুন পাতা। আর মাথার পরে ঝাঁকড়া কুলগাছ। আপনি বেড়ে উঠেছে- বেশ উপকারী - ডাল কাটো, পোড়াও - ঝাড়ে মূলে আবার বাড়বাড়ন্ত। ছায়াও দেয়। দুটো ছাগল ।পেয়েছিল বেঁধে রেখে দু'পয়সা রোজগারও হয়।

ভোটে মেয়েছেলেদের বেশি দাঁড় করাও বললে সরকার--তাই তাকে সবাই মিলে দাঁড় করিয়ে দিলো। কেউ তার কথা শুনলো না।

দারুণ উত্তেজনা নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছে ছবি। সামনেই ধানকলের কর্তামশায়কে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার আঁচল চোখের পরে টেনে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ল।

ছবি নাকি —

আজ্ঞে। কর্তামশায়ের ডাক শুনে ছবির হাসি পেয়ে গেল। লোটার মা নয় আর - ছবি। রাতারাতি নামটার কেমন চল হয়েছে

কাজটা ছেড়ে দিলি — দরদ দেখিয়েই বললেন

যাই কি করে বলেন, এবার সত্যিই হেসে ফেলল সে —

তোর টানাটানির সংসার, ব্রজটা তো কোনকালেই কাজেকর্মে মন দেয় না। খেটেখুটে সংসারটা তুইই চালিয়ে এসেছিস — চলতে চলতে কথা বলছে ছবি। পাশে পাশে হেঁটে আসছেন কর্তামশাই। ফিরে আসছেন তিনি ছবির সাথে সাথে। মাথায় ছাতা।

লোকে তোরে মান্যি গন্যি করে তো। আমার খুড়োরে পথে বেরুলে সব সেলাম জানাতো।

আপনেরা হলেন মুনিব।

আরে প্রতিনিধি সকলের মাথা। গ্রামের মাথা।

ছবি আর কি বলবে! মানুষটার সঙ্গ তার ভালো লাগছে না। কথা বার্তাও না। আসন্ন প্রসবা বউটির জন্যে দুর্ভাবনা তার মন জুড়ে। কি নিদারুণ পীড়নে বউটা মরতে বসেছে। রক্তহীন মরা মাছের মতো ফ্যাকাসে জল টসটসে মুখে মৃত্যুর ছায়া মাখামাখি। নিঃশব্দে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তার হাতখানা শক্ত করে ধরে সে সমস্ত কষ্ট সহ্য করছে। মৃত্যুর সাথে লড়বার জন্যে মেয়েদের বোধহয় দ্বিতীয় প্রাণ থাকে। কর্তা বলছিল -- যেতিস আস্‌তিস, ধানের কাজ করতিস - ধূলোয় গা মাথা ভরে থাকত এখন কেমন চিকন চাকন চেহারা হয়েছে। পোস্কার কাপড়, মাথা আঁচড়ে চুল বেঁধেছিস - বাঃ -

অন্যমনস্ক ছবির কথাটা কানে যেতে বিরক্তিতে গা রি রি করে ওঠে। ব্যাটারা এই কাপড়ে চোপড়ে ভদ্রলোক। কথার ছিরি দেখ।

ছবির সাথে পা মিলিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি। যাবি কোথা - তরতরিয়ে চলেছিস।

মোক্তার বাড়ি।

কেন, কেন?

যদি কেস লাগে।

হুঁ, যাই আমারও কাজ আছে। শশব্যস্ত কর্তামশাই বলেন, তাহলে ব্রজকে পাঠিয়ে দিস, দেখব কথাবার্তা কয়ে।

এই যে বৌদি, আরি বাপ, কোথা না কোথা ছুটে মরছি। উল্কার মতই ছুটে এল পেনু। পেনুর মুখ লাল, গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। কর্তা মশাই মাঝে পড়ে বল্লেন, হ'ল কি আবার।

পেনু আমল দিল না। তোমার উঠোনে সব এসে বসে রয়েছে - তা সে বউটা বাঁচবে তো - কি বললে ডাক্তার, শাশুড়ি মাগিকে যদি কাঠগড়ায না তুলি - হাতমুখ নেড়ে শাসায় পেনু।

পেটেরটা বোধহয় মরেই রয়েছে - দপ্তুরে বলে কয়ে এলাম - বৌঠান যেন প্রাণে বাঁচে - পুলিসের কাছে সে যা বলেছে মরবে ব্যাটারা। ছবি হাসতে হাসতে বলে - ডাক্তারবাবু খুব কড়কে দিয়েছে - মশাইদের কই উপোসী লাগছে! না বউটাকে কি খাওযাতেন। গায়ে রক্ত নেই - বাচ্চা হাওয়ায বাড়বে? আপনাদের নামে খুনের মামলা করতে হয়।

তোমরা বৌদি, মহিলা সমিতি করলে। শাশুড়ি বৌ-এর ঝগড়া মেটাতে পারলে না।

তাই বটে - আর তোরা সব ধোয়া তুলসিপাতা।

বাঃ বাঃ বেশ বোল ফুটেছে তো - এই না হলে প্রতিনিধি - কর্তামশায় তারিফ

করেন ছবির, কার কথা বলছিস। —পেনু মুখের সামনে হাত ঘুরিয়ে বলে—কিচ্ছুটি জানেন না, না। আপনার খুড়ো ভাগ্যধরের বেটার বৌ, রটিয়ে তো দিয়েছেন - বাচ্চা হতে গিয়ে মরে গিয়েছে। ভাগ্যি দাই এসে হাঁপিয়ে দাপিয়ে পড়লে - নয় একেবারে হাতে দড়ির ব্যবস্থা ভালোমতোই হতো।

পেনু, কর্তামশায়ের সাথে যা তো - আপনি ওকে বউ এর বাপের ঘরের ঠিকানাটা দিয়ে দেন - তাদের একটা খবর করে দিক - ভালমন্দ কিছু যদি হয়ে যায় - আমি মোক্তার দাদাকে কথাটা সেরে যাই—

ছবির সাথে ব্রজর সংসার বেতালা বাজছে। পঞ্চজনের আনাগোনা, নালিশ, সালিশ, সবেতেই ছবির আগ বাড়িয়ে গিয়ে পড়া। পঞ্চায়েত এখন তার ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে এসেছে। বউ প্রতিনিধি হলে সেও যে কারো জীবনে এমনতর ঝঞ্ঝাট হয় কে ভেবেছিল। তোর বউ প্রতিনিধি হবে।

হোক্, কিছু না ভেবেই বলে দিয়েছিল তখনই তখনই। এতে যে ভাবনা চিন্তার এত শত থাকতে পারে - সে তার কিছুই জানত না। জেতার খবর নিয়ে সেই ছুটে এসেছিল ঘরে। বাড়ির সামনে এসে একেবারে 'থ। তখনও তার কাঠপাতার কুঁড়ে লোক আর ধরে না। পথের পরেই দাঁড়িয়ে গেছে। বড় অপ্রস্তুত লেগেছিল। সরে পড়বে তাল করছিল, তার আগেই তাকে নিয়ে ছবির পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। খবরের কাগজের লোক এসেছে - মালা পরানো হয়েছে ছবির গলায়। ফটো উঠল। বামুনদিদি কতো কিছু বললে তার কথা। তখনও সে ব্রজ লেট, লড়াকু খেতমজুর।

বউ-এর কল্যাণে নতুন করে ঘর। সরকারী বসত ঘর পেয়েছে। সামনে নামের কাঠ বসানো। দেখে শুনে তামাশা করে অনাথ বলল—নিজের নামটাও খুদিয়ে নিলে পারতিস। আচমকা একটা খোঁচা খেয়েছিল সে। ইচ্ছে হয়েছিল দেয় এক থাপ্পড় কষিয়ে - তবু মুখে হাসি টেনে বলেছিল - বউ তো অর্ধাঙ্গিনী - ওর সাথেই তো আমার আদ্দেক নাম জোড়া রয়েছে। বাববাঃ তোর সাথে কথায় পারার জো আছে - নে চা খাওয়া। এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে অনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠল - না রে না, আমিই খাওয়াচ্ছি - তোকে তো এখন থেকে তোয়াজ করে চলতে হবে, ইয়ার।

জ্বালা ধরানো এ কথাটাও হজম করে ব্রজ। অনাথের কাঁধে হাত রেখে হাসি মুখেই বলে—চা টা তবে এট্টু বেশি মিঠে করে দিস।

তখনও তো ছবি, তার লোটার মা, তার বুকের কাছেই ছিল। সেইদিন, সেই বিজয় মিছিলের দিন—খবরের কাগজের লোকের সামনে ছবি একটা কথাও বলতে পারেনি। মাথা নিচু হতে হতে বুকে ঠেকে গিয়েছিল। ঘেমে নেয়ে একসা। এত কাঁচা অবশ্য ছিল না। সমান মজুরির লড়াইয়ে সে বেশ কইয়ে বলিয়ে হয়ে উঠেছিল। হয়ত এই জয় তাকে অভিভূত করেছে। তবু ঘরে ফিরে তারই কাঁধে মাথা রেখে সে থরথর কেঁদে ফেলেছিল। এ আমি পারবুনি - পঞ্চায়েতের ঘরে বসে পাঁচজনার সামনে কি

বলতে, কি বলব, মাগো - ছবির এই অক্ষমতার লজ্জা তাকেই বিঁধেছে - সে তখনও তার একান্ত আশ্রয়। তার মিঠে মনকাড়া বউ। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে - পারবে - কেন পারবে না - আপনার জন্যে বলছে না তো - পঞ্চজনের কথা - সকলের ভালমন্দ - গাঁয়ের লোক দেখবে - তাদের কথা সেখানে থাকছে কি না।

সেই আর ক'দিন। লোকের মুখে শুনতে লাগল, ছবি হেন, ছবি তেন। ছেলে মেয়েরা নিজেরা নিজের মতো খায় দায়, টো-টো করে বেড়ায় ঘরদোর খাঁ খাঁ। সেদিন মেয়েটা জ্বলন্ত উনুনে ভাত বসাচ্ছে - দেখেই মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেল। মা কোথা তোর - মেয়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বিষম উৎসাহে বলল—আজ যে বস্তর দেবে গো - আনতে গেছে। যারা পারে বিকেলে নিতি আসবে। তার মেয়েও এখন তার চেয়ে বেশি খবর রাখে।

মাঠের পারে বসে আপনমনে খেত নিড়ানো দেখছে ব্রজ। অস্থিরভাবে মুঠো মুঠো ঘাস ছিঁড়ে একটা একটা করে দাঁতে কাটছে। সামনে কানায় কানায় ভরা ঢেউ তোলা সবুজের পাথার। ঢেউ ভেঙ্গে ধানের গর্ভে ডুব দিয়ে গোছা ধান মুঠিতে ধরে আদুরে হাতে গোড়ায় নিড়ানি চালানোর অকৃত্রিম শিহরণ তার রক্তে বয়ে যাচ্ছে। কাঁচা ধানের গন্ধে বুকের ভিতরে সুখের লহর। একটু একটু করে তার চোখের কোন ভিজে ওঠে। মাঠ জুড়ে ওদের গলা ছেড়ে খুশির হাঁকাহাঁকি, হাসি, মস্করা তার কানের পর্দাটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সকলের সাথে গিয়ে দাঁড়ালে হপ্তা খানের কাজ সেও কি পেতে পারত না - তার মতো খাটিয়ে লোককে কে না কাজ দেবে!

কিন্তু সে হবে কি করে! মালিক ব্যাটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠবে—এই যে ব্রজ, এস এস এস - আমি বেরুব। তুমি বরং ভাই এদের কাজগুলো একটু দেখে শুনে রাখ। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যদি তার রক্ত চড়ে যায় - কি করবে। শালার আলবত কোন ধান্দা আছে। খিস্তি ছাড়া কথা কইত না। আবার বলে 'ভাই' আপ্যায়নের বহর দেখ - বউ-এর তরে এও তার উপরি পাওনা।

অনাথ তাকে ডাকতে এসেছিল। দূর করে দিয়েছে। দুটো হাত মাথার নিচে স্যাঁতসেঁতে মাটির পরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। মুখের ওপর আকাশ। পড়ে আছে দমকা ঝড়ে এলিয়ে পড়া ধানের গোছার মতো। সর্বাঙ্গে পরাজয়ের কাদাজল মাখামাখি। কাঁচা ধানের গন্ধ, ধান ফুলের ঠোঁটের ফাঁকে কেশরের দল দুলছে, বাতাসে ভাসছে ধূসর কেশর - আর ক'দিন ধানের বুকে দুধ আসবে। নুয়ে পড়বে সোনা ধানের শীষ। এই খেতে সে আর উঠে দাঁড়াবে না। এই ধানের গোছাটা শিকড়ের মাটি আর পাবে না।

সেই অনাথ গায়ে পড়ে খোঁচাতে আসে বুদ্ধিনাশ হয়েছে নাকি তোর। খেতির কাজে মন লাগে না। চাষার ছেলে না তুই। বড় গায়ে লাগে।

করগে না, যা তোদের প্রাণ চায়। আমার পেছনে লেগে পড়েছিস কেন?

তোর বৌ প্রতিনিধি হয়েছে তা বলে তুই তো আর বাবু হয়ে যাসনি। সেও মাঠে ঘাটে কাজ করছে - আর তুই - যাক্‌গে মাঠ ঘাটের নিচুকাজের মন যদি না'লাগে -

তো বেশ। মানী লোকটা কদ্দিন ধরে খবর করছে - সেখানে যা - তোর বউ তো কাজ করতে - তেনার ঠাঁই।

করত তো কি - আমারেও নাম লিখাতে হবে!

হবে না কেন, তুই কে রে মাকড়া, খুব যে ল্যাজ ফোলাচ্ছিস। কথাটা সোজা তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে গেল-লাল চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনাথের দিকে। কারা এরা তাকে বলছে, কে সে? এরাই কি সেই দুঃসাহসের দিনে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে লড়াই-এর মাটি বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে। সেই লম্বা লড়াইগুলো না লড়তে পারলে আজ কোথায় থাকত প্রতিনিধি। কোথায় থাকত পঞ্চায়েত। শেষে প্রতিনিধিই সব হ'ল লড়াইটা তুচ্ছ হয়ে গেল। একটু শান্তি একটু স্বস্তির মুখ দেখেছিস আর ওমনি নিজের পাতে ঝোল টানতে উল্টোপাল্টা ঘাই মেরে যাচ্ছিস। ধানকলের মালিকটাকে বলছে মানী লোক। ভুলেই গেছে ব্যাটা দাদন দিয়ে দিয়ে কতলোকের সর্বনাশ করেছে - তারই কিছু জমি তো তারাই উদ্ধার করেছে। এখন একথা আবার বলতে হবে এদের। মন মাথা আর ঠিক থাকে কি করে। খানিক একলা হয়ে নিজেকে একটু ধাতস্থ করে সব কিছু তলিয়ে বুঝতে হবে তাকে। এই অনাথ, পরাণ লড়াই-এর ময়দানের এই সব মানুষ এদের তো সে ফেলতে পারে না। ছোট ছোট সুখের জন্য তাদের কাতরতা, চাওয়ার পাল্লাটা আরও একটু ভারী করে তুলবার কাঙালপণা তাকে যাতনা দেয়।

যখন পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, বন জঙ্গল গা ঢাকা দিয়ে, খেতের কাদায় মাথা গুঁজে পড়ে থেকে, এ গাঁ, সে গাঁ করতে করতে, রক্ত ঝরাতে ঝরাতে এক আকাশ কল্পনা বুকে তারা খাড়া থেকেছে—কোন দিন চাষীদের জয় হবে। জয় তখন কত দূরের। তার ছায়া কোথাও ছিল না। বরং মৃত্যুই ছিল বুকের কত কাছে—তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস সব সময় মুখের উপর পড়ত। কিছু চাওয়া কি পাওয়ার কথা কত হাস্যকর ছিল।

আজকেও তো কোন চাওয়াই তাকে ভিতর থেকে টানে না!

অপরের দিকে তাকিয়ে তার বুকে এত জ্বলন কেন? সুখটুকু ওর মুখে মাথায় মাখতে চায় মাখুক না, তার যদি কোন চাওয়া না থাকে তবে সে তড়পে মরছে কেন? কেন মনে হয় কি যেন ঠিক হচ্ছে না। যুদ্ধের পর সৈন্যরা ঘরে ফেরে, আমোদ আহ্লাদ করে, কিন্তু পরের যুদ্ধের জন্য সতর্কও থাকে। সুখ দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলে না। নাঃ কথাটা কি সে ভুল ভাবছে। ওদের কাণ্ড দেখে তার হাসি পাওয়া উচিত।

বেঞ্চির পরে দু'হাতের কনুয়ের ভাঁজে মুখ গুঁজে বসেছিল। কারো কোন কথাতেই মন ছিল না।

গুপলা কখন উঠে এসেছে তার পাশে, তার সামনের বোতলটা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, বেড়ে মাল মাইরি, কোন্ কোম্পানি, আমাদেরও এক পাত্তর করে দাও হে, ইসব লিয়ে যাও।

রাখো শুঁড়ির ব্যাটা ফাঁপরে পড়ে গেছে। আজ্ঞে, মাল একই—গুপলা মানবে কেন, পেটে এক পাত্তর পড়েছে। পিতিনিধির পাতে নকলি চলবেনি বাবু, ঘুঘু কি তুমি আজ, বেন্দাবন কর্তারে কি খাওয়াতে জানিনে।

ব্রজ নিজের ভাবনায় মগ্ন। ভাল করে বুঝবার আগে কারা সব হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। গুপলাকে এই মারে তো সেই মারে। বের কর টাকা শালা, জোচ্চর, কর্তাবাবুকে সার বেচে ফুর্তি করতে এয়ছে - ধরতো ধরে নিয়ে চল। তাকিয়ে দেখে মাথায় কাপড় দিয়ে গুপলার বৌ ছেলেটার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে - রুক্ষ খনখনে গলায় সেও চেঁচাচ্ছে। জমিখান বেচে দেবার তাল করিছে - নেশায় খেয়েছে।

বেশ করিছি। বেশ করিছি। হাত পা নেড়ে একপাক ঘুরে নিল। টলতে টলতে বৌ-এর দিকে এগোতে এগোতে বলে বসল, আমার হেবোর মা পিতিনিধি হলে ধরতিস এই আমার ইয়ে—

দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল নাচাতে থাকে সে।

লাফ দিয়ে গুপলার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করেছিল। অনাথ তাকে ঘাড় ধরে জোর ধাক্কা না দিলে অনর্থ বেধে যেত। ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ির উঠোনে এসে বসল ব্রজ। ভুতের মত অনাথও তার পিছনে এসেছে। ঘরের ভিতরে তখন মা আর ছেলে মেয়েতে মিলে লম্ফর আলোয় ঝুঁকে পড়ে আরও কটি পড়ুয়ার সাথে অক্ষর পাঠ নিচ্ছে। .

অন্ধকারে উঠোনের এক কোণে বসে পড়ে অনাথ গর্জায় - গুপলা একটা মানুষ!

তখনও জ্বলে যাচ্ছে ব্রজর শরীর-ওর বৌটা কি বলল শুনিসনি-জমিখানা বেচে দেবার মতলব - বৌটার নামে কেন তখন পাট্টা দিলাম না আর তুই শালা খচ্চর, গায়ে গায়ে লেপ্টে আছিস - কেন রে

হ্যাঁ - আজই ব্যাটাকে টানতে টানতে কর্তার ঘরে নে যেতাম - তোরা সামাল দিচ্ছিস - ঘাড় গুঁজড়ে ধরে সে অনাথের - কেন রে - বাবুদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি হচ্ছে খুব - অন্ধকারে দু'চোখ কয়লার মতো জ্বলে - শালা আমারে নে ফুক্কুড়ি - আমি একট সঙ।

থাম বেরজো, তং করিসনে - মাল তোর মাথায় উঠে গেছে-আছাড়ি পিছাড়ি করলে বৌদি ঠিক বেরিয়ে আসবে - গোঙাতে থাকে অনাথ।

ঘরের ভিতরে ছবির গলা শোনা গেল - দেখত রে রেণু বাইরে কে - বাতিটা নে যা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রজ। দুত্তোর, এখানে আর নয়। আগুন জ্বলে মাথায়। আর তখন সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে কোথাও বেরিয়ে যেতে পারলে তবেই স্বস্তি। চারদিক থেকে ঠোক্কর খেয়ে ক্ষোভ অপমানে, যখন মনটা একটু শান্তির জন্য ব্যাকুল - তখন কাঠপাতার মেটে ঘরখানার জন্যেই তার মন কেমন করে। বউ ছেলের সাতে চ্যাটাই পেতে সেই যে শরীরের রোমে রোমে জড়ানো ঘুম। সেই ঘামে ভেজা তপ্ত শরীর, লোটার মার গায়ের নোনা গন্ধ, শিশুর দুধের গন্ধ তাকে পাগল করে তোলে।

এ ঘর বাড়ি তার খারাপ তা নয়। ছবি তার মনমত তাকে ঝকঝকে করে রাখে। চ্যাটাই এর পর তাদের কাঁথা-ভাঁজ করে গোটানো। দড়িতে জামা কাপড় - কেউ কিছু মন্দ বলবে না। অথচ খারের গন্ধে তার মাথা ধরে। নতুন ঘরখানা তার মুখের দিকে অপরিচিতের মত নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থাকে। তার সর্বাঙ্গে ময়লা। হাঁটু পর্যন্ত ধূলো, মাথায় চুলে ধূলোর চুবড়ি। বাবুর বাড়ি ঘরে দোরে ধূলো পায়ে প্রবেশের সঙ্কোচ এসে তার পা দুটো আটকে ধরে।

পুরনো পাতার চেটাইখানা পেতে সে উঠোনে গড়াগড়ি দেয়। নিজেকে সে ধোয়ায়ও না, সাফ সুতরোও করে না। কি যে বিরাগ উপচে আসে তার কণ্ঠা পর্যন্ত। লোটার মাকে সে আর কোন দিন ফিরে পাবে না।

ছবি উঠে আসে - জলের ঘটি এগিয়ে দেয়। মাটিতে শুলে। নাও ওঠ, গা হাত পা ধুয়ে ফেল, হাঁড়িতে জল রেখেছি - রেণু বাবার জন্যে ভাত বেড়ে দে - কি হ'ল - ওঠ - যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলে ছবি।

ছেলে মেয়ের সামনে তুমি এসব কি করছ? যা বলবে - খোলাখুলি বলতে পার না।

ছবি তাকে হাসতে হাসতে বলেছিল। এট্টু যদি দেওয়ালটা লেপে পুঁছে তকতকে করে রাখি, যত্ন করে উঠোন কাড়ি, তাতে দোষ কি? কেনে সাঁওতালরাও গরিব - যাও দেখ না তাদের ঘর দোর - দেওয়ালে সোন্দর ছবি আঁকা-সকলে অমনি করুক না-গেরাম খানায় কেমন দেখনাই হবে।

সে'হল সাঁওতাল সমাজের কথা। চাষী ঘরে হবে তুলসীর থান, লঙ্কা বেগুনের গাছ, লাউ এর মাচা - গোবরের জ্বালানি-ছবির সেই চোখটা কবে ফুটবে।

•

বনের মধ্যে চারা গাছ লাগাবার সরকারী কাজটায় লাগল ব্রজ। এদিকের বনজঙ্গল তার হাতের পাতার মতই চেনা। শেষ রাতে জড়ো হয়ে বনের মধ্যে বহুদূর যেতে যেতে এক সময় হারিয়ে যায় সে। ছোট ছোট বন বসতি। এখানেই তার কতদিন কেটেছে - গোপনে। গাছের গায়ে সেই রকমই কাপড় বাঁধা দোলনা। মাটির পরে ধূলো কাদায় মাখামাখি শিশু-বুকের ভিতর গুর গুর করে ওঠে - দু'হাতে বুকে আঁকড়ে ধরতে মন যায় - মাটি না মাখলে বাচ্চাকে মানায় - তাকে নিজের, একেবারে নিজের মনে হয়! বৌটি ঝুড়ি বাঁধছিল - ঘরখানি ছোট্ট, দুয়ারটুকু লেপা পোঁছা। ঝুরো মাটি ঝরে পড়েছে দেওয়াল বেয়ে।

চারা গাছ হাতে দাঁড়িয়ে গেছে ব্রজ সম্মোহিতের মতো।

ডাগর মেয়েটি উনুন পাড়ে দাঁড়িয়ে জংলা ছিপটি কেটে কেটে জ্বালানী সাজাচ্ছে- জীর্ণ কাপড়খানা পেঁচিয়ে পরেছে টানটান করে। খরায় ঝনা চারা গাছটি বেশ - পত্রহীন তবু চিকন ডগটি সজীব সবুজ। আহা, এমনই ছিল। ঠিক এমনি মরুণি নামের মেয়েটি, শুধুই তেল সিঁদুর পরিয়ে যাকে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল সবাই। বাপ মার সাথে সে এসেছিল ঠিকাদারের দলে অনেক সন্তানের একটিই মরুণি তাই

বাপ-মায়ের চোখের মণি। একদিনের ওলাউঠায় দু'জনেই চলে গেল। ঠিকাদারের দলে ঘুরছিল সেই থেকে মেয়েটা।

বুকের ভিতর দাপিয়ে উঠল প্রাণটা। মরুণির জন্য তীব্র টান তার শিরা উপশিরায় ঝনঝনিয়ে উঠেছে। কি যে হয়ে যাচ্ছিল - 'ওহো' ঠিক তখনই কেউ যেন হাঁক পাড়ল কোথায় - হাতের থেকে খসে যাওয়া চারাগাছ কোনমতে গুছিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে পিছিয়ে এসে-ছুটতে লাগল ব্রজ। এতদূর থেকেও সে মেয়েটির গায়ে সেই চেনা কটু ঘামের গন্ধও পেয়েছিল। জটপাকান চুলে পলাশের ঝাঁঝালো সুবাস - যত দুরে যেতে থাকল গন্ধও তার পিছু নিল

অবসন্ন ব্রজ কাটা গাছের মূলের উপর বসে পড়ে। গন্ধটা তাকে নিয়ে ভীষণ এক লুকোচুরি খেলছে। কোন দিকে পা বাড়াবে আর ভরসা নেই তার।

দিন পার হয়ে যায়। দিনের পর দিন। ব্রজ তার বেড়াজলের ভিতরে ছটফট করে, খালুই এর ভেতরে জ্যান্ত মাছের মত। শ্যামল ধানের খেতে কোমর সমান ধানে দীঘল শীষ হাওয়ার টানে ঢলে ঢলে পড়ে। ধানের কোষে দুধের ভার। শরতের মায়া লেগেছে জগৎ সংসারে। আকাশ শিশুর চোখের মত টলটলে জল ধোয়া নীল, বাসন্তী আলোয় অপরূপ রূপটান লেগেছে সবেতেই, প্রতিমার মুখের মত সব মুখেই সুখের চিকন আভা।

সবাই কোমর বাঁধছে, ধান কাটবে, গোছা বাঁধবে রঙিন শাড়ির রঙ ছড়িয়ে সেই ধান মাথায় করে সার বেঁধে তুলবে মেয়েরা। ঘরে ঘরে মাতলের মৌসম লেগেছে। মানুষের ঘবে এখনই স্বপ্নরা ডানা ছড়িয়ে ঢুকে পড়ে। ঘরের পুরনো খড়ে, উঠোনের পেয়ারা, ডুমুর গাছের পতায়, হলুদ ডুরে শাড়িতে মাথা ঘষা উড়ু উড়ু চুলের গন্ধে মন ভোলান ভাল লাগার সুর।

মনে মনে তখন অনেক হিসাব নিকাশ। স্বপ্ন ভর করা মুখগুলোয় প্রদীপের মতো আশা কাঁপছে। এ সময় পাঁচটা মানুষ এক জায়গায় হলে - পাঁচটা কথা, ঘর সংসারের কথা, বিষয় আসয়ের কথা আপনি এসে পড়ে।

পরাণের বোন মানুকে দেখতে এসেছিল। পরাণের বাবা একটু ঘর বর দেখে শুনে দিতে চায়। খেত মজুরে ভরসা কি - যদি চেরডা কাল পঞ্চায়েত না রয় - তুদের অভাব নি - কোল পোঁছা মেয়েডা - মার নাকে কাঁদুনি। তা ছেলে দেখে গেছে - সাইকেল নেবে, ঘড়ি নেবে। কেনে কি আছে তেনার। যা বিঘে দুই জমি, নিজে একজনার সাইকেল সারাই দোকানে বসে - কোনদিন নিজেও একখানি দেবে। নাকে কানে সোনা না চাইলে রাজি হত পরাণ। কিন্তু তার বাবা মা বেঁকে বসেছে।

পণ দিবি পরাণ - বলে উঠল ব্রজ।

আমি দেব না - বাবা দেবে - তারা বলেছে। কালো, পড়ালিখা জানে না। চুলডা পর্যন্ত হাঁচড়ে বাঁধতে শিখেনি - ঘরের বৌ হবে-মাঠে ঘাঠে খাটতে তো যাবে না।

অনাথ উৎসাহে বলে বসল - তোরা ছবি বৌদিকে নে যেতে পারিসনি - চুল এয়সা বেঁধে দিত -

ব্রজ না বলে পারল না - আবার মেয়েডারে খুন করার মতলব করলেও ছবিরে নে যাস্। ব্রজ ভাবে মরুনি আজ তার মুখেও ছবি হয়ে গিয়েছে।

পরাণ ক্ষেপে উঠল - হাসিস নে ব্রজ - তোরও মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হলো বলে বাবা বলছে - মেয়ে তো ঘরে রাখার নয়। দিতিই হবে - দু'হাত এক করে।

আমি বাবা খেত মজুর ঘরেই দেব -

দিস, তারাও কম না - সব লেখা-পড়া শিখছে-গোনা গুণতি ভালোই পারে - পাওয়া - থোওয়া তো এই - একবারই - বলে কি ব্রজ - অ্যাঁ, যাব কোথায় আমরা - আমাদের ছবি বৌদি আছে না, দেব লাগিয়ে।

সব রোগের এক বড়ি ছবি বৌদি তোদের - হা হা করে হাসে ব্রজ - পণের কথা ছবি কে বলব নাকি পরাণ -

হুমড়ি খেয়ে দু'হাত চেপে ধরে সে - এ সম্বন্ধটাও ভেঙ্গে দিস নে - আমার মাথার কিরে বেরজো - মেয়েটার আইবুড়ো নাম তো ঘুচুক।

সংসার আর একটু মসৃণ হোক, পরাণের বাবা মাও তাঁদের আশাটা একটু উঁচু ডালে বাঁধতে চাইছেন। ব্রজ উঠে দাঁড়াল, জমি বেচিস নে পরাণ - আর হবে না - মানুরে তোদের বৌদির সমবায়ে লাগিয়ে দে, নিজের বিয়ের জন্য নিজেও কিছু রোজগার করুক।

ভারী মন নিয়ে ব্রজ বেরিয়ে এলো। সেও মেয়ের বাপ, তারই মতন তেল সিঁদুরের বিয়ে কি উঠেই যাবে ?

দিনকালই তো চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় আমাদের - কতযুগ একপায়ে দাঁড়িয়ে সে বুঝি পা বদলে নিচ্ছে ! নতুনকালের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পিছনের দুঃস্বপ্নকে চোখের সামনে ছবি করে কে টাঙ্গাতে চায়। একগলা ধানের খেতে দাঁড়িয়ে সুখ উপছে পড়ে-প্রাণ সমান ধান বুকে করে আর বয়ে দিয়ে আসতে হবে না মালিকের দোরে — ভেবে প্রতিটি নধর শীষে আঙ্গুল ছুঁইয়ে আজ সে চুমু খায়। এ তার সন্তান - এ তারই ঘর আলো করে তুলবে। সেই আকণ্ঠ সুখের বুকে সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ডানা মেলা স্বপ্নগুলোকে মুঠোয় চেপে ধরতে চায়।

(২)

এ সব হলো ব্রজর কথা ছবির বুঝি বলার কিছু নেই। ওমনি তাকে প্রতিনিধি করেছে তেনার খাতিরে! সিঁদুরটা কপালে ছুঁইয়ে লোকটা তাকে নিয়ে এসে এই জঙ্গলে ভরা ঝুপড়িতে ফেলে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেল। বসে বসে বেলা চলে গেল - সে তখন হাপুস নয়নে কাঁদছে-দু তিনজনে মিলে হাঁড়ি কলসি চাল টাল নিয়ে

এলো। এসেই তম্বি — উনুনটা গেঁথে ফেলনি। মাটিতে গর্ত করে হাতে হাতে কাঠকুঠো জড়ো করে চাল ডাল ফুটিয়ে সবাই মিলে বসে খেল। ব্রজর ঘরে সেই ঘর সংসারের হাতে খড়ি। কয়দিনেই উড়নচণ্ডী লোকটাকে চিনতে তার বাকি রইল না। প্রথম প্রথম কান্না আসত খুব। কখন আসে, কখন যায়, একা ঘরের কোনে বসে বসে বুকে ভয় ধরে। দেখ, কড়া গলায় বলে বসল একদিন, ঘ্যান ঘ্যান একদম সহ্য হয় না। থাকতে পারিস থাকবি, নয়ত দেব দূর করে - তখনও ঝর ঝর করে চোখের জল গড়াচ্ছে - সে দুমদাম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কোনদিন খায়, কোনদিন ঘরে কিছু থাকে না - কোন খবর নেয় না লোকটা - সে দুর্দ্দশা কাউকে বলার নয়। শেষে অনাথের পিসির হাত ধরে সে রোজগার করা ধরল। কম দুর্ভোগ ভুগেছে মানুষটাকে নিয়ে। কাজকর্ম হলে পয়সা কড়ি দিয়ে যেত কিন্তু সে আর কতো - রোজ রোজ মারদাঙ্গা, খুন-খারাবি - প্রাণ সদাই কণ্ঠাগত - এই কি খবর আসে - কচি কচি বাচ্চাদের বুকের তলায় পাখির মতো আগলে আগলে বেরিয়েছে। আর তারই ছেলেপুলের ঘর গেরস্থিতে সে যেন দুদণ্ডের মেহমান। বেয়াড়া মেজাজের মানুষটা যে পাঁচজনের তরেই ঘর গেরস্থি ছেড়েছে - অনেক দুঃখে একথাটা সে বুঝেছিল। এসে দাঁড়িয়েছিল তারই লড়াই এর সাথে। ওমনি তাকে প্রতিনিধি করেনি গাঁয়ের মানুষ।

সমান মজুরির লড়াই নিয়ে যখন গোল উঠল - সে তখন খেতমজুর মেয়েদের ঘরে ঘরে গিয়েছিল। সমান মজুরি মানে মজুরি বাড়া। মজুরি বৃদ্ধির লড়াইতো সবাই মিলে করেছে, ছেলেরা বেশি মজুরি পাবে, তারা পাবে না কেন? বউগুলো মেনিমুখো, মুখের পরে কাপড় টেনে ফিক ফিক করে হাসে ওমা, মরদের সমান!—মেয়েমান্‌সে মরদের সমান খাটতে পারবে কেন?

আর ঘরে বাইরে বেটা ছেলেরা এমন কাণ্ড বাধালে যেন তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে কেউ!

মেয়েদের কেউ নেবেই না - কাজে -

না, নেবে না বইকি - চেরডা কাল নিয়ে এলো - ঘরে যে দু'পয়সা বেশি আসবে। তবু মেয়েমানুষগুলো ঘরে বাইরে নানান কথায় পিছিয়েই যায় - এই লড়াইটাতে তারও দায় কম ছিল না - তার মরদের দেখা নেই। সমান মজুরি তার চাই, ঘরে দু'পয়সা বেশি রোজগার চাই।

সেই তাকেই কি গুমোর দেখাও! লড়াই জারি ছিল যতদিন, কি কি বলেছ তোমরা - তেভাগা চাই, চাষীর উঠোনে ধান ওঠাও, খাস জমি দখল কর - সব হয়েছে, সবের বেশি হয়েছে সেই সরকার - সবই তো পেয়েছ, পঞ্চায়েত হয়েছে। এখন আর অন্ধকারে ছানা বুকে করে পাখির মার মতো জাগতে হয় না। ফলন্ত ধানের খেত থেকে একচোখে হাসি, একচোখে জল নিয়ে ঘরে এসে দু'হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজড়ে যন্ত্রণা আড়াল করতে তো হয় না। উপোসী ছেলের মুখে চোখ তুলে তাকাতে বুক ফেটে যায় না। সকলের জন্যে এই তো চেয়েছিলে কিনা তোমরা।

তার চেয়ে বেশি তো দিচ্ছে পঞ্চায়েত, দিচ্ছে কিনা ভেবে দেখ - ঘরে ঘরে দেখ, পথ ঘাট দেখ, হাট বাজার দেখ -

লোকে ভিখারী থাকবে আর তুমি তোমার নেতাগিরির টাটে বসে থাকবে। ঐটে আর হচ্ছে না। সেই সেই আফসোসে জ্বলে পুড়ে মরছে! নানা ফিকির করে পায়ে পা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছে। উনার যেন রথের চাকা গেড়ে বসেছে।

ঘরের ব্যবস্থা হলো, যখন কাঠ পাতার ঝুপড়ি ভেঙ্গে ঘরে উঠল - সেই বেঁকে বসল লোকটা। ঘরে সে থাকবে না। একা সেই ঘর পেয়েছে যেন? আগের ধুলো মাটি মাখা কাপড় সে খার কাচা করে পরছে, সিলাই করে ছেঁড়া জুড়ে নিতে শিখেছে। কাঁকই দিয়ে হুড়ো নাড়া চুল সমান করে আঁচড়ায় - পায়ে চটি-এখানে সেখানে পাঁচজনের কাছে যাতায়াত করতে হয় - থলে একটা কাঁধে রাখে। চোখ করকর করে এতেই বাবুর। তা বাপু যে পূজোর যেমন মন্তর। যখন খেতির কাজ করে, কি রাস্তায় মাটি বয় - তখন আর পাঁচটা কামিনের থেকে তার কি তফাৎ!

ইচ্ছে করে, তাকে অপদস্ত করতেই লোকটা হাঁটুর পরে কাপড় তুলে পরবে, ছেঁড়া-গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে হটর হটর করে বেড়াবে। কৃষক সভা শ্লোগান দিচ্ছে-জমি ধরে রাখ, দখল রেখে চাষ কর, লোকে পঞ্চায়েতের আসছে বীজ দাও, সার দাও, সেচের জন্যে কাজ দাও। এ গাঁয়ে পঞ্চায়েতের সে প্রতিনিধি, তুমি ক্ষেপলেও আমি, না ক্ষেপলেও আমি - তাদের কথা তারা আমাকেই বলবে -

দৌলত ঘরে বয়ে এসে তাকেই দু'কথা বলে গেল। ব্রজ তার দোস্ত-সে একটা মানুষের মত মানুষ। তার মনের কথাটা ছবির বুঝতে হবে।

মুখ খোলেনি ছবি, নিজের মরদের মনের কথা জানতে বাকি থাকবে তার! আর তা বুঝতে হবে অপরের মুখে শুনে।

ঘরে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে মেয়ে—বাপ তাড়িখানায় পড়ে থাকছেন কি না লোকের মনের কথা শুনতে - পেটে দু'পাত্তর পড়লে নাকি সব হড় হড় করে ইঁট পাটকেলের মতো কথা ছুঁড়তে থাকে—মাতালে কি বলে তাতে কার কি! আমার কাজ তো আমি করছি - ওসব যাওয়াই বা কেন আর বাড়ি এসে অশান্তি করা!

দেখেন বাপু। ছেলে মেয়েরে ইস্কুলে দিইছি। আমি সাক্ষরতায় পড়ব - তারা পড়বে না - আগের পঞ্চায়েতে দুটো ছাগল পেলাম এখন চারটে হয়েছে। একটা খাসি বেচেছি - মেয়েটা বড় হচ্ছে - ইস্কুলের জামা ইজের কিনিছি - এতেই তার বাপের কি দাপাদাপি। খালি গায়ে কাপড় জড়িয়ে মেয়ে ইস্কুলে যাবে। কি বলতে কি বলছে যদি খেয়াল থাকে। মেয়ে ওদিকে কেঁদে কেটে সারা। আর সে ইস্কুলে যাবে না। ছেলে ইস্কুল পাড়ার থেকে ঘাড় ঘেঁষিয়ে চুল ছেঁটে এলো - তাকে টানতে টানতে নাপিত ঘরে নিয়ে ইঞ্চি ছাঁট দিয়ে আনল। - বাবুগিরি ফলান হইছে হ্যাঁ।

ছেলেও তেরিয়া - ইস্কুলের সব ছেলেগুলোনের মাথা ছাঁটিতে পার তো দেখ না -

কোন বাবুবাড়ির ছাওয়াল তোরা; ওদের সাথে কিসির পাল্লা তোর - পড়ে শুনে দেখা, বুদ্ধি বিবেচনা বাড়া।

ছবি আর পারে না - ছেলেটারে নে পড়লে যে, পাঁচটা ছেলের সাথে ওঠা বসা, মাস্টাররা বলছে পাঠ ও ভালই পারে - ভালো হলে ভাল। হাত ঝেড়ে উঠে পড়ল। মুখ হাঁড়ি। গাঁওয়ার মানুষ যেমন বুঝি তেমন বলি-নতুন কালের বুলি তোমরা শেখাও-আমি এই বুঝি - তুই যে খেতমজুর, সেই মজুরই হবি - লাটের ব্যাটা তো নয়—

হুঁ ঠেঙ্গির পর ক্লাপড় তুলে খেতমজুর সাজতে হবে।

কি বললি ? সাজা এ্যাঁ-আমরা খেতমজুর - তা তোরা পেন্টুল পরে লাঙল টানবি, জামার আস্তিন গুটিয়ে নিড়ানি দিবি - তা দিস, তবু তুই বাবু নোস, মজুর।

শুরু হলো লেকচার। পার্টি করে করে লেকচারই জান - ভাল লেখপড়া করো আপিসে চাকরি হয় না - ছবি ভীষণ বিরক্ত হয়। চেয়ারে বসে চাষীর লড়াই নতুন ধারায় চাষ করবে বলে, লেখাপড়া শিখছে লড়াইটা আরও ভাল করে বুঝবে বলে।

আচ্ছা আপনি বলেন - ওইটুকু ছেলে ওকি অতশত বোঝে, আর তিনি বিবাগী হয়ে কুথায় যে গেলেন -

ঘরের টান তো নেই-বয়েস হয়ে গেছে আমায় - নিজেকে সামলাতে পারে না ছবি - বড় বড় ছেলেমেয়ের সামনে আমার কি হেনস্থাই করে। উঠোনখানা সাফ করে ছেলেমেয়েরা ছুটকো সব ফুলের গাছ লাগিয়েছিল - উঠোন জুড়ে নয়নতারা, সন্ধ্যামালতি, আলতা দোপাটি ফুলে কেমন শোভা হয়েছিল। কে কি বলেছে — এত ছুটোছুটি করে মুখের রক্তুতুলে খেটে মরি - তবু শয়তানরা হিংসেয় জ্বলে মরছে - সে এসে একটানে সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিল - ছেলে মেয়ের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না - মেয়েটা ছুটে গিয়ে বাবাকে আটকাতে চেয়েছিল - গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল - কি হয়েছে তোমার বাবা, কথা বলছ না কেনে - তার হাত ছাড়িয়ে সেই যে বেরিয়ে গেল, ক'দিন ফিরলই না - মেয়েটা গুমরে গুমরে কাঁদলে।

একে কি সংসার বলে - আমি তো পাগল হয়ে যাব -

দৌলত হাসে - চিরডাকাল অমনে একরোখা, কিন্তু কি এমন হলো -

কি আবার - কে বলেছে - বাড়ি হলো গে তোর, ফুলের বাগান, তকতকে উঠোন, সিঁদুর পড়লে তোলা যায়, যেন বাবুদের বাড়ি, আমাদের তো ভিতরে ঢুকতে পা সরে না।

দৌলত হা হা করে হাসে, সোয়ামীরে বশে রাখবে, কবে সে তোমার বশ ছিল—

ছবির চোখে জল আসে - তাই বলে খাবে দাবে না। শুঁড়িখানায় পড়ে থাকবে - কোথায় কোথায় চলে যায় খোঁজ পাই না - ছেলেমেয়েরা আমার কাছে বাবার খবর চায়।

ভয়ে ভাবনায় ছবি ব্যাকুল হয়, ছেলে মেয়ে বড় হয়ে উঠছে - তারা মনে মনে তাকে দুষছে না তো ? সত্যি কিসের বিবাদ তাদের — লোকটা এমন করে তাকে পর করে দিল ? দৌলতকে সে মুখ ফুটে বলতে পারে নি - কতদূরে সরে গেছে ব্রজ। এই তার প্রতিনিধি হবার খেসারত !

কাপড় পাল্‌টে খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে পলকের জন্য আয়নায় ব্রজর ছায়াটা সরে গেল — দুটো দিন পরে এই ফিরল। মেয়েটা আবার কি করছে, এগিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল। জলের ঘটি নিয়ে রেণু দৌড়ে দৌড়ে আসছে - বাবা কুথা ছিলে তুমি। ব্রজ গাছে হেলান দিয়ে বসে - মন মরা হাসিটুকু যেন গিলে ফেলল - হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেল। মাথার গামাছা খুলে মাটিতেই শুয়ে পড়ল। তার ঝড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে বুকটা কেঁপে উঠল ছবির।

রেণু ছুটে এলো - বাবা গো খাবে না - শুলে কেন - ওঠ - বাবা, ও বাবা - ছবি স্তব্ধ হয়ে দেখছে। মনে ওর কিসের আগুন জ্বলছে! ওর তো কম মান্যি গণ্যি ছিল না। খুন খারাবির রাজত্ব পার হওয়া পোড় খাওয়া নেতা - ওদের নাম বুকে নিয়ে মানুষ সাহসে ভর করে ন্যায্য লড়াই এ নেমেছে। সেই মানুষটা নিজেকে এমন করে ক্ষইয়ে ফেল্‌ছে কোন মতলবে কে জানে!

সাইকেলের ঘন্টি বেজে উঠল বাইরে। ছবি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সে যাবে পাশের গাঁয়ে ডোকরা কেন্দ্রের হিসেবপত্র দেখা হবে - মাসের শেষে ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ দিতে হবে। কেরিযারের উপর শক্ত হয়ে বসতে বসতে মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল - সেও তো একবার বলতে পারত - ওঠ খেয়ে নাও - মেয়েটা যে তোমার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই ভাবে যা খুশি করুক গে যাক -

সেদিন ছবির সামনে বসেই অনাথ ব্রজকে বলছে — ব্যাটা কাপুরুষ - ছবির মত বউ যদি আমার হতো, তার পায়েই পড়ে থাকতাম রে। রাঙা রুমাল গলায় বেঁধে গাঁ-গঞ্জ তোলপাড় করেছিস তুই আর বৌটা মুখ বুঁজে ছেলেপুলে নে ঘর সংসার সামলেছে, তার ভাতে পেট ভরিয়েছিস - লজ্জা করে না - তার মনে কষ্ট দিয়ে বাউন্ডুলের মতোই ইদিক সিদিক করে বেড়াস।

কঞ্চি দিয়ে মাটির পরে দাগ টানতে টানতে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল ব্রজ, একটিও রা কাড়েনি। তার নিস্তব্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছবি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। অনাথকে সে কিছুই বলেনি। উপযাচক হয়ে সে যে তাদের দুরত্ব মেটাতে চেয়েছিল এ তাকে অপমানের মতই বিঁধেছিল।

কাকে কি বলছে - একি শুধু তার আর ব্রজর জীবনের কথা! যে মানুষটা বাপকে উঠোনে পড়ে রক্তাক্ত হতে দেখছে, মায়ের চোখে অঝোর অশ্রু দেখেছে, ধানের দাদন শোধ হলো না বলে ছেলেকে জন্ম সত্ত্বে ছেড়ে না দিয়ে ভাঙ্গা চোরা শরীর নিয়ে সব দিয়ে থুয়ে মজুর হয়ে গেল বাপটা। তার বালকবুকে দেগে দিয়েছিল অপমানবোধ। হারামজাদারা এমন মার মেরেছিল - রক্তে তখনই গ্রহণ লেগেছিল - আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগল তার বাপ। সেই থেকে জাতক্রোধ—সেই থেকে অহরহ ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর নিয়েই লড়াই।

দুয়ার বন্ধ, অন্ধকারে চোখের জলের ধারা শুকিয়ে গেছে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে আছে, গ্রামের পর গ্রাম দমবন্ধ করে পাথর হয়ে রয়েছে। তারা জমির অধিকার চায়, ধানের অধিকার চায়, তারা বাঁচার মত অনেক কিছু চায়। সেই চাওয়ার অঙ্কুরটি পিষে

ফেলতে সাজ সাজ রব উঠেছে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মালিক মহাজন জোতদার। ভয়ের আগলটা নাড়া দিতে প্রাণ হাতে যারা সেদিন ঘরে ঘরে পৌঁছেছে, তারও একটা নাম যে ব্রজ লেট।

তার জ্বালাটা সে যদি নাই বুঝে থাকে না বুঝল। তা বলে এভাবে সে তাকে ছোট করে দিল এইসব মানুষের কাছে। ব্রজ নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। ছবির মনে হলো শুকনো ডাল মাড়িয়ে যাবার মতই সে যেন তাকে নির্মমভাবে মাড়িয়ে চলে গেল।

(৩)

ছেলের হাত ধরে পরাণ মেলায় আসে - কৃষি মেলা। পেঁপের বীজ কেনে, কচুর গোঁড় কেনে। অনাথ বউকে চুড়ি কিনে দেয় - ছেলের হাতে তালপাতার পুতুল; লাটাই। কত গ্রাম থেকে কত জন এসেছে - দেখা হলো। কথা হলো। সবাই সবাইকে বলছে, দুষছে, গুণ গাইছে খুঁত খুঁত করছে - শুধু পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত। ব্রজ আপন মনে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে - মনে তার অন্য এক ছবি, তাকে বিমনা করে রেখেছে - ঠেঙ্গোর পরে কাপড় তোলা, গামছা কাঁধে বাবা, আধা ন্যাংটো খোকা খুকু। কেউ কাঁখে কেউ হাতের বাঁধনে বেঁধে চোখের দাবি, মনের দাবি থেকে বারে বারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এগিয়ে চলেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলেছে রুক্ষ রাগত বাবার সাথে - দেখতে দেখতে মনের মধ্যে কি বেদনা যে ভরে উঠতে থাকে - এক পয়সার বাঁশিও কি তারা কিনত - ভারাক্রান্ত মনে ব্রজ একটা চা দোকানের বেঞ্চিতে এসে বসে পড়ল।

হায় বাপ্‌স বেরজো - একলা - ছেলে মেয়ে কোথায়

আফিসে যাওনি - তারা সব সেখেনে ব্যস্ত।

যাব, যাব - খবর টবর বল্‌ - এই ছোঁড়া সিধে কথাডা বল দেখি - মতলব কি।

বইলব - উল্টো সিধে ভেবে বইসবি না তো - আমার কাছে মন কিলিয়ার করে বলবি -

ব্রজ চুপ করে থাকে।

চ'তবে আর কোথাও গে বসি - ব্রজকে ধরে নিয়ে চলে দৌলত। এ গাঁ সে গাঁ ঘুর ঘুর করে বেড়াস, কাজ নেই, কর্ম নেই - চেনা জানা ঘরে হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হোস। দু'কথা বলে উধাও হয়ে যাস, তোর ব্যাপারডা কি—

এমনি, মুখ ঘুরিয়ে নেয় ব্রজ। কেন পুরনো লোকের খপর নিতে নেই - শুনতে নেই, এখন কি ভাবছে লোক—

সে ঠিক আছে - কিন্তুক লোকে তোর ভাবসাব দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। শুনছি ঘরে তোর মন নেই - কিছু হয়েছে বউ এর সাথে।

আর কি শুনছিস, তাড়িখানায় যাই, আরও অন্যখানে যাই -

দৌলত কোমরের গোঁজ খুঁজে একটা বিড়ি বার করে - ধরায়। ফুঁক ফুঁক করে ধোঁয়া ছাড়ে - নে ধরা - ব্রজকে একটা এগিয়ে দেয়।

ছেড়ে দিয়েছি, মৃদু হাসে সে -

অ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছিস - পুচকে বয়সের ওব্যেস ছেড়ে দিলি কেন রে? রোজগার পাতি করিসনে বলে - ছবি কিছু বলেছে বুঝি।

শালা, এই তোর আসল কথা নাকি! মনে ভাবে ব্রজ। এত ধানাই পানাই এর কি আছে। তোতে আমাতে সব কথা খোলাখুলিই তো হবে। হারামি, আমার পর তুই বিয়ে করেছিলি, শলা করতে এসেছিলি আমার কাছে। আর তোর ঘরে যখন লুকিয়ে ছিলাম - তোর সাথে তোর বৌ নিয়ে কত ফস্টি নস্টি করেছি - সে তো আমার সুমুখে আসতই না দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ব্রজ। এখন আর কারো সম্পর্ক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। শিকড়গুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে - কোন কিছু মনে রাখার দায় কেউ নেয় না। কেবল বেক্ষ্মদত্যির মত অতীতটা কি তাব কাঁধেই চেপে বসে আছে।

হ্যাঁরে কথা বলছিস না কেন - তাকে ঠেলা দেয় দৌলত - একেবারে গুম মেরে গেলি -

দৌলত, পরীজানের সাথে তোর কিছু হয়েছে -

মারব টেনে এক থাপ্পড় -

তবু তুই আমাকে বলছিস -

আমি তোর দোস্ত ব্রজ। ভাল করে না জেনে - কেন তোকে বলব - সবখান থেকে তোর কথা শুনি -

তাই তো হবে - নিস্পৃহ ব্রজ - এখন আর কাজ নেই - এর তার কথা নিয়ে গুজুর গুজুর -

ঘরে তোর মন নেই। কাজ কর্মও করিস মর্জি মতন। উঠে দাঁড়াল ব্রজ।

না উঠলে হবে না - হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয় দৌলত। আমার দোস্তির কসম। এমন বেইমান ভাবলি তুই আমায় - হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নেয় ব্রজ। এর পরে আর কোন কথা চলে না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ব্রজকে আটকায় দৌলত, মাফ করে দে ব্রজ, আমায় মাফ করে দে - তোর সাথে কথাডা আমায় আজ সারতেই হবে - একটা ভুল বোঝাবুঝি কোথাও হচ্ছে - সেইটে খুঁজে বার করবোই। তুই বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াস - তাড়িখানায় গিয়ে গোলমাল বাধাস - শুনলে আমি স্থির থাকতে পারি বল - মনের কথাডা খুলে বল না কেন আমায় - মন গুমরে মরে যাবি যে -

বোকা বানাচ্ছিস আমায় - উল্লুক, কে তোকে পাঠিয়েছে খোলসা করে বল দিকি - মন গুমরে মরে যাব - কেন? সস্তা নাকি মরা -

গোঁজ হয়ে তো বসেই আছিস - এই কথাটাই বল না - একলা একলা থাকিস কেন -

চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে ব্রজর - চোয়াল শক্ত - অনেক কথা তার। ছেঁড়া কাগজের টুকরো টুকরো সে কথাগুলোকে কেমন করে দুটো কথায় শেষ করে দেবে!

সত্যিই কি সে একা হয়ে গেছে? কাউকে সে বুঝতে পারছে না, না কেউ তাকে

বুঝছে না - কোনটা সত্যি! দৌলতই কি তাকে বুঝবে! ওরা কি তার বিচার করতে বসবে! ছবি প্রতিনিধি হয়েছে - সে জ্বলে মরছে সেই জ্বালায় সবাই তাই ভাবছে। পঞ্চায়েতের কাজ সে নেয় না, সরকারী কাজ করে। খেতমজুর সে, কারো খেতেই কাজ করতে নামে না - এ তার অহঙ্কার ছাড়া কি? আর ছবির কথা তাও লোকে বলে - সে যে খাস জমি নেয়নি—সে কথা আর কেউ তোলেনি। কিন্তু ছবি বসত ঘর পেয়েছে, ছবির সমবায়ের সাইকেল ছবি চড়ে, অন্যেরাও চড়ে, আবার. তার ছেলেমেয়েও তাতে সাইকেল চড়া শেখে—ব্রজর যতই অপছন্দ হোক—সে তাদের মানাতে পারে কই। ছবি বলছে - কাজ বাড়েনি বুঝি, সমবায় নিয়ে তাকে এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে দেখা শোনা করতে হয়—তাতেও কথা! কেনাও না একখানা সাইকেল একটা ফারাক তৈরি হচ্ছে—অনাথ শুঁড়িখানায় বসে সকলের সামনে বলে ছিল-ও বাবা, ছবিরে বৌদি বলব না—কি বলিস - আর লোটার মা বললে মানায়। বউ-এর দিকে তাকিয়ে দেখিস—একদিন ভালো করে—কেমন ভদ্দরলোকের বিবির মতন চেকনাই দিচ্ছে—কতা বার্তা কয় যেন রেডিওর খবর বলছে - হাল্কা কথা, ঠাট্টার কথা, তবু এতেও কি অনেক কথা বলা নেই—

দৌলত—কথা খুঁজে চলেছে ব্রজ - আমি দেখি, পরখ করি, যা দিলাম আর যা পেলাম তার কতটা খাঁটি, কতটা তলিয়ে যাচ্ছে। মাটিটা পায়ের তলায় শক্ত আছে তো? আমার যা মনে নেয় তোরও নেয় কিনা বেশ আজ আমি তাও পরখ করে দেখব।

কি মনে নেয়—সন্দিগ্ধ দৌলত খুঁটিয়ে দেখে ব্রজকে। ব্রজ সত্যিই কোন বিষম সন্দেহের ভারে টলে যাচ্ছে নাকি—

পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত একটু বেশি করতেছ না - জমিদার মহাজন একটু থামা খেয়েছে কি - সক্কলে মিলে সুখ সুবিধে কিনতে বসেছে—কি হ'ল তোমাদের সবাইতো সমান হল না। হবেও না—তাই কার বেশি হল কার কম হল, কে পেল কে আরও পেল না—। লাঠি খান মাথার পরে নেই, ওমনি আমরা সব পেথগন্ন হয়ে যাচ্ছি। সিদিন যে হারানিধি খুন হ'ল—মাস্টারডা হাসপাতালে ধুঁকছে—একটা করে ঘা পড়তেছে আচমকা-ডাক পাড়তে পাড়তে ওরা কাম ফতে করে চলে যাচ্ছে-আমাদের কি বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে গেল না, ওরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে- আমরা আর আগের মত সাবধান নেই—

ব্রজ-দৌলত গম্ভীর। যা বললি ঠিক আছে আরও কথা হবে—পরে, তবে এ তো ঠিক শাঁখের ফুঁয়ে পাঁচশ লোক জড়ো হবে—এমন কি আর এই অবস্থায় হয়? তবু লোক বেরিয়ে ছিল না হলে মাস্টারকেও বাঁচানো যেত না—। আর পঞ্চায়েত - কেন ভাল কাজ হচ্ছে - লোকে অন্তত না খেয়ে আধপেটা খেয়ে, জুলুমের মধ্যে কাটাচ্ছে না। কাজ এনে দিচ্ছে পঞ্চায়েত, রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেচ খাল কি হচ্ছে না, জমির ফসল বাড়ছে, এক ছটাক জমিও আর পড়ে নেই—এসব থাক - সবচেয়ে বড় কথা-

পড়া লেখা শিখছে মানুষ, চিকিচ্ছে করাচ্ছে। জলপড়া তেলপড়া, ডাইন, গুনীনের দোর ধরে পড়ে থাকছে না। এটা একটা মস্তবড় জিনিস নয়—

ব্রজ হাসে—ভাবছিস আমি পঞ্চায়েত মানছি না—না? সবাই তাই বলছে। সেই যে বললাম, আমি যা দেখি তুই কি দেখসি হ্যাঁ পড়া লেখা হচ্ছে—সাফ সুতরো থাকা, দু পয়সা আয় বাড়ছে ওমনি সব চোখ উপর পানে উঠে যাচ্ছে কেউ আর নিচ পানে, নিজের পায়ের পাতার পানে দেখছে কই! জমির টান ছিঁড়ে যাচ্ছে—পরাণকে বললাম তোর ছেলেটা রোজ রোজ শহর পানে ছোটে-ইদিকে মন বসে না—না? পরাণ বললে, শহরে কত কাজ, এখেনে কাজ কই? আমার ছেলে, সেও যাবে পা বাড়িয়েছে - অনেকের ছেলে যাচ্ছে—যাবে, ঠিক কিনা। তারা পায়ে জুতো পরে, মাথায় টেরি কেটে—পথে গটগট করে হাঁটছে - ভাল লাগছে না রে—আমার মাথার মধ্যে ওই শব্দগুলো যেন দুরমুশ চালায়—তোতে আমাতেও ফারাক বেড়ে যাচ্ছে, দৌলত—তোর মনে হয় না—গাঁয়ের কাছে ওদের কিছু পাওয়ার নেই, দেবারও নেই। আমার মনটা দমে যায়—আমরা জান প্রাণ দিয়ে এত এনে দিলাম ওদের জন্যে ওরা তাই দুপায়ে ঠেলে চলে যেতে চাইছে—চাষ বাস ছেড়ে দেবে ওরা—তবে কি জমি জায়গা মালিকরা ট্রাক্টর দিয়ে চষবে, মেশিনে ঝাড়াই মাড়াই হবে। আমাদের জীবনভোর লড়াইটা একেবারে মিছে করে দেবে।

দৌলত হাত চেপে ধরে ব্রজর -

বাব্বাঃ অনেক কিছু ভেবে ফেলেছিস তুই—আমাদের চাষবাস লাঙ্গল কাঁধেই চলবে রে—বেরজো—অনেক কাল। এখন জমিটা হাতে থাকবে—রাখতেই হবে—সেই ভাবনা—হ্যাঁ, সেই ভাবনা—রক্ত দিচ্ছি—এখনই তো শেষ হবে না—

অন্তরায়

রান্নাঘরে থেকে রোহিনীর চায়ের পটে টুংটাং শব্দ ভোরের হালকা ঘুমে সময়ের ঘড়ি জানান দিচ্ছে। নভজ্যোতি ধীরে সুস্থে উঠে বসল। ভাল করে আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জোড়গুলো সচল করে নিল। এবার বাথরুমে গিয়ে দু'চার বার হাত-পায়ে কসরৎ সেরে চায়ের টেবিলে সরাসরি চলে আসে। নয়তো রোহিনীর চা খাওয়া শেষে পটের তলানি পড়ে থাকে। তার অপেক্ষার সময় নেই। চলে আসবে ব্রেকফাস্ট। চলবে ধোয়া-মোছা কাচাকাচি—আলতে আসবে—বাজার যাবে—

ব্রেকফাস্ট সেরে নভজ্যোতি তার বইপত্র উলটে পালটে ব্রিফকেসে কিছু কাগজপত্র ভরে কিছু খালি করে দাড়ি কামিয়ে স্নানে যাবে এই তার রুটিন—

রোহিনীও স্নানে যাবে—রান্নাবান্না সারা—কোলের সন্তানটিকে আজ থেকে ক্রেশেতে রাখতে হবে। তার ছুটি শেষ—ভাল কথা—দাড়ির ওপর রেজর চালিয়ে রেঙ্গরের মুখ তোয়ালেতে পরিষ্কার করতে করতে ডাকল—শোন, বলতে তো ভুলেই গেছি—আজ কিন্তু এক্সক্লুসিভ থেকে ইন্টিরিয়র ডেকরেটের্স-এর লোক বাড়িতে আসবে—

—আমি তার কি করব—অসন্তুষ্ট, এঘর ওঘর করতে ব্যস্ত রোহিনী জবাব দিল—

—ওদের সব দেখিয়ে মাপজোক করে—এস্টিমেট করে নেবে, কোথায় কোন রঙ খুলবে, প্লাস্টিক ইমালসান কতটা লাগবে—কোন্ কোয়ালিটি—কিরকম দাম—আর কিছু?

—তুমি যে টাইলস চেঞ্জ করার কথা বলছিলে—যদি পালিশ হলে চলে—

—আর কিছু—নির্বিকার রোহিনী টিফিন বাক্সে খাবার গোছাতে থাকে।

—আর আবার কি—জলের লাইন—সে তো প্লাম্বার লাগবে—

—আর.....

—ও, দরজা জানলাও তো রঙ করাতে হবে—হ্যাঁ ঘরের রঙের সাথে ম্যাচিং হবে—তাই তো—

—আর ও যা যা আছে ভেবে রাখ—

—আমি আসছি—

—নভজ্যোতির হাবভাব দেখেই সে সারাদিনের লোক রাখেনি। জীবন তো এক জায়গায় থেমে থাকে না—তার ব্যথা-বেদনা ক্লান্তি সে বুঝবে। ভালবাসা দিয়ে সে

তাকে বুঝতে শেখাবে। সংসার দু'জনের ভালবাসায় বাঁচে। অধিক মন্থনে গরলও ওঠে। এতদিনের দেখা তাদের সংসারের ছবি মনের পর্দায় ভাসে—দু'টি মানুষের কি সুন্দর বোঝাপোড়া। বাবাকে দেখেছে ভারী চাদর, মশারি মায়ের হাতে হাতে কেচে ধুয়ে দিতে, মেলে দিতে। কয়লা ভেঙে দিতে—তাড়াতাড়িতে নিজেই চা করে মায়ের হাতে তুলে দিতে—যার রান্নায় খুন্তিও চালাতে। আর মাংস রান্নায় বাবার জুড়ি নেই—ঘর সংসারের কত শত খুঁটিনাটি কাজ—গভীরভাবে পড়াশোনা, গান শোনা, অবকাশ, মনের পটে ওই ছবিগুলো যত উজ্জ্বল হয়ে আছে নিজের সংসার ততই ফ্যাকাশে—শ্রীহীন—বেসুর লাগে।

নভজ্যোতিদের ধারণা ওদের পরিবার মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ওরা বসে তাস পেটে—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের যেতে হয় সিগারেট সাপ্লাই দিতে—ওর মা অত ঘন ঘন চা জলখাবার করতেন না—সেই ছেলে-মেয়েরাই কেটলি নিয়ে দোকান থেকে আনা নেওয়া করে। ছুটির দিনের দারুণ আড্ডা—ঝমাঝম গানবাজনা, তাস দাবার উচ্ছৃঙ্খল মজা, মুখরোচক খাওয়া দাওয়া বাড়িশুদ্ধ সিনেমা থিয়েটার ঘোরা—একরকমের যান্ত্রিক আবর্তন।

বিয়েটা পছন্দের—দু'জনে দু'জনকে প্রাণের অধিক চেয়েছে। অন্তত তাই বুঝেছিল রোহিনী—নভজ্যোতির প্রাণটায় লক্ষ্মণের গন্ডি টানা—সে বোধ তার ছিল না।

বাচ্চা কোলে বাস্কেট হাতে বেরিয়ে এল রোহিনী—আমাদের লিফট দেবে, না আমি ট্যাক্সি নেব—

ব্রিফকেস টেনে নিয়ে নভজ্যোতি ধমকে উঠল—কি বললাম আমি তোমাকে—কিভাবো নিজেকে তুমি ?

—অন্তত অফিসার ভাবি না—সোজা সিঁড়ির দিকে এগোল রোহিনী—তাকে টপ্‌কে নভজ্যোতি সিঁড়ির ধাপে এসে রুখে দাঁড়াল—

—তুমি যাচ্ছ না—বাড়িতে থাকছ—রেপুটেড ফার্ম—আলতু ফালতু মিস্ত্রি নয়, বুঝেছ। আর আমিও একজন রেপুটেড পারসন।

—তুমি থাক—তুমি কনট্যাক্ট করেছ—আমার সাথে তো কোন আলোচনাই করনি—

—বেশ করেছি—আমার সুবিধে থাকলে থাকতাম—বোর্ড মিটিং আছে আমার—

—তবে আজকেই ডেট করলে কেন ?

—আচ্ছা বাবা তোমার ছুটি এক্সটেন্ড করিয়ে দেব—হবে তো ? আজকেটা সামাল দাও।

—তোমার এসব নরম গরম এখন আমি বুঝতে শিখেছি—সেবার তোমার বোন আসবে—এয়ারপোর্টে আমায় পাঠালে রিসিভ করতে—সেও তোমার জরুরী কাজ ছিল, তাকে এন্টারটেন করা—সেও ভাইবৌ হিসাবে আমারই দায়িত্ব—শখের কেনাকাটা—আমাকেই সঙ্গী হতে হবে—মা ছেলে ছেলে করে পাগল—তোমার দারুণ ব্যস্ততা—আমিই অবুঝ মানুষটির সব দায় নিয়ে আমারই—শোন, আমি চাই না আমার উইদাউট পে হোক, আমার পেনশন গ্র্যাচুইটিতে হাত পড়ুক—

—রোহিনী দ্রুত নামতে থাকে—পাশে পাশে নামতে থাকে নভজ্যোতিও—বাড়াবাড়ি কোর না—ভাল কথা বলছি—সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

রোহিনীর সামনে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে নভজ্যোতি।

—তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না—আজ বোর্ড মিটিং মনে আছে তো? রোহিনী হতভম্ব নভজ্যোতিকে একরকম ঠেলেই বেরিয়ে যায়—

—বেশ, দেখব—চাকরি কি করে কর—দাঁতের ফাঁকে হিসহিস করে শাসালো নভজ্যোতি।

ক্রেশেতে মেয়েকে সঁপে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে অফিসে পৌঁছল রোহিনী—সবাই একসঙ্গে হই হই করে ছুটে এল—স্যার যে ফোন করলেন বাচ্চাটার শরীর খারাপ—

ও হাসল—ক্রেশেতে রেখে এলাম—জয়েনিং রিপোর্ট দিতে সেক্রেটারির ঘরে ঢুকতে তিনি হাসলেন—এসেছ—যাক্—সাহেব জানালেন আসছ না—ভেবেছিলাম ফোন করে বলব কিনা—উইদাউট পে হয়ে যাবে—

একবার ভাবল জিজ্ঞাসা করে বোর্ড মিটিং আছে নাকি—যাক—আত্মসম্মানটুকু বাঁচিয়ে চলাই ভাল। নভজ্যোতির হালচাল দিনে দিনে ধরে ফেলেছে। মেয়ে বলে তার প্রতি সূক্ষ্ম অবজ্ঞা—শুধু চার দেওয়ালের ভিতরে নয়, বাইরেও যত ঝকমারি স্থূল দায়িত্ব তার কাঁধেই চাপিয়ে নিজে অর্থ পদমর্যাদার পিছনে ছোটা ছাড়া কুটোটি নাড়তে বিষম অরুচি। তার ওপর এই নতুন দায়, তাদের সন্তান। দু'হাতে মাথা টিপে ধরে নিজের আসনে ধপ্ করে বসে পড়ল রোহিনী—। সে ক্ষয়ে যেতে বসেছে। মানুষটাকে সে কতভাবে চিনত জানত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকটা যে এতখানি আত্মসুখী একধরনের নিষ্ঠুর স্বার্থরপতায় অন্ধ, তা জানবে কেমন করে। বুঝতে· দিশেহারা হয়েছিল। তারপরও আশায় আশায় ছিল—ভালোবাসায় ভরসা ছিল। অফিসের অবসরে প্রেম—পথে, মাঠে-ঘাটে, রেস্টুরেন্টে, সিনেমা হলে। টুকিটাকি মার্কেটিং, স্যুভেনির কি কসমেটিকস, তার অনেক দেরি হয়েছে — নিজের নির্বুদ্ধিতার খেসারত তাকে দিতেই হবে। ছোটখাট গৃহসজ্জায় টুকিটাকি, তার মুখে হাসি ফোটাতে ব্যাকুল প্রেমিক—খুব ভুল।

এতটুকু জেনে কারো সাথে ঘর বাঁধতে যাওয়া যৌথ দায়িত্বের ধারণা নিয়ে—প্রত্যাশায় উন্মুখ হওয়া—ভুল, বিষম ভুল—

দু'জনেই চাকুরে এই শর্তপূরণের প্রয়োজন তখন ছিল—নতুন সংসার পাতার পৃথক আয়োজন। স্থান ছিল প্রথম বাধা। তারপরেই শুরু হলো পরস্পরকে সত্যি করে চেনার পালা। মোহজাল টুটে প্রখর সত্যের আলোয় মুখোমুখি হওয়া। এতটুকু শৃঙ্খলাবোধ নেই—জামাকাপড় ছেড়ে ছড়িয়ে দেবে, জুতো যেখানে বসে খুলবে, সেখানেই পড়ে থাকবে, এদিক ওদিক ছুঁড়ে দেবে মোজা, সোফার পিঠে টাই, প্যান্টের বেল্ট বিছানায়, শর্ট গেঞ্জি বাথরুমে, প্যান্ট দরজার ছিটকিনিতে। বলে দেখেছে, বুঝিয়ে দেখেছে।

—বাবা, একটু হাত পা ছড়িয়ে থাকবে বলেই না ঘর বাঁধা। তারপরে সেই কথা এসে দাঁড়াল—কেন তুমি গুছিয়ে রাখতে পার না?

—তাছাড়া উপায় কী? কাজ বাড়াতে তুমি ওস্তাদ—

—কাজ দেখাচ্ছে—অ্যাঁ—তোমার থেকে ঢের দায়িত্বের কাজ আমায় করতে হয়। সারাক্ষণ অ্যালার্ট থাকা, টেনশনে টেনশনে জেরবার—আমার রিল্যাক্সেশন চাই—ঘরে পা দিলেই সারাক্ষণ খিটিমিটি, দুত্তোরি ছাই—ঘরে আর ফিরবই না—

রোহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। ভাবল, বুঝি জামা-কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বা। নভজ্যোতি শুধু একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টানে একমুখ ধোঁয়ার রিঙ ছাড়তে ছাড়তে পা দুখানা তুলে দিল সোফার হাতলে। বালিশটা কাঁধের নিচে রেখে আধশোয়া হয়ে একখানা ম্যাগাজিন টেনে নিল। এক কাপ কফি হবে—

মনের মধ্যে তিক্ততা নিয়ে এই প্রথম রোহিনী কফির কাপ নামিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে গেল। আজ আর প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি ছিল না মুখে। নভজ্যোতি একটা মানুষ—শুধু হাত-পা দেহসৌষ্ঠবের সমষ্টি নয়। চোখ নাকি মানুষের মনের দর্পণ—তাতেই কি ধরা পড়ে মানুষের ব্যক্তি চরিত্র, স্বভাব, অভ্যাস—ভালো লাগা, মন্দ লাগা! কই, দু'জনের চোখে চোখ রেখে কত মুহূর্তই তো পার করেছে তারা—কতটা গভীরে তার পৌঁছেছিল সে—এক মুগ্ধতা ছাড়া সেখানে আর কী ছিল? হয়তো তীব্র যৌনতা! হৃদয়ের গভীরতা বলে যাকে সাহিত্যে কাব্যে নানান রূপকল্পে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের চোখে তার সত্যিই কোন আলো ফুটে ওঠে। না কি তা দেখার আর একটা তৃতীয় নয়ন চাই। ভালোবাসার নামে মোহের ঘোর সেই কেড়ে নেয়, অন্ধ করে দেয়। এখন যে স্বার্থের কালি নভজ্যোতির চোখের কোলে ঝিলিক দিয়ে যায়—এ অনুভব তো তার স্মরণে আসে না।

তার দেওয়া বাজারের ফর্দটা যেখানকার সেখানেই পড়ে থাকল। নভজ্যোতি ব্রেকফাস্ট টেবিলে জাঁকিয়ে বসে হাঁক দিল, কই—অফিসে যাব না। সেই তাদের প্রথম সকাল-সংসারের শুরু।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রোহিনী হাসে, বাজার গেলে না—কি দিয়ে কি করব—

নভজ্যোতি খানিকক্ষণ ওর দিক এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন এমন কথা শুনবে এ তার স্বপ্নেও ছিল না!—বাজার যাব—

—বাঃ, বাজার যাবে না—খাওয়া-দাওয়ার কী হবে—না হ'লে—

—ওঃ—উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে নভজ্যোতি—ঘরে গেল। রোহিনী ভেবেছিল বুঝি বাজার যাচ্ছে। অ্যাটাচি হাতে নিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। অবাক রোহিনী বলে উঠল, আরে বাজার যাচ্ছ। অ্যাটাচি কী হবে—এগিয়ে এসেছিল সে—নভজ্যোতি ততক্ষণ দরজা পেরিয়ে রাস্তায়। বাজার এল না — ফিরলই না সে। রোহিনী ঘরে ঢুকে দেখল ফর্দ টাকা যেমন রেখেছে তেমনি পড়ে আছে ড্রেসিং টেবিলের উপর। পড়ে আছে আধোয়া শেভিং সেট, ব্রাশ, পেস্ট, সাবান গোলা জলের

পাত্র ছত্রখান হয়ে। নোংরা তোয়ালে খাটের বাজুতে, ছাড়া পোশাক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সেই প্রথম কান্না পেল। তারও অফিস আছে। ধীরে সুস্থে তৈরি হলো। এবেলা রান্নার পাট রইলো না। কাল সকাল থেকেই কাজের মেয়েটি আসবে।

মাঝে মাঝে এক গোছা ফুল, এটা সেটা উপহার আনত তার জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীতে — পরে জেনেছে নিজের হাতে কেনা নয়, অফিসের কাউকে না কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেয়। সেই উপহারে তার অবজ্ঞাই যেন জড়ানো। ভালোবাসার সেই সুরটা কবেই কেটে গেছে এখন শুধু শুকনো কর্তব্যের ভার একটি দায়হীন মানুষের নিদারুণ ভার তার ঘাড় নুইয়ে দিচ্ছে। সামান্য শখের পড়াশোনাটাও তাকে বর্জন করতে হয়েছে। ঘুরতে ফিরতে গুনগুনিয়ে ওঠা গানের কলি হারিয়ে গেছে — যন্ত্রের মতো ঘড়ির সাথে তাল দিতে দিতে হিমশিম। পত্র-পত্রিকা গড়াগড়ি যায়। রাতের অবকাশ ছাড়া তার আর ফুরসৎ কোথায়! অথচ তখন বিছানায় ডাক আসে — আলো পছন্দ নয় নভজ্যোতির ঘুমের অসুবিধা হয়। ব্যাগে করে অফিসে নিয়ে যায়, বাসে, ট্রামে বসতে পেলে চোখ বোলায় — ঝিমুনি আসে। নভজ্যোতির পদোন্নতি হয়, গাড়ি আসে তাকে নিতে — সময় মেলে না বলে — রোহিনীর যাওয়া হয় না।

মাঝে মাঝে নিজের উপরে অনুকম্পা জাগে। তার নিশ্চেষ্ট মন—তাকে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ করে। এই তবে সংসার। সংসারের যাবতীয় ঝক্কি তার মাথায় কাঁটার মুকুট তুলে দিয়েছে। একটা সংসারে পুরুষ, বাইরের জগতে আর মেয়েরা গৃহের অন্তরালে। যা ছিল বহুযুগের ধারণা — তার রূপান্তর হয়েছে বৈকি। মেয়েরাও বাইরের জগৎকে চিনে নিয়েছে। জীবনযুদ্ধে তারা সহযাত্রী। নারীর সমানাধিকারের যে লজ্জাজনক অপব্যাখ্যা কতখানি সম্ভব — নভজ্যোতির মুখে 'না' শুনলে ভাবতে পারত না। নিজের দায়িত্বহীনতা এমন চমৎকার যুক্তিসঙ্গত করে তোলা এমন নিষ্পাপ মুখে — নাঃ কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির সাধ্য হবে না।

বাজার আজকাল মেয়েরাই করে — গিয়েই দেখ না — আমার তো লজ্জাই করে বাজারে ঢুকতে — মহিলাদের সাথে ধাক্কা ধাক্কি — ওঃ হরিবল —

টেলিফোন বিল—সেখানে লেডিজ ফার্স্ট তারপর — নিউমার্কেটে একদঙ্গল সুবেশা সুন্দরীর সাথে অসংখ্য প্যাকেট সমৃদ্ধ নভজ্যোতিকে দেখে জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা — রূপসী ওর ভিরমি খাবার দশা দেখে ওকে টানতে টানতে আইসক্রিম পারলারে নিয়ে গেল, দু'জনে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে বসেছে পুরো দলবল নিয়ে নভজ্যোতি — ছুটে ছুটে আইসক্রিম সার্ভ করছে মহিলারা গলে গলে পড়ছে — ঈর্ষা নয় — অপমান লেগেছিল —

মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফিরে তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে একেবারে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়লো রোহিনী। খাবার ঢাকা রইলো টেবিলে। আজ নভজ্যোতির জরুরী অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট।

নভজ্যোতি ঘরে ঢুকে — তার জামাকাপড় ছাড়া, বাথরুমে জোরে জল ছেড়ে দিয়ে

আধঘণ্টা কাটিয়ে এলো। শোবার ঘরের দরজায় মুখ বাড়িয়ে ডাকল—হাই রোহিনী—হোয়াটস আপ—জেলাস—

তুমি খেয়ে নাও টুপুসের শরীর ভালো নেই—বমি হচ্ছে—সামান্য গা গরমও হয়েছে—

—তুমি খাবে? চল তবে—

—আমি এই ঘরে পা দিলাম—বরং এক কাপ কফি পেলে হতো—ডাক্তার দেখাওনি—

—কবজি উলটে ঘড়ি দেখে—কাল যাব—

—কাল? কাল কেন? আজই যাও—এমন কিছু রাত হয়নি—

—ফ্লাস্কে চা আছে—খাবার দাবার সব গোছানো আছে—রোহিনী উঠল, মেয়েকে তোয়ালে জড়িয়ে ড্রইংরুমের বড় সোফাটায় পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লো—

—কি হচ্ছে কি এসব—গেঁয়ো মেয়েদের মতো—মেকিং আগলি সিনস্—রাগে ফুঁসছিল নভজ্যোতি।

—বললাম তো টুপুস অসুস্থ—গুড নাইট, শুয়ে পড়গে যাও—

—তাহলে আজ থেকে—

নিজের সুখ-সুবিধার এতটুকু অসাচ্ছন্দ্য বরদাস্ত হয় না নভজ্যোতির। সেই মুহূর্তে তার চোখেরতলায় একটা ক্রূর নিষ্ঠুরতা ঝলসে ওঠে। ওইটুকুর জন্যে সে যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটাতে প্রস্তুত। প্রথম দিন খুবই অসহায় লেগেছিল। নীরবে মাথা নিচু করে সরে এসেছিল।

তারপর কত কি তার সয়ে গেছে।

—শুতে যাও রাত হয়েছে—

পরদিন বিছানায় চা না খেয়ে ঘুমভাঙা নভজ্যোতি রুষ্ট মুখে এঘরে এল, মেয়ে কোলে বসে আছে রোহিনী

—চা টা মিলবে না বোধহয়

—সারারাত মেয়েটা জ্বরে বেঁহুশ—ডাক্তারকে পাও কিনা দেখতো—ছলছল চোখ রোহিনীর

—রেডি হয়ে নাও, বলতে বলতে বাথরুমে ঢুকলো নভজ্যোতি

—বাড়িতে নিয়ে এস—ওকে আমি রাস্তায় বার করবো না।

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে নভজ্যোতি ঢুকল—তখনি জানি, আজ বাচ্চাটার ভোগান্তি। তারপর নিজেই বিছানা নাও আর কি! এতসব ঝঞ্ঝাট পোষায়—

ফোনের লাইন থেকে তিড়বিড়িয়ে ফিরে এল—

—সময় তো হয়ে এল—

তাহলে তুমি যাও, আমি ঘরের দিকটা সামলাই—

—আমি—আমি কি করে যাব—রেডি হয়ে বেরুতে বেরুতেই আটটা বেজে যাবে—ও তুমি সাফার কর—আলতা আছে

টেলিফোন বাজছে—রোহিনীর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই ধরার—রান্নাঘর থেকে আলতা দৌড়ে এল—নভজ্যোতি তখনও বাথরুমে—এখন স্নানের পালা।

নভজ্যোতির ফোন—নাম জেনে ছেড়ে দে দরকার থাকে বেরিয়ে এসে নিজে কল করে নেবে। তুই ওকে একটু ধর, ডাক্তারখানায় যাব, গুছিয়ে নিই—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—

আমার খোকাটারও ওমনি জ্বর হলো—

চা জলখাবার গুছিয়ে রাখ—তোকে নিয়ে যাব—

নভজ্যোতিকে টেবিলের হদিস দিয়ে বেরিয়ে এল রোহিনী। টেলিফোনের খবরটা দিতে ভুলেই গেল। রাস্তায় মনে পড়ল—আর কি হবে—গরজ থাকলে ফের করে নেবে—

সারাটা দিন মেয়েটাকে নিয়ে হিমশিম খেল দু'জনে—ডালে ভাতে সেদ্ধ করে খেয়ে। বিকেলের দিকে আস্তে আস্তে জ্বর নামছে। আশ্চর্য, একটা খোঁজ পর্যন্ত নিল না নভজ্যোতি! এবার কি হবে ডেপুটি ডিরেক্টর! দু'বার আলতাকে পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে—বড় বেসামাল হয়ে পড়েছিল—অসহায় লাগছিল বুক ভেঙে কান্না আসছিল—কতবার মনে হয়েছিল মাকে একটা ফোন করে দেয়—সামলে নিয়েছে! অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়ে তখন—পাশে বসে ঢুলে পড়ছিল রোহিনী। আলতা এককাপ কড়া কফি সামনে ধরলো—খাও বৌদি, ভয় নেই—দাও, ওর বুকে পিঠে গরম তেল মালিশ করে দিই—

তেল, সরষে তেল—ডাক্তার যে—

থোও তবে ডাক্তার, এ খুব ভাল দাওয়াই গো—দেখো সর্দি তরল হয়ে যাবে—নতুন জল লেগেছে কিনা—শুরু হলো তার বকবক—রাতে মেয়েটাকে খাটে শুতেই দিলনি—

কেমন বাপের প্রাণ—

নিজের বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না যে ওর—

দিনরাত্রির ধকল কাটিয়ে সোফায় হাত-পা এলিয়ে শুয়ে রইল রোহিনী। চোখ দুটো বুজে এসেছে। বড় ভাল লাগছে—আলতাকে—ওই তো তার বড় বন্ধু। বড় আপনার—মেয়েটাকে নিয়ে ওর ভরসাতেই সে বেশ থাকতে পারে—চোখ জড়িয়ে এল তার।

কখন রাত নেমেছে, জানেও না রোহিনী। আলতা ওকে হাতের ঠেলা দিয়ে ডাকছে—যাহোক কিছু করে রেখে গেলাম। ওকে খাইয়ে দিয়েছি। খাটে শুইয়ে রেখে এসেছি। দরজা দেবে এস—অফিসে নভজ্যোতি তাদের একজিকিউটিভ অফিসারের সাথে কিছু ফাইল কন্‌সাল্ট করছিল। ক'দিন আগে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে তিন দিনের পরীক্ষার ফলাফল যাচাই হয়ে—নতুন ডেপুটি ডিরেক্টরের দপ্তরে একজন টেলিফোন অপারেটর, একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নেওয়া হচ্ছে। এই ক্যান্ডিডেটকে আমরা সিলেক্ট করেছি। পার্টিকুলার্সগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তার পছন্দই হয়ে গেছে।

রেফারেন্স কি দিয়েছে। এক্সপেরিয়েন্স — ভি· নেক্সাসে ছিল — ছেড়ে দিল কেন?

ওরা বিবাহিত মেয়ে রাখে না—প্রায় লাফিয়ে উঠল নভজ্যোতি — মেয়ে বিবাহিত — ও নো — মিঃ দিন্দা — অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠানো হয়ে গেছে বোধহয়, টাইপ হয়েছে দেখেছিলাম।

ফোনটা এগিয়ে দিতে গিঁয়ে একবার মেয়ের কথাটা মনে পড়ল — নিজের কানে ফোনটা ঠেকিয়ে বাড়িতে ফোন করল — কোন সাড়া নেই, ফোন ডেড —

দিন্দার দিকে তাকানো মুখে পলকের জন্য ছায়া 'পড়ল — তারপর ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট গলায় হুকুম দিল — যদি পোস্ট না হয়ে থাকে এখুনি স্টপ করুন — মোদ্দা কথা কোন মেয়েছেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার চাই না — এই বাচ্চা হবে, এই মেটারনিটি লিভ, ছেলের অসুখ, কাল বাড়িতে গেস্ট, পরশু ঘরদোর সংস্কার, কলি ফেরানো — ও নো—মাথা খারাপ করে দেবে, ছুটি আর ছুটি —

দিন্দা হাসল — রোহিনী ফোন করে বললো মেয়েটার সারারাত ধুম জ্বর — নেতিয়ে পড়েছে, ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে — আসতে পারবে না —

ওই তো দেখ —

দেখছি — দিন্দার হাসিতে শ্লেষ ফুটে ওঠে।

মেয়েছেলে, মেয়েছেলেই — চার দেওয়ালের বাইরে ওরা এক একটি উপদ্রব।

রোহিনী তো আপনার গায়ে আঁচটি লাগতে দেয় না —

সব রোহিনীরাই ওমনি ঘর-সংসার নিয়েই পড়ে থাকবে — তারপরে আর তাদের ফুরসৎ কোথায়? প্লিজ আমার জন্য —

একজন ছেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট — দিন্দা মনে মনে হাসে — চাঁদু এসব অ্যাসিস্ট্যান্ট রীতিমত প্রতিপক্ষ — তার সাথে টক্কর দিতে পারবে তো —

উঠে দাঁড়াল। ফের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, না কি

— দেখি, যেতে যেতে দরজায় মুখে ঘুরে দাঁড়াল দিন্দা —

— বাই দ্য বাই, রোহিনী এ অফিস ছেড়ে দিচ্ছে — কোথায় যাচ্ছে —, বেটার চান্স।

মুখে কথা জোগালো না নভজ্যোতির। মুহূর্তে মাথায় রক্ত চড়ে গেল — তা'হলে এই সব শয়তানি বুদ্ধি খেলছে মাথায় — কলকাঠিটা নাড়ছে কে? দিন্দা বেরিয়ে গেছে। সুইংডোরের পাল্লা দুটো তখনও দুলছে —

(প্রয়াত কমরেড প্রণতি ঘোষের এই অপ্রকাশিত গল্পের পাণ্ডুলিপি তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল থেকে পাওয়া গেছে। গল্পটির নামকরণ আমাদের। কারণ গল্পটির কোন নাম তিনি দিয়ে যাননি। —প্রকাশক)